কলকাতায় এলেন হর্ষবর্ধন

শিবরাম চক্রবর্তী

শিব্রাম চকর্‌বর্‌তির বইয়ের দোকান
কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-বারো

প্রকাশক : শ্রীগোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
শিব্রাম চকরবরতির বইয়ের দোকান
এম-টি, ৫৩/১, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট,
কলিকাতা-১২

মুদ্রক : নিরঞ্জন বোস
নর্দার্ন প্রিণ্টার্স
৩৪/২, বিডন ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ—শৈল চক্রবর্তী

প্রথম প্রকাশ—১লা বৈশাখ ১৩৭৩
দ্বিতীয় সংস্করণ—মহালয়া ১৩৭৭

দাম : সাত টাকা

কলকাতায় এলেন হর্ষবর্ধন

মনোজ দত্ত

বন্ধুবরেষু

গোড়ার কথা

আমার হাসির গল্প লেখার গোড়ায় মহাত্মা মার্কটোয়েন—তাঁর কাছেই আমি ঋণী। কি করে জানিনে, তাঁর ইনোসেন্‌ট্‌স্‌ অ্যাব্রড বইয়ের কয়েকটি ছেঁড়া পাতা আমার হাতে উড়ে এসে পড়েছিল—গোড়াকার পাতা কটাই। তাই থেকেই আমি হর্ষবর্ধন আর গোবর্ধনের প্রেরণা পাই। তার পরে অবশ্যি লরেল হার্ডির অনুপ্রেরণাও ছিল বইকি! জগদ্বিখ্যাত ওই দুটি চরিত্রের আদলে, তাদের বোকামির বহরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে, এই জীবনে আর যেসব মহানুভব চরিত্রের সংস্পর্শে এসেছিলাম তাঁদের মহত্বের কিছু কিছু মিশিয়ে আমার এই দুটি ভাই। আমার কিশোর বয়সেই দেশবন্ধুর থেকে শুরু করে বিধানচন্দ্র পর্যন্ত যে সব মহাপুরুষের সান্নিধ্যে আসার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল, দেখেছি তাঁরা সবাই অল্পবিস্তর পূণ্যশ্লোক বিদ্যাসাগর মশায়ের সগোত্র, বদান্যতার পরাকাষ্ঠা, সৎ বদ্‌ নির্বিচারে অপরের সাহায্যে অর্থভারমুক্ত হয়ে নিজেদের ধন্যজ্ঞান করেন! অতএব, আমার এঁরা একেবারেই কাল্পনিক নন, আশেপাশেই রয়েছেন, দেখা যায় এঁদের এখনো।

শিব্রামের আরো বই

হর্ষবর্ধন আর গোবর্ধন
হর্ষবর্ধন নিত্যনূতন
ইতুর থেকে ইত্যাদি
চুলচেরা শোধবোধ
পেয়ারার স্বর্গ
নিখরচায় জলযোগ
বর্মার মামা
তোতাপাখির পাকামি
বাড়ি থেকে পালিয়ে
গল্প বলি গল্প শোনো
অদ্বিতীয় পুরস্কার
বিদেশী গল্প সংকলন
নাক নিয়ে নাকাল
প্রাণ নিয়ে টানাটানি
শিব্রাম্ দি ভূপর্যটক
কিশোর সঞ্চয়ন
খুনিকে নিয়ে খুনোখুনি
হাতির সঙ্গে হাতাহাতি
দাদা হর্ষবর্ধন ভাই গোবর্ধন
বক্কেশ্বরের লক্ষ্যভেদ
ফাঁকির জন্যে ফিকির খোঁজা
সব সেরা গল্প
শিবরামের গল্প বিচিত্রা
হাসির ফোয়ারা
হাসির টেক্কা
জন্মদিনের উপহার
হিপ্ হিপ্ হুররে !
ইত্যাদি ।

শিবরাম চক্রবর্তী

কলকাতায় এলেন হর্ষবর্ধন

'এমন হন্তে হয়ে কোথায় ছুটচ গোবরা ভায়া? কিসের জন্তে?'

শ্রীমান গোবর্ধন চন্দরকে হন্তদন্ত দেখে দাঁড় করিয়ে আমি তদন্ত করি।

'রাম ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি দাদা!' সংক্ষেপে জানিয়ে আর, খবরটা দিয়েই না সে পরের ক্ষেপে পা বাড়ায়।

'কেন, ডাক্তারের কাছে কেন হে? কার ব্যারাম হোলো আবার?'

'দাদার। ঘোড়ারোগে ধরেছে দাদাকে।'

'ঘোড়ারোগে? ও, বুঝেছি, আজ শনিবার যে!' বলে আমি সমঝদারের ন্যায় ঘাড় নাড়ি—'কিন্তু এই মাঠের রোগ কি সারাতে পারবে ডাক্তার? ডাক্তার কি করবে তার?'

'মাঠের রোগ?'

'রোগও বলতে পারো, রোখও বলা যায়। তবে এ রোগ যার চাপে তাকে আর রোখা যায় না ভাই—সারানো দূরে থাক। এটা একটা যজ্ঞবিশেষ। এ যুগের অশ্বমেধ যজ্ঞই বলতে গেলে। তা, তোমার দাদা যখন একজন যোগ্য ব্যক্তি...'

'যোগ্য ব্যক্তি আমার দাদা? এই রোগ ধরবার যোগ্য বলছেন আমার দাদাকে?' দাদার প্রতি কটাক্ষে ভাই ফোঁস করে ওঠে।

'নয় কেন? অনেক থাকা থাকলেই তো এই রোগে ধরে থাকে। যার ওড়াবার মত অঢেল টাকা নেই সেও এতে ভোগে বইকি, সেটাও ঐ টাকার লোভেই—সে লোকটা ঠিক যোগ্য নয়, সে হচ্ছে এই রোগের ভোগ্য। এই রোগে ভুগে ভুগেই সে কাবার হয়—বুঝেচ?'

'আপনার হেঁয়ালীটা ঠিক ধরতে পাচ্ছি না, মশাই।'

'আরে, অশ্বমেধ যজ্ঞের কথা জানো না? সেটা ছিল সেই ত্রেতায়, দ্বাপরে। আর এটা হচ্ছে কলিযুগের অশ্বমেধ। শনিবার-রেসের মাঠে হয়ে থাকে, যারা সেখানে গিয়ে ঘোড়ার পিছনে ছোটে, তারা বাজি হেরে শেষে সেই মাঠেই শুয়ে পড়ে। ঘোড়াই শুইয়ে দিয়ে যায় তাদের। অশ্বমেধ থেকে যজ্ঞটা তখন রাজসূয় হয়ে দাঁড়ায়। রাজার মতন শুয়ে থাকো তখন—মাঠের ঘাসে। আর পড়ে পড়ে ঘাস খাও এন্তার।'

'আরে দূর মশাই! সে ঘোড়ারোগ ধরেনি দাদাকে। দাদার এ রোগটা আজকের নয়। সেবার সেই দার্জিলিয়ে বেড়াতে গেছলাম না আমরা? তখন থেকেই দাদার এই ঘোড়ারোগ।'

'দার্জিলিংয়ে গেছলে—তখনকার ব্যারাম? ঠিক বুঝতে পারছি না ভাই। তোমার কথাটাই আমার হেঁয়ালি বলে বোধ হচ্ছে।'

'দার্জিলিং গিয়ে ঘোড়া ঘোড়া করে ক্ষেপে গেলেন না আমার দাদা? সেখানে গেলে নাকি ঘোড়ায় চাপতে হয়। ঘোড়ায় চাপা, ঘোড়ায় চেপে বেড়ানো সেখানকার একটা রেওয়াজ নাকি··· এক রকমের বিলাসিতাই!'

'জানি জানি। তা শুধু সেখানকার কেন, সব জায়গারই। ঘোড়া দেখলে খোঁড়া হয়—সব জায়গায় সবাই।' আমি জানাই।

'দাদাও হলেন, কিনে ফেললেন দু-দুটো ঘোড়া। একটা নিজের আর একটা আমার জন্মে। দাদার এই ঘোড়া রোগের গোড়াটা হচ্ছে সেইখানেই। সেই দার্জিলিংয়েই শুরু।'

'বটে? বটে? দার্জিলিংয়ের আমদানি এই অশ্বরোগ?' কৌতূহলী হই: 'শুনি তো আগাগোড়া?'

গোবর্ধন গোড়ার থেকে ঘোড়ার দিকে আগায়:

'সেই হলো গে গোড়ার গলদ! তারপর থেকেই দাদার এই

ঘোড়ার গলদ! তারপর থেকেই দাদা ঘোড়ার যতো গলদ বার করতে লাগলেন। নিত্য নতুন খুঁৎ। আর রোজ রোজ খুঁৎ খুঁৎ।'

'কি রকম?' আমি শুধাই।

একদিন বললেন—"ঘোড়া দুটো এক সাইজের হয়ে গেলরে—ভারী মুস্কিল হল ত!"

আমি বললাম, "মুস্কিল কিসের দাদা? একসাইজের জন্যেই তো ঘোড়া কেনা। ঘোড়ায় চড়া বেশ ভালো একসাইজ, জানো না নাকি?"

দাদা বললেন, "তা আর আমি জানিনে! জানি। সে একসাইজের কথা আমি বলছিনে, যার মানে কিনা ব্যায়াম। বলছিলাম যে এক সাইজের—মানে একরকম চেহারার হয়ে গেল। লম্বায় চওড়ায়, আড়ে বহরে, পায়ে মাথায় অবিকল একরকম। আগাপাশতলা সমান—সেই কথাই বলছিলাম আমি।"

আমি তখন বললাম, "তাতে হয়েছে কী, দাদা? ঘোড়া যখন, একরকমই তো হবে।"

দাদা বললেন, "আরে, সব কিছুরই তো তর তম থাকা দরকার, নইলে তারতম্য বুঝব কিসে? টের পাবো কি করে? যেমন, ধর্—মহৎ মহত্তর মহত্তম, উচ্চ উচ্চতর উচ্চতম..."

"যথা?" আমি জিজ্ঞেস করলাম দাদাকে।

"যেমন ধর, তুই হলি উচ্চ—লম্বায় পাঁচফুট সাড়ে চার ইঞ্চি। ঘাড়েগর্দানে। আমি আবার তোর চেয়ে ঢ্যাঙ্গা—আমি হলাম উচ্চতর। আর ঐ হিমালয় আমার চেয়েও আবার সমুচ্চ—একেবারে উচ্চতম।.........এই ঘোড়াদুটোর কোন তরতম নেই মোটেই। তোর ঘোড়ার থেকে কি করে আমারটাকে যে আলাদা কল্পা যাবে, ভাবছি তাই। যে-ঘোড়া তোর পলকা শরীর বইবে, বয়ে বয়ে হালকা বইবার হ্যাবিট হয়ে যাবে তার, আমি যদি ভুল

করে কখনো তার পিঠে চেপে বসি তো অনভ্যাসের দরুন সে হয়ত শুয়েই পড়বে তক্ষুনি—তারপর হয়ত আর নাও উঠতে পারে। আমার ভার বইতে গিয়ে ইহলীলা সাঙ্গ হয়ে যাবে বেচারার। ভব পারাবার পার হয়ে যাবে একচোটে।"

"তাহলে তো ভারী ভাবনার কথা।" শুনে আমি ভাবিত না হয়ে পারিনা—যেমন ঘোড়ার জন্য, তেমনি নিজের জন্যেও বটে। দাদা চাপলে মারা যদি নাও যায় বেচারা, খোঁড়া হয়ে যাবে নির্ঘাৎ। আর, খোঁড়া পা খালি খানায় পড়ে কে না জানে? আর পড়লে যে সে খালি নিজেই পড়বে তা নয়, আমাকে নিয়েই পড়বে। আমার কী গতি হবে তখন? আমি একটা উপায় বার করলাম শেষটায়, বললাম, "দাড়াও, দাদা, আমার ঘোড়ার লেজটা ছেঁটে দিই, তাহলে তো তুমি টের পাবে, চিনতে পারবে সহজেই।" এই বলে আমি কাঁচি এনে আমার ঘোড়ার লেজটা কচ্ করে কেটে দিলাম। বললাম, "তুমি তর-তম চাইছিলে, দাদা, কেমন এইবার তার উত্তর পেলে তো?"

দাদা বললেন, "তুই যেমন উত্তর দিয়েছিস, আমার ঘোড়াটাকে তেমনি উত্তম করে দি তাহলে।" বলে নিজের ঘোড়ার লেজটা বেশ করে না পাকিয়ে কষে একটা গিঁট বেঁধে দিলেন তিনি। আর বললেন "তোর লেজটা তুই যেমন কাঁচিয়ে দিলি, আমারটা তেমনি আমি পাকিয়ে দিলাম।"

তারপর আমরা দুজনেই পরস্পরের লেজকে বাহবা দিই। তারিয়ে তারিয়ে দেখি আর তারিফ করি।

তারপর হলো কি একদিন, দুজনে ঘোড়ায় চেপে হাওয়া খাচ্ছিলাম, একটা কাঁটা তারের বেড়ায় লেগে দাদার ঘোড়ার ল্যাজটাও হাওয়া খেতে বেরিয়ে গেল...'

'অ্যাঁ? ল্যাজ আবার হাওয়া খেতে বেরয় নাকি?' শুনে

আমি চমকে যাই—'বরং সেই তো আরো হাওয়া করে মশা মাছিদের তাড়ায় ভাই।'

মানে কিনা, কাঁটায় লেগে লেজের আধখানা ছিঁড়ে হাওয়া হয়ে গেল। দেখে তো দাদা কেঁদে ফেললেন প্রায়—"দ্যাখ্, কী হোলো আমার লেজের দশা! আমাদের দুজনকার লেজ এখন একাকার হয়ে গেল। আলাদা করে চিনবার আর জো রইল না কোনো।"

আমি বললাম—"দাঁড়াও, আমার ঘোড়ার ঘাড়ের কেশরগুলো ছেঁটে দিচ্ছি তাহলে।"

ঘোড়ার ল্যাজা মুড়ো দুদিক মুড়িয়ে দিয়ে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করলাম দাদাকে।'

গোবরার দাদৃবাৎসল্যের আমি মনে মনে প্রশংসা না করে পারি না—'তারপর ?'

'তারপর আর একদিন আরেক দুর্ঘটনা। পাশাপাশি দুভাই চলেছি ঘোড়ায় চেপে। দাদা আরাম করে ভুটানী চুরুট ফুঁকতে ফুঁকতে যাচ্ছেন—দাদার আনকোরা এক ব্যায়রাম—সেখানকারই আমদানি ব্যায়রামটা—আমি নাক সিটকে বললাম, "ইস্, তোমার এই চুরুটটা কী কড়া গো দাদা, ভারী বিচ্ছিরি গন্ধ ছাড়ছে।"

দাদা বললেন, "হুঁ, গন্ধটা আমিও পাচ্ছি তখন থেকে। কড়ায় গণ্ডায় দাম নিয়েছে বলেই কি এত কড়া চুরুট দিতে হয়। এমন কোনো কড়ার তো ছিল না আমার।" বলে নাক খাড়া করতে গিয়ে তাঁর নজর পড়ল নিজের ঘোড়ার ঘাড়ের ওপর—"ওমা! চুরুটের আগুনের ফুলকি লেগে ঘোড়াটার ঘাড়ের কেশরগুলো পুড়ে শেষ হয়ে গেল যে! গর্দান প্রায় ফাঁক!"

"যাক্, দুজনেরই ঘাড় ফাঁকা হয়ে, একাকার হয়ে গেল দুটো ঘোড়াই!" আমি বললাম, একটু ভাবিত হয়েই বলতে কি!—

"এখন তোমার চাপ থেকে আমার ঘোড়াটাকে বাঁচাই কি করে ভাবছি তাই।"

বেশ ভাবনায় পড়লেন দাদাও। নিজের চাপল্যের কথা ভেবেই বোধ হয়।

"কি করব তাহলে? আমার ঘোড়াটার কান কেটে দেব নাকি রে?" বলে যেই না দাদা ঘোড়ার কানে কাঁচি বসাতে গেছেন, ঘোড়াটা অমনি দাদার কথায় কান না দিয়ে এমন ছুট লাগালো যে, তার দেখাদেখি আমার ঘোড়াটাও তার পিছু পিছু দৌড় মারলো তৎক্ষণাৎ।

তারপর আর ওদের কারোই পাত্তা পেলাম না আমরা। দুজনে মিলে গেলাম তখন সেই ঘোড়াওয়ালার কাছে যে আমাদের বেচেছিল ঘোড়াগুলো। গিয়ে দেখি কি, যে দুটো ঘোড়াই গিয়ে হাজির হয়েছে সেখানে আগের থেকে।

আমাদের কথা শুনে ঘোড়াওয়ালা বললে, "এ আর এমন কি সমিস্যা, বাবু? ঘোড়া দুটোকে আলাদা করে চিনতে চান, এই তো?"

আমরা বললাম, "হ্যাঁ, তাই।"

সে বললে—"এতো একনজরেই চেনা যায়। ঘোড়াদুটোর ফারাক দেখতে পাচ্ছেন না আপনারা? একটা ঘোড়া সাদা রঙের আর আরেকটা মেটে রঙের—দেখছেন না? এই সাদামাটা কথাটা মনে রাখলেই তো হোলো। তা আর মনে থাকছে না আপনাদের?"

তখন আমরা ধরতে পারলাম।' বলে হাঁপ ছাড়ল গোবর্ধন।

'তা তো ধরলে।' আমি বললাম—'কিন্তু এর থেকে ঘোড়ার ব্যায়রামের কিছুই ত আমি ধরতে পারছি না।'

'ব্যায়রামটা ধরল তারপরেই। ফেরবার সময় ঘোড়া দুটোকে

আমরা সঙ্গে করে আনলাম ত। এই কলকাতায় আসার পর থেকেই শুরু হোলো দাদারটার যতো ব্যায়রাম। আজ সর্দি, কাল কাশি, পরশু পেটের অসুখ লেগেই রয়েছে। দিনরাত হ্যাঁচোর হ্যাঁচোর ফ্যাচোর ফ্যাচোর। আর ঘোড়ার একেকটা হাঁচি? বাব্‌বাঃ! আমাদের একশটা হাঁচির সমান। ঘরদোর কাঁপিয়ে দেয়। রাত্তিরে ঘুম ভেঙ্গে যায় আমাদের ওর হাঁচির আওয়াজে।'

'বলো কি হে!'

'হ্যাঁ দাদা। দার্জিলিঙে গিয়ে যেরকমটা হয়েছিল আমাদেরও গোড়ায়···আমাদের ঠাণ্ডা লেগে হয়েছিল, আর ওদের হয়ত ঠাণ্ডার দেশ থেকে গরমে এসে পড়ায় তাই হয়েছে।'

'তোমার ঘোড়াটারও তাই হয়েছে নাকি?'

'না, আমার ঘোড়ার ততটা নয়। হবার শুরুতেই ওর কানের গোড়ায় গিয়ে বলে দিলাম, "শোনো বাপু, দিনরাত এমন ফ্যাচর ফ্যাচর আমার ভালো লাগে না। এরকম করলে তোমাকে ত্যাজ্যপুত্তুর করে ভাগিয়ে দেব বাড়ির থেকে।" শুনেই না সমঝে নিয়ে শুধরে গিয়েছে ঘোড়াটা। কিন্তু দাদার ঘোড়া একটু আদুরে তো, দাদার আদর পেয়ে পেয়ে বখে গিয়ে এখন উচ্ছন্নে যাবার পথে! দাদাকেও তার সঙ্গে নিয়ে চলেছে এখন।'

'এতো হোলো গে ঘোড়ার ব্যারাম। এর সঙ্গে তোমার দাদার কী? তোমার দাদার হল ঘোড়া-রোগ, মানে, ঘোড়াটাই রোগ আর এ হোলো গিয়ে ঘোড়ার রোগ। একটা মনের, একটা হোলো গে দেহের—আলাদা জিনিস। দুজনের রোগের মিলটা কোনখানে?'

'লক্ষণে মিলছে।' ব্যক্ত করে গোবরা, 'ঘোড়াটা যেমন হাঁচছে, কাশছে, ফ্যাচর ফ্যাচর করছে, তেমনি দাদাও করছেন কাল থেকে। ঘোড়াটার মতই কেঁপে কেঁপে উঠছেন মাঝে মাঝে আবার···'

'কামড়ে দেয়নি ত ঘোড়াটা? তাহলে ঘোড়ার ব্যায়রাম তোমার দাদায় সংক্রামিত হতে পারে বটে। কিন্তু তাহলেও এটা হাইড্রোফোবিয়া নয়, যদ্দুর মনে হয়।'

'হাইড্রোফোবিয়া?' শুনে হতবাক হয় গোবর্ধন। 'সে আবার কি মশাই?'

'সেটা ঠিক অশ্বরোগ নয়, শ্বরোগ বলতে পারো বরং। কুকুরদের হয়। হলে পরে তারা জল খায় না, জল দেখলে ভয় খায়। আর সেই কুকুর মানুষকে কামড়ালে তাকেও ফের সেই রোগ ধরে থাকে, উপরন্তু সেও কুকুরের মতই ঘেউ ঘেউ করে আবার। তবে বেশিদিন করে না, তারপরই মারা পড়ে কিনা।'

'কী সর্বনাশ!' শুনেই গোবরা আঁতকে ওঠে।

'ঘোড়ায় কামড়ালে হাইড্রোফেবিয়া ঠিক না হলেও সেই ধরণের কিছু একটা হতে পারে বা, তোমার দাদা কি ঘোড়ার মতন ডাক ছাড়ছেন এখন? চিঁহি চিঁহি করছেন নাকি?'

'এখনো করেনি। তবে করবে হয়ত মনে হয়।'

'ঘাস রেখে দেখো তো তোমার দাদার সামনে। ঘাস খায় কি না দেখো তো। যদি ঘাস না খায়, খেতে না চায়, ঘাসে যদি তাঁর অনীহা দেখা যায়, তাহলে একটু ভয়ের কথাই হবে বই কি।'

'অনীহা কি?' সে শুধোয়—'ইহা, মানে, এমন কথা তো কখনো শুনিনি।'

'অনীহা মানে অরুচি। শুদ্ধু করে বললাম আর কি।'

শুনে গোবরা আর দাঁড়ায় না। 'রাম ডাক্তারকে কল দিতে চললাম।' ছুটতে ছুটতে বলে। আর বলতে বলতে ছোটে।

একটু বাদেই হর্ষবর্ধন এসে পড়েন, হাঁচতে হাঁচতে কাশতে কাশতে আর কম্পিত কলেবরে—ঠিক যেমন যেমনটি জানিয়েছিল গোবরা।

'জগন্নাথ যে পথে বলরামও সেই পথে নাকি?' তাঁকে দেখে শুধালাম।

'গোবরার ফিরতে দেরি হচ্ছে দেখে আমি নিজেই চলেছি রাম ডাক্তারের কাছে। কল দিতে যাচ্ছি তাঁকে।' বিকল হয়ে তিনি জানান।

'চলুন, আমিও আপনার সঙ্গে যাই।'

ডাক্তারের সামনে হাজির হয়েই হর্ষবর্ধন বেআক্কার হয়ে পড়লেন একেবারে। হাঁচতে লাগলেন এক নাগাড়ে।

হ্যাঁচ্‌চো······হ্যাঁচ্‌চো······হ্যাঁচ্‌চো...

'দাঁড়ান দাঁড়ান, হচ্ছে কী এ! হাঁচছেন কেন এমন করে?' রাম ডাক্তার জানতে চান।

'আমি······আমি কি······হ্যাঁচ্‌চো······ইচ্ছে করে······হ্যাঁ··হ্যাঁ···হ্যাঁচ্‌ছো হ্যাঁচ্‌ছো—ইচ্ছে করে হাঁচছি নাকি?'

হাঁচতে হাঁচতে তিনি বললেন। বলতে বলতে হাঁচতে লাগলেন। আর কাঁপতে লাগলেন সেই সঙ্গে।

দাদাকে কম্পান্বিত দেখে গোবর্ধন, সেখানে সে খাড়া ছিল আগের থেকেই, ধরে নিয়ে একটা চেয়ারে বসিয়ে দিল।

বসে বসে হাঁচতে থাকলেন দাদা!

'কী সর্বনাশ! আপনার হাঁচির চোটে আমার টেবিলের কাগজপত্র সব উড়ে গেল যে! প্রেসক্রিপসন ফ্রেসক্রিপসন সব গেল! কী বিদ্‌ঘুটে হাঁচি মশাই আপনার। এতকাল ধরে ডাক্তারি করছি। কিন্তু এমন সর্বনেশে হাঁচি আমি কখনো দেখিনি। মানুষে এমন হাঁচতে পারে নাকি? অ্যাঁ?'

'ঘোড়ায় পারে ডাক্তারবাবু!' দাদার হয়ে জবাব দিল ভাইটি, 'ঘোড়ার হাঁচি হাঁচছে যে দাদা।'

'ঘোড়ার হাঁচি না হলেও ঘোরতর হাঁচি যে তার ভুল

নেই।' বলেন রাম ডাক্তার, 'এই হাঁচিটা হয়েছে কবের থেকে আপনার ?'

হর্ষবর্ধন জবাব দিতে যান, কিন্তু পেরে ওঠেন না, উলটে আরো বিস্তর হাঁচি পেড়ে বসেন।

'কাল থেকে হয়েছে, আর সেই ঘোড়ার থেকেই।' জানিয়ে দেয় গোবরাই।—'ঘোড়ারোগে ধরেছে আমার দাদাকে। মানে, সেই ঘোড়াটার ব্যায়রামেই, বুঝলেন ডাক্তারবাবু ?'

'ঘোড়ার ব্যায়রামে ? কেন, ঘোড়াকে তো আমি কালকেই ওষুধ দিয়েছি, সেই ওষুধ কি তাকে খাওয়ানো হয়নি তাহলে ?'

'খাইয়েছিলাম তো……হ্যাঁচ্ছো ……খাওয়াতে গেছলাম…… কিন্তু হ্যাঁচ্ছো……ঘোড়াকে ওষুধ খাওয়ানো কি সোজা কথা মশাই ……হ্যাঁচ্ছো……হ্যাঁচ্ছো……তাকে খাওয়াবে কি…… হ্যাঁচ্ছো……তাকে খাওয়াতে গিয়ে না আমাকেই…হ্যাঁচ্ছো… গিলে বসতে হয়েছে সেই ওষুধ ! হ্যাঁচ্ছো।'

'আরে কী সর্বনাশ ! ঘোড়ার ওষুধ আপনি খেয়ে বসে আছেন ! তাহলে তো ঠিকই হয়েছে। ঘোড়ার ওষুধ খেলে যে ঘোড়ার রোগে ধরবে সে বেশি কী। সে ওষুধে ঘোড়া সারে, মানুষকে তা একেবারে সেরে দেয়। তা, ঘোড়াকে না দিয়ে আপনার নিজের খাবার সখ হোলো যে বড়ো ? এমন কিছু মিষ্টি ওষুধ তো নয়।'

'তা নয়। বেজায় বিচ্ছিরি। কিন্তু হতচ্ছাড়া ঘোড়াটা খেলে তো! হাঁ-ই করতে চায় না।'

'আহা, হাঁ করাতে হবে কেন ? একটা কাঁচের ফাঁপা নল দিলুম না আপনাকে ? পাউডারটা সেই নলের ভেতর ভরে ঘোড়ার নাকের মধ্যে গলিয়ে দেবেন, তারপর সেই নলটার অপর দিকে মুখ লাগিয়ে ফুঁ দিলেই সেই ওষুধ ঘোড়ার নাকের গর্ত দিয়ে গিয়ে, গলা দিয়ে গলে, পেটের তলায় চলে যাবে সোজা, বললাম না ?'

'বলেছিলেন ত! করেছিলামও তাই। ওর নাকেও বসিয়েছিলাম নলটা সেইরকম… …কিন্তু……হ্যাঁ……কিন্তু হ্যাঁচ্ছো…' হাঁচতে হাঁচতে কাঁপতে কাঁপতে ব্যক্ত করেন হর্ষবর্ধন—'কিন্তু আমার ফুৎকারের আগে…হ্যাঁচ্ছো……পাজি ঘোড়াটা আগেই ফুঁ দিয়ে বসল যে!'

আমরা যাকে BEE জ্ঞান করি, আদি ও অকৃত্রিম সেই মৌমাছিরাই হচ্ছে মধুর আসল স্রষ্টা, খাঁটি মধু শুধু তাদেরই আমদানি, এই তো আমি জানতাম। কিন্তু আজকাল বিজ্ঞানের অবদানেও যে মধু মিলছে আবার, সেই কথাটাই জানার বাকী ছিল। সেদিন সেটা জানা গেল। জানলাম সেই ফেরিওয়ালার শ্রীমুখেই।

'মধু চাই! চাই খাঁটি মধু!!' পথ দিয়ে হেঁকে যাচ্ছিল সে।

'ডাক্ তো মধুঅলাকে।' হাঁকলেন হর্ষবর্ধনও।—'সকালবেলাটা একটু সুমধুর করা যাক।'

গোবরা গিয়ে ডেকে আনল লোকটাকে।

'খাঁটি মধু বলে হেঁকে যাচ্ছ তো! দেখি তোমার কেমন খাঁটি মধু।' একটুখানি হাতে নিয়ে চেখে দেখলেন দাদা—'ওমা! এ আবার কী মধু গো! এমন টক টক তেতো তেতো কেন! মধু তো মিষ্টি হবে জানি।'

খেয়ে গোবরারও মুখ বেঁকে গেল—'কেমন যেন গেঁজে গেছে মধুটা। তাই না দাদা?'

উপস্থিত আমিও ও-রসে বঞ্চিত রইলাম না।—'হ্যাঁ, যা বলেছো ভাই। মধু তো এমন অম্লমধুর হয় না! মধু নয়, মধুর গন্ধও নেই।' বলতে হোলো আমাকেও।

'এ কোথাকার মধু হে?' জানতে চান হর্ষবর্ধন।

'কেন, আমাদের এই বেলেঘাটার মধু মশাই! আমাদের নিজেদের কারখানায় বানানো।' জানালো সে: 'খাঁটি বৈজ্ঞানিক মধু বাবু!'

'বৈজ্ঞানিক মধু! সে আবার কি হে! মধু কি কারখানায় বানানো যায় নাকি? মধু তো যদ্দূর জানি মৌমাছিদের কাণ্ড। তবে হ্যাঁ, ওদের মৌচাক-কে যদি কারখানা বলো তো··'

'এক কথায়, মৌমাছিদের কাণ্ড-কারখানাও বলা যায় বোধ হয়।' সায় দেয় গোবরা।

'কারখানায় মধু বানাতে পারে না, কী যে বলেন বাবু! কত কী বানায় কারখানা—খাঁটি ঘি থেকে খাঁটি সর্ষের তেল পর্যন্ত... আজকাল বিজ্ঞানীদের অসাধ্য কিছু নেই মশাই! অসম্ভব সব কাণ্ড করছে তারা।' জানালো সেই বিজ্ঞানের ফেরিওয়ালা।

'কি রকম কি রকম?' হর্ষবর্ধন কৌতূহলী হন।

'বনস্পতির সঙ্গে ঘিয়ের রঙে মিলিয়ে খানিক গব্যের সেন্ট মিশিয়ে দিলো, হয়ে গেল খাঁটি গাওয়া ঘি—আঠারো টাকা কেজি! আটানার মালমশলা দাঁড়িয়ে গেল নেট আঠারো টাকায়। শেয়াল কাঁটা বীজের নির্যাসের সঙ্গে সর্ষের তেলের সেন্ট মেশালেই হোলো গে খাঁটি সর্ষপ তৈল—মাছ ভেজে খান—গায়ে মেখে খান—নাকে দিয়ে ঘুম লাগান—কি কারো পায়ে মাখিয়ে কোনো কাজ হাসিল করুন। চমৎকার লাগসই। এমনি আরো কতো জিনিস—কী আর বলব! কী চাই আপনার, বলুন না? এনে দিচ্ছি এক্ষুণি আমাদের কারখানার থেকে।'

'একশ টাকার নোট?' আমি জানতে চাই। আনতে ঠিক না চাইলেও।

'হ্যাঁ, তাও আনিয়ে দিতে পারি কারখানার থেকে বানিয়ে—

উপযুক্ত মেহনতি পেলে। কখানা চাই আপনার? কিন্তু সে নোট বাজারে চালাতে গিয়ে যদি ধরা পড়েন বাবু, জেল হয়ে যায় আপনার, তো তার জন্যে কিন্তুক দায়ী নই আমরা। আমাদের কারখানার বানানো, সেকথাও আপনি ফাঁস করতে পারবেন না কাউকে।'

'আর এই মধু?'

'এও আসল খাঁটি জিনিস। আদত চিনির রসকে ঠিক মতন পাক দিয়ে মধুর সেণ্ট মিশিয়ে তৈরী হয়েছে...'

'রসগোল্লার রসকে মধু বলে চালাচ্ছো?' গুমরে ওঠে গোবরা, 'রসগোল্লাকে বাদ দিয়ে আসলে!'

'বুঝেছি, তোমাদের জাল আর ভ্যাজালের বৈজ্ঞানিক কারখানা। এসব জিনিসে আমাদের দরকার নেই। আমরা খাঁটি মধু খেতে চাই!' বললেন হর্ষবর্ধন। —'দিতে পারো তা আমাদের?'

'খাঁটি মধু কি কেউ খেতে পায় নাকি মশাই! হাসালেন আপনারা।' হাসল ফেরিওয়ালা। ফেরিওয়ালার কথায় গোবর্ধনও হাসল, বলল, 'কেন মৌমাছিরা? তারাও খেতে পায় না?'

'হায় কপাল! মৌমাছিরা খাবে মধু! সেই কপাল কি ওরা করেছে?' ফেরিওয়ালা নিজেকেই মৌমাছি ভ্রম করল কিনা কে জানে, নিজের কপালে হাত দিয়ে বলল কথাটা।—'তাদের খালি মধু বয়ে মরাই সার! শুধু মৌচাকে মধু জমায় আর তাদের সেই চাক ভেঙে ফাঁক করে দেয় অন্য লোকে—'

'সেই অন্য লোকরা তো খেতে পায় তাহলে?'

'কখনো-সখনো।' জানায় সে, 'খাঁটি মধু কেউ খেতে পায় না বাবু। খাঁটি মধু বাঘে খায়।'

'বাঘে খায়!' অবাক হলাম আমরা তার কথায়: 'এর ভেতর বাঘ তুমি আবার পাচ্ছো কোথায়?'

'কেন, সুন্দরবনে। সেখানেই তো যতো বাঘ। আর মধুও পাবেন আপনি সেই অঞ্চলেই। চাকভাঙ্গা মধু।'

'তার মানে?'

'তার মানে, মৌমাছিরা তো গাছের ডালেই মৌচাক বাঁধে। এত গাছ আর কোথায়—সুন্দরবনের জঙ্গল ছাড়া বলুন? আর রাজ্যির মধুয়ালরা সেখানেই মৌচাক কাটতে যায়। খাঁটি মধু পাবেন তাদের কাছেই। খাঁটি মধু খেতে হলে সেখানেই যেতে হবে।'

'তবে তুমি যে বললে খাঁটি মধু খালি বাঘেই খায়? তার মানে তো বুঝলাম না ভাই!'

'তার মানে পাবেন সেইখানেই। তার জন্যেও যেতে হবে সেই সুন্দরবন।'

মধুর ফেরিওয়ালা চলে যাবার পর হর্ষবর্ধন চাঙ্গা হলেন আবার, 'বেশ যাব। যাব সেই সুন্দরবনেই। খাঁটি মধু খেতেই হবে আমায়। না খেয়ে স্বস্তি নেই—জীবন বৃথা।'

'চাপল বাই তো কটক যাই!' মুখ ব্যাজার করলেন হর্ষবর্ধনের বৌ, 'বাঘের পেটে না গিয়ে বুঝি স্বস্তি হচ্ছে না তোমার?'

'আমি কি মধু যে বাঘ আমায় গিলতে যাবে?' হর্ষবর্ধন জবাব দেন: 'সুন্দরবনের বাঘরা খাঁটি মধুই খায় খালি। শুনলে না? তাছাড়া, আমরা কি বনবাসে যাচ্ছি নাকি? আমরা তো থাকব, বন থেকে দূরে, বনের আশেপাশে ধারে কাছে কোথাও—দুদিনের জন্যেই খালি। মধুয়ালরা মৌচাক কেটে ভাঁড় ভর্তি করে মধু নিয়ে শহরতলীর বাজারে বেচতে আসবে আর আমরা তাদের কাছ থেকে কিনে নিয়ে আমাদের জারে ভরব—'

'পেটে ভরব না ?' গোবরা শুধায়।

'সে আর বলতে। পেটে যা ধরে তারপরে তো জারে। জারে জারে। জারের পর জারে। হাজারে হাজারে। মানে, যতগুলো জার পাওয়া যাবে সেখানকার বাজারে। তুইও তো যাবি। তুইও খাবি তো।'

'কিন্তু বাঘ—বাঘে যদি—' গোবরা আমতা আমতা করে বলে, 'বাঘে যদি আমায় বাগে পায় ?'

'বাঘ তোর দিকে ভুলেও তাকাবে না। তুই এমন কিছু মধুর নোস্। তা ছাড়া আমি রয়েছি না তোর সঙ্গে ?' সাহস দেন দাদা—'আমাকে দেখলে—মানে রাজভোগ দেখতে পেলে কেউ কি আর মিহিদানার দিকে নজর দেয় ? আপনিও চলুন না শিব্রাম্‌বাবু সুন্দরবন ? খাটি মধু খাবেন এখন।'

'কোন্ দুঃখে ?' আমি বলি: 'আমার এমন সুন্দর সুন্দর বোন থাকতে—ইতুকে দেখেছেন, বিনিকে দেখেছেন তো। তারা থাকতে মধু খেতে আমায় সুন্দরবন যেতে হবে কেন ? বোনেরা যা আমাকে খেতে দেয় তাই আমার কাছে মধুর। মধুর থেকে কিছু কম মিষ্টি নয়কো।'

'তাহলেও আপনি সঙ্গে যান।' হর্ষবর্ধনের স্ত্রী অনুরোধ করেন আমায়: 'আপনি সঙ্গে থাকলে আমি খুব ভরসা পাব। উনি যদি রাজভোগ হন তো আপনি বাদশাভোগ, আপনাকে দেখলে বাঘে··· মানে, আপনার একটু বুদ্ধিশুদ্ধি আছে তো—আপনি ওঁর চৌকি দিতে পারবেন।'

যে-সার্টিফিকেট আমায় কেউ দেয় না, সেই বুদ্ধিশুদ্ধির প্রশংসায় মনে মনে গললেও বাইরে আমি টলি না। বলি, 'আমায় কেন দিতে হবে চৌকি ? তার জন্যে চৌকিদারই ত রয়েছে। কোম্পানির মুলুকে কোথায় নেই চৌকিদার ?

রাতদিন চৌকি দেয়াই তাদের কাজ। তারাই চৌকি দেবে এখন।'

'তাহলে আপনি যান। আপনি গেলে আমি মনে স্বস্তি পাব।' উপরোধ করেন উনি তার পর।

'বৌদি যখন উপরোধ করছেন—' গোবরাও আমায় সাধে। 'তখন চলুন না! উপরোধে লোকে ঢেঁকি গেলে কিন্তু দাদাকে তো আপনার গিলতে হচ্ছে না, যাতে বাঘে না গেলে সেইটা দেখতেই শুধু আপনার যাওয়া।'

'আসল কথা কি জানেন?' আমি ব্যক্ত করি: 'আমি হচ্ছি দারুণ কলকাতাসক্ত লোক—কলকাতা থেকে কোথাও যাওয়া আমার পক্ষে শক্ত ব্যাপার। আমার নিজের আস্তাবল ছেড়ে আর কোথাও অন্য কোনো আস্তানায় যাবার আমার বাসনা হয় না। মধু খেতে সুন্দরবন যাওয়া দূরে থাক অমৃতস্বাদ নিতে স্বর্গে যেতেও আমার সাধ হয় না। কলকাতা ছেড়ে কোথাও যাবার কোনো অর্থ পাই না আমি।'

'পান না অর্থ?' হর্ষবর্ধন যেন ক্ষেপে যান শুনেই না।—'এই নিন অর্থ! এক হাজার, এই নিন আরেক হাজার, এই নিন আরো এক হাজার, এই আবার আরেক…'

পাঁচ হাজার টাকার পাঁচখানা নোটের বাণ্ডিল তিনি আমার হাতে তুলে দিলেন—'এবার তো পেলেন অর্থ? আর তো কলকাতা ছাড়ার কোনো বাধা রইল না আপনার?'

বলাই বাহুল্য! টাকা পেলে লোকে জাহান্নামে যেতে পারে। বাঘের মুখে যাওয়া আর এমন কী! আমিও রাজি তৎক্ষণাৎ।

হর্ষবর্ধনের গিন্নী বললেন গোবরাকে—'ঠাকুরপো, তুমি তাহলে শ পাঁচেক টাকা এক্ষুণি টেলিগ্রাম মণিঅর্ডার করে দাও সুন্দরবনের চৌকিদারকে—দিন পাঁচেকের জন্য তাকে চৌকি দিতে হবে—দিন

রাতের চৌকি। কবে যাচ্ছো সেটাও জানিয়ে দাও তার করে। তোমরা ফিরে না আসা পর্যন্ত আমার ঘুম হবে না ভাই!'

যথাদিবসে যথাস্থানে পৌঁছে দেখি আমাদের সসম্মানে অভ্যর্থনার জন্য স্বয়ং চৌকিদার দাঁড়িয়ে। ঠিক জানি না, তবে চৌকিদারই হবেন বোধ হোলো।

'এই যে আপনারা এসে গেছেন বাবুরা! আপনাদের চৌকিও মজুদ—সেও এসে গেল বলে।'

'ও! এসে গেলেন! তা, চৌকিদারবাবু আসছেন কখন?' গোবর্ধন শুধালো।

'চৌকিদার তো আমিই বাবু।' সে বললে—'আমি আপনাদের চৌকির কথা বলছিলাম। পাঁচজনের মত চৌকি চেয়েছেন আপনারা? তাই সেটা ফরমাস দিয়ে বানাতে হোলো কিনা।'

'পাঁচজনের জন্য নয়, পাঁচদিনের জন্য চৌকি দিতে হবে আপনাকে।' আমি চৌকিদারের ভুল শুধরাই।

'পাঁচদিনের কথা কী বলছেন বাবু। সুন্দরবনের সুঁদরি কাঠের চৌকি। সুন্দরবনের নাম এই সুঁদরি কাঠের জন্যেই জানেন ত? এমন টেঁকসই কাঠ আর হয় না বাবু—আপনাদের ফ্যাশানী টীক কাঠ কোথায় লাগে! ভারী মজবুত বাবু। পাঁচদিন কী বলছেন পাঁচ পুরুষের জন্যে আপনারা নিশ্চিন্দি।'

দেখতে দেখতে চারজন মানুষের কাঁধে চেপে হেঁইয়ো হেঁইয়ো করে পেল্লায় এক চৌকি এসে হাজির!

'বাজিয়ে দেখুন না বাবু কেমন টেঁকসই। বসে দেখুন, শুয়ে দেখুন, এর ওপর লাফিয়ে দেখুন—কি রকম মজবুত!'

'তুমি বলছো পাঁচ পুরুষের জন্য নিশ্চিন্তি!' হর্ষবর্ধন বললেন—'কিন্তু আমাদের এই আড়াই পুরুষই আঁটলে হয়। আমরা হৃষ্ট-পুষ্ট দুজন—' আমাকে দেখিয়ে তারপর গোবরার দিকে তাকিয়ে

ভ্রুভঙ্গী করলেন—'আর আমার ভাইটিকে যদি অর্ধপুরুষ ধরি : ও এখনো নাবালক তো।'

'আমি অর্ধপুরুষ? আমি নাবালক?' ফোঁস করে ওঠে গোবরা—'কী আলতু ফালতু বকছো সব দাদা?'

'নাবালক নাই হলি, আমি একাই তোদের তিন পুরুষের ধাক্কা—সেটা দেখেছিস? আমি ঐ চৌকিতে শুয়ে যদি বা একটু নিশ্চিন্তি হয়ে ঘুমুই, তুই আমায় নিশ্চিন্তি হতে দিবি কি? ঘুমের ঘোরে পাশ ফিরতে কখন আমার চাপে পড়ে চ্যাপটা হয়ে হয়ে যাস সেই ভয়েই তো আমার ঘুম হবে না। না বাপু চৌকিদার, তুমি আরো দুখানা চৌকি ছ্যাখো। আমি একটু নিশ্চিন্তি হয়ে ঘুমোতে চাই। সেগুলো এক এক পুরুষের মতন হলেও ক্ষতি নেই।'

চৌকিদার তখন তার মানুষদের আরো দুখানা আনবার জন্য হুকুম করল। তারপর বলল—

'এই চৌকিটার দরুণ বিশ টাকা—আরো দুখানা খাট হবে তো, তাদের দাম দশ টাকা করেই ধরুন—এই গেল চল্লিশ টাকা—বাকী থাকে চারশো ষাট। ধরুন এই আপনার চারশো ষাট।' ট্যাক সে এক গোছা টাকা বার করে বসে—'চৌকির জন্যে এত টাকা পাঠিয়েছেন কেন বাবুরা? এত লাগে না তো। সুঁদরি কাঠের চৌকি হলেও লাগে না।'

'আহা, এই চৌকি দেবার জন্য তোমাকে দেওয়া হয়েছে নাকি টাকাটা? তোমাকে আসল চৌকি দিতে হবে যে। তুমি চৌকিদার না? পাহারা দেবে আমার দাদাকে, দিন রাত পাহারা—চার পাঁচ দিন থাকব আমরা, এই কদিন কেবল—আর সেই জন্যেই বৌদি তোমাকে টি-এম-ও করে ওটা পাঠিয়েছে। ও টাকা তুমি রাখো।'

'কিসের পাহারা?' চৌকিদার একটু অবাক হয়।

'বাঘের হাত থেকে বাঁচাবে আমার দাদাকে—সেই সঙ্গে একটু একটু আমাদেরও। সুন্দরবনে বাঘের ভয় নেই কো?'

'তা তো আছে বাবু, রীতিমতই আছে—কিন্তু বাঘের হাত থেকে কি কেউ বাঁচাতে পারে? কথায় বলে, সাপের লেখা বাঘের দেখা। বাঘ দেখলো কি নিলো। এক লাফে সোজা ঘাড়ের ওপর এসে পড়বে, পরের লাফে লোকটাকে মুখে করে নিয়ে পালাবে চোঁ চা। কেউ বাঁচাতে পারবে না—চৌকিদার দূরে থাক, কোনো দারোগার বাপের সাধ্যি নেই যে বাঁচায়। জজ ম্যাজিস্টরও না। বাঘকে তো অ্যারেস্টো করা যায় না বাবু, দায়রা সোপর্দ চলে না।'

'সে কি গো!' শুনে আঁতকে উঠি: 'তবে যে শুনলাম এখানকার বাঘ শুধু মধুই খায় খালি। মধু খেয়েই বেঁচে থাকে নাকি।'

'তা, আপনারা শিকার করতে এসেছেন ত?' আমার কথার জবাব দেয়া বাহুল্য বোধ করে সে শুধায়, 'বাঘ শিকার করতেই তো আসেন এখানে ভদ্দর লোকরা। তা আপনারা তো বাঘ শিকারেই…?'

আমরা অস্বীকার করায় সে বললে, 'শিকার করবেন না তো কি কারণে এসেছেন এই সোঁদরবনে? চৌকির জন্যে নয় নিশ্চয়?'

'আমরা মধু খেতে এসেছি।' ঢোঁক গিললেন দাদা।

'তা মধুর জন্যে জঙ্গলের ভিতরি আপনাদের সেঁধোতে হবে না। এখান দিয়ে, এই সামনের পথ ধরে মধুর হাঁড়ি ঘাড়ে করে মধুয়ালরা যাবেন সব, এই বাংলোয় বসেই কিনে কিনে খেতে পাবেন। এত দূরে এখানে বাঘের কোনো ডর নেই। বাঘ অ্যাদ্দূর বড় একটা আসে না। আপনারা এখানে বসেই খাঁটি মধু খাবেন—যত খুশি।'

'তা না হয় হোলো। কিন্তু খাঁটি মধু বাঘে খায় বলে একটা কথা শুনেছিলাম যে—তার মানেটা কী, আমরা জানতে চাই।'

'মানে আজ সকালেই একটা দেখা গেছে বাবু! হাঁড়ি ভর্তি মধু নিয়ে মধুয়ালটা জঙ্গলের পথ ধরে আসছিল, এমন সময় সামনে ছাখে এক বাঘ—বাঘটাও তাকে দেখেছিল। আর যাবে কোথায়? সাপের লেখা বাঘের দেখা—কথায় বলে না? মধুয়াল ভাবল, আর তো বাঁচন নেই, মারা যেতেই লবে—তবে মধুটা কেন বেঘোরে মারা যায়? চিরকাল মধু বয়েই মরি, খাবার সুযোগ পাই না—মধু চাখতে পাই না কখনো। মারা যাবার আগে মধুটা সাবাড় করা যাক। বলে বেবাক মধুর হাঁড়ি চোঁ চোঁ করে ফাঁক করে দিয়েছে...'

'তারপর?' আমরা সবাই রুদ্ধশ্বাস।

'তারপর সেও মধুটা শেষ করেছে আর বাঘটাও এসে তাকে খতম করেছে। মধু গেল তার পেটে সে গেল বাঘের পেটে—খাঁটি মধুর সবটাই বাঘের পেটে গেল তো? গেল কিনা? পেটে পেটে পাচার হয়ে গেল সব।'

'তা বটে।' হাঁফ ছাড়লাম আমরা।

কিন্তু বেশিক্ষণ হাঁফ ছাড়তে পারা গেল না। চৌকিদারের সঙ্গে গোবরা মাছ ধরতে গেছল নদীর ধারে। কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এল সে।

'কাঁদছ কেন ভাই?' আমি শুধাই। তারপর তার শূন্য হাতের দিকে তাকিয়ে বলি—'মাছ পাওনি তাই? তাতে কী হয়েছে? মাছ ছাড়া কি চলে না একদিন?'

'কাঁদছিস ক্যান র‍্যা? কী হয়েছে? বাঘে তোকে ধরে খায়নি তো? আঁচড় কামড়ে দিয়েছে নাকি? খাবলে খুবলে নিয়েছে হাত পা? আয় দেখি।' দাদা ওর আগাপাশতলা টিপে টিপে ছাখেন —'আস্তই তো আছিস! বাঘের পেটে যাস নি তো? তবে কাঁদছিস কেন এমন?'

'বাঘের পেটে গেলে কি আর কাঁদবার ফুরসুৎ পেত বাবু!' বলল চৌকিদার।

'তাহলে?' আমি জিজ্ঞেস করি: 'তাহলে হয়েছেটা কী?'

'যা হবার হয়ে গেছে।' বলল সে: 'আমার দাদা আর বেঁচে নেই মশাই!'

'অ্যাঁ? সে কি রে? অ্যাঁ?' আঁতকে ওঠেন হর্ষবর্ধন: 'বেঁচে নেই বলিস কিরে?'

'হ্যাঁ। দেখে এলাম নদীর ধারে। দাদার লাশ পড়ে আছে... আমি আর চৌকিদারবাবু দুজনেই দেখলাম তো।'

ঘাড় নেড়ে সায় দিল চৌকিদার: 'যথার্থ বাবু!'

'দাদার লাশ!' আমি দাদার দিকে তাকালাম, হ্যাঁ, দাদা একখান লাশ বটেন! কিন্তু দাদা এমন জলজ্যান্ত খাড়া থাকতে দাদার লাশ হয় কি করে? এ লাশ তো সে লাশ···মানে, সে লাশ তো এ লাশ নয়।

'বিশ্বাস হয় না।' আমি বললাম।—'সেটা তোমার দাদার লাশ নয় কখনো। দাদার কোনো বিলাস হতে পারে বরং।'

'দেখে এলাম নিজের চক্ষে। আমরা দুজনে স্বচক্ষে দেখলাম। বাঘে মেরে ফেলে রেখে গেছে দাদাকে। পরে রাত্তির হলে এসে নিয়ে যাবে লাশটাকে, লোকগুলো বলল। নিয়ে গিয়ে খাবে তখন।'

'বাঘে খাবে আমায়?' হর্ষবর্ধনের কাঁপুনি দেখা দেয়: 'আমাকে মানে, আমার সেই লাশটাকে নিয়ে গিয়ে খাবে রাত্তিরে। তুই বলছিস কীরে?'

'আমি কী বলছি! আমি কেন বলব! আমি কি বাঘের চালচলন জানি, না, তাদের মতিগতির খবর রাখি? যারা দাদার লাশটার চারপাশে জড়ো হয়েছিল তারাই সব বলাবলি করছিল।'

'বার বার তুই আমায় লাশ লাশ বলবি না, বলে দিচ্ছি।'

খাপ্পা হয়ে ওঠেন দাদা—'সাবধান করে দিচ্ছি তোকে। অ্যাঁ—এমন কি মোটা আমি যে লাশ হয়ে গেছি—অ্যাঁ?'

'রাগছেন কেন কর্তা!' চৌকিদার মাঝে পড়ে মিটিয়ে দিতে যায়: 'মারা গেলে সবাই লাশ—তা মোটাই কি আর শুঁট্‌কোই কি। আমিও লাশ আপনিও লাশ।'

'তুমি ঠিক ঠিক দেখেছো তো হে?' গোবরাকে আমি জেরা করি— 'ও যে তোমার দাদাই—সেটা ঠিক?—চোখের কোনো ভ্রম হয়নি ত?'

'এই ভর দুপুরে ভ্রম? আপনি বলছেন কি মশাই? অবিকল আমার দাদা। আমার দাদাকে আমি দেখিনি নাকি? জন্ম থেকে দেখে আসছি—রাতদিন দেখছি আমার দাদাকে। সেই নাক, সেই মুখ, সেই ভুরু—সেই চোখ—চোখটা অবশ্যি এখন একটু বোজা আর নাকটা আধখানা খাবলানো—দাদাকে একটু নাকাল করে গেছে বাঘটা—তাহলেও আমার দাদাই ঠিকঠিক।'

'আমার মতন এই রকম লম্বা চৌড়া?' হর্ষবর্ধন অনুসন্ধিৎসু হন তখন: 'এইসন্ থাব্‌বল্ থাঁইয়া?'

'অবিকল। এই রকম—কী বললে না? থাব্‌বল থাঁইয়া? রাষ্ট্র ভাষায় কী যেন বললে, কে জানে! তবে এই রকমই থলথলে চেহারাই বটে।'

'গোদা গোদা হাত পা?' আমি জানতে চাই: 'ঘাড়ে গর্দানে?'

'হুবহুব্।' সে জানায়: 'এমন কি, এই একই রকমের কোট গায়। মোজা পায়। একই ধরনের জুতো।'

'কোটের গলার বোতাম সব আটকানো?' দাদা জানতে চান, 'তোর বৌদির এটে দেওয়া এই রকমটা?'

'হ্যাঁ ওই রকম। পরণে ওই রকম আটপৌরে খাটো আট হাতি ধুতি।'

'তাহলে তুই ঠিকই দেখেছিস।' বলে হর্ষবর্ধন কাঁদতে বসেন—'যা, তোর বৌদিকে তার করে জানিয়ে দে তাহলে যে সে আজ সকালে বিধবা হয়েছে। মাছ টাছ আর না যেন খায়। শাড়ি ছেড়ে থান ধুতি পরে। পরে ঠিক দিন দেখে মাথা মুড়িয়ে ছেরাদ্দটা করে যেন আমায়।' তিনি কাঁদতে থাকেন: 'আর, বছর খানেক বাদে যেন গয়ায় গিয়ে আমার পিণ্ডিটা দিয়ে আসে। এই লাশজন্ম থেকে সেই কৈলাসে গিয়ে দেবাদিদেব মহাদেবের ছিচরণে ঠাঁই পাই যেন—বাবার শ্রীপাদপদ্মে।'

কাঁদতে কাঁদতে যেন কী মনে পড়ে, হঠাৎ টনক নড়ে তাঁর—'আচ্ছা, গোঁপ ছিল লোকটার? এই রকমের পুরুষ্টু গোঁফ?'

'দেখেছি কি?' গোবরা চৌকিদারের দিকে জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকায়: 'মনে পড়ছে না ত? গোঁফ ত দেখিনি মনে হচ্ছে।'

'না—গোঁফ ছিল না লোকটার।' চৌকিদার জানায়: 'এ ধরনের গোঁফ এ তল্লাটে কারো নেই। আমি দেখেছি ভাল করে তাকিয়ে।'

'তবে সে আমি নই।' কান্না থামিয়ে লাফিয়ে ওঠেন হর্ষবর্ধন: 'তাহলে সে অন্য কেউ হবে।'

হর্ষবর্ধনের হর্ষধ্বনি শুনি আমরা এতক্ষণের পর।

হর্যবর্ধনকে তারপর আর রোখা গেল না কিছুতেই। বাঘ মারবার জন্য তিনি মরীয়া হয়ে উঠলেন।

'আরেকটু হলেই তো মেরেছিল আমায়।' তিনি বললেন, 'ওই হতভাগা বাঘকে আমি ছাড়চি না।'

'কি করবে দাদা তুমি বাঘ নিয়ে? পুষবে নাকি?'

'মারব ওকে। আমাকে মেরেছে আর ওকে আমি রেহাই দেব ভেবেছিস?'

'তোমাকে আর মারল কোথায় ? মারতে পারল কই ?'

'একটুর জন্যেই বেঁচে গেছি না ? মারলে তোরা বাঁচাতে পারতিস আমায় ?'

গোবর্ধন চুপ করে থাকল, সে কথার কোনো জবাব দিতে পারল না।

'এই গোঁফটাই আমায় বাঁচিয়ে দিয়েছে বলতে কি !' বলে নিজের গোঁফ দুটো তিনি একটু চুমরে নিলেন—'এই গোঁফের জোরেই বেঁচে গেছি আজকে ! নইলে ওই লোকটার মতই হাল হত আমার···'

আমি বললাম—'যা বলেছেন ! গোঁফ সামান্য বস্তু নয়। জনৈক কবি বলে গেছেন, গোঁফকে বলে তোমার আমার গোঁফ কি কারো কেনা ? গোঁফের আমি গোঁফের তুমি গোঁফ দিয়ে যায় চেনা।'

'যথার্থ। গোঁফের আমাকে এই গোঁফেই বাঁচিয়েছে মশাই ! নইলে—মৃতদেহটির দিকে তিনি অঙ্গুলি নির্দেশ করেন—গোঁফ বাদ দিয়ে, বোগোঁফের বকলমে ও তো খোদ আমিই। আমার মতই হুবহু। ও না হয়ে আমিও তো হতে পারতাম। কী হত তাহলে বলুন ত ?'

আমরা সে-কথার কোনো সদত্তর দিতে পারি না।

'এই চৌকিদার !' হঠাৎ তিনি হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন—'একটা বন্দুক যোগাড় করে দিতে পারো আমায় ? যত টাকা লাগে দেব।'

'বন্দুক নিয়ে কী করবেন বাবু ?'

'বাঘ শিকার করব, আবার কি ? বন্দুক নিয়ে কী করে মানুষ ?' বলে আমার প্রতি ফিরলেন : 'আমার এই বীরত্ব-কাহিনীটাও লিখতে হবে আপনাকে। যত সব আজেবাজে গল্প লিখেছেন আমাকে নিয়ে। লোকে পড়ে হাসে কেবল। সবাই আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করে আমি শুনেছি।'

'তার কী হয়েছে? লিখে দেব আপনার শিকার কাহিনী। এই সেটা হাস্যকর না হয়ে বেশ রোমাঞ্চকরই হবে। বাঘ মারার গল্পটাই লিখে দেব আপনার। কিন্তু তার জন্যে বন্দুক ঘাড়ে এত কষ্ট করে প্রাণপণে বাঘ মারতেই বা হবে কেন? বনে বাদাড়েই বা ঘুরতে হবে কেন? বাঘ মারতে এত হ্যাঙ্গামের কী আছে? বন্দুকের কোনো দরকার নেই। সাপ ব্যাঙ একটা হলেই হোলো। কলমের কেরামতিতে সাপ ব্যাঙ দিয়েই বাঘ মারা যায়।'

'মুখেন মারিতং বাঘং?' গোবরা টিপ্পনি কাটে।

'আপনি টাকার কথা বলছেন বাবু!' চৌকিদার এতক্ষণ ধরে কী যেন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন ছিল, মুখ খুলল এবার—'তা, টাকা দিলে এনে দিতে পারি বন্দুক—ছুদিনের জন্যে। আমাদের দারোগা সাহেবের বন্দুকটাই চেয়ে আনতে পারি। বাঘের ভারী উপদ্রব হয়েছে এধারে—মারতে হবে বাঘটাকে—এই বললেই তিনি ওটা ধার দেবেন আমায়। ব্যাভারের পর ফেরৎ দিয়ে আসব আবার।'

'শুধু বন্দুক নিয়ে কী করব শুনি? ওর সঙ্গে গুলি কার্তুজ টোটা ইত্যাদি এসবও তিনি দেবেন ত? নইলে বন্দুক দিয়ে পিটিয়ে কি বাঘ মারা যায় নাকি? তেমনটা করতে গেলে তার আগেই বাঘ আমায় সাবড়ে দেবে।'

'তা কি হয় কখনো? বন্দুকের সঙ্গে কার্তুজ টার্তুজ দেবেন বই কি বাবু।'

'তাহলে যাও, নিয়ে এসো গে চটপট। বেশি দেরি কোরো না। বাঘ না মেরে নড়ছি না আমি এখান থেকে! জলগ্রহণ করব না আজ।'

'না না, বন্দুকের সঙ্গে কিছু খাবার টাবার নিয়ে এসো ভাই।' আমি বাতলাই: 'খালি পেটে কি বাঘ মারা যায় নাকি? আর কিছু না হেকে, একটু গাঁজা তো খেতেই হবে অন্তত:।'

'আনব নাকি গাঁজা ?' সে শুধায়।

'গাঁজা হলে ত বন্দুকেরও দরকার হয় না। বনে বাদাড়েও ঘুরে মরতে হয় না। বন্দুকের বোঝা বইবারও কোনো প্রয়োজন করে না। ঘরে বসেই বাঘ মারা যায় বেশ।' আমি জানাই।

'না না গাঁজা ফাঁজা চাই না। বাবু ইয়ার্কি করছে তোমার সঙ্গে। তুমি কিছু রুটি মাখন বিস্কুট চকোলেট—এই সব এনো, পাও যদি।' গোবরা বলে দেয়।

বন্দুক এলে হর্ষবর্ধন আমায় শুধাল—'কি করে বাঘ মারতে হয় জানেন আপনি ?'

'বাগে পেলেই মারা যায়। কিন্তু বাগে পাওয়াই দায় ওদের। বাগে পাবার চেষ্টা করতে গেলে উলটে নাকি বাঘেই পায় তাকে।'

'বনের ভিতরি সেঁধুতে হবে বাবু।' চৌকিদার জানায়।

গভীর বনের ভেতর পা বাড়াতেই প্রথমেই যে এগিয়ে এসে আমাদের অভ্যর্থনা করল সে কোনো বাঘ নয়, বাঘের বাচ্চাও না—আস্ত একটা কোলা ব্যাঙ।

ব্যাঙ দেখে হর্ষবর্ধন ভারী খুশি হলেন, বললেন, 'এটা শুভ লক্ষণ। ব্যাঙ ভারী পয়া রে, জানিস গোবরা ?'

'মা লক্ষ্মীর বাহন বুঝি ?'

'সে তো প্যাঁচা।' দাদা জানান—'কে না জানে !'

'যা বলেছেন।' আমি ওঁর কথায় সায় দিই—'যতো প্যাঁচালো লোকই হচ্ছে মা লক্ষ্মীর বাহন। প্যাঁচ কসে টাকা উপায় করতে হয়, জানো না ভাই ?'

'তাহলে ব্যাঙ বুঝি সিদ্ধিদাতা গণেশের···না, না······' বলে গোবরা নিজেই শুধরে নেয়—'সে তো হোলো গে ইঁদুর।'

'আমি পয়া বলেছি কারো বাহন টাহন বলে নয়। আমার

নিজের অভিজ্ঞতায়। আমরা প্রথম যখন কলকাতায় আসি, তোর মনে নেই গোবরা? ধরমতলায় একটা মনিব্যাগ কুড়িয়ে পেয়েছিলাম?'

'মনে আছে। পেয়েই সেটা তুমি পকেটে লুকিয়ে ফেলেছিলে, পাছে কারো নজরে পড়ে। তারপর বাড়ি এসে খুলে দেখতে গিয়ে দেখলে…'

'দেখলাম যে চারটে ঠ্যাং। মনিব্যাগের আবার ঠ্যাং কেন রে? তার পরে ভালো করে পরীক্ষা করে দেখি কি, ওমা, ট্রামগাড়ির চাকার তলায় পড়ে চ্যাপটা হয়ে যাওয়া ব্যাঙ একটা।'

'আর কিছুতেই খোলা গেল না ব্যাগটা।'

'গেল না বটে, কিন্তু তারপর থেকেই আমাদের বরাত খুলে গেল। কাঠের কারবারে ফেঁপে উঠলাম আমরা। আমরা এখানে টাকা উড়িয়ে দিতে এসেছিলাম, কিন্তু টাকা কুড়িয়ে থই পাইনে তারপর।'

'ব্যাঙ তাহলে বিশ্বকর্মার বাহন হবে নির্ঘাৎ। ভাদ্র মাসে বিশ্বকর্মার পূজো আর সেই সময়েই যত ব্যাঙ ডাকাডাকি করে— সেইজন্যেই বুঝি! 'যতো কারবার আর কারখানার কর্তা তো ঐ ঠাকুরটি। কী বলেন মশাই আপনি? ব্যাঙ বিশ্বকর্মার বাহনই তো বটে?'

'ব্যাঙ না হলেও ব্যাঙ্ক ত বটেই। বিশ্বের কর্মীদের সহায়ই হচ্ছে ঐ ব্যাঙ্ক। আর বিশ্বকর্মাদের বাহন বোধহয় ওই ওয়ার্লড ব্যাঙ্ক।'

'ব্যাং থেকেই ব্যাংক। একই কথা।' হর্ষবর্ধন উচ্ছ্বসিত হন। —'ব্যাঙ থেকেও আমার আমদানি, আবার ব্যাঙ্ক থেকেও।'

'ব্যাঙটাকে দেখে একটা গল্পের কথা মনে পড়লো।' আমি বলি—'জাম্পিং ফ্রগের গল্প। মার্কটোয়েনের লেখা। ছেলেবেলায় পড়েছিলাম গল্পটা।'

'মার্কটোয়েন মানে?' হর্ষবর্ধন জিজ্ঞেস করেন।

'এক লেখকের নাম। মার্কিন মুলুকের লেখক।'

'আর জাম্‌পিং ফ্রগ?' গোবরার জিজ্ঞাসা।

'জাম্‌পিং মানে লাফানো, আর ফ্রগ মানে হচ্ছে ব্যাঙ। মানে সেই ব্যাঙ যে কিনা লাফায়।'

'লাফিয়ে ফ্রগ বলুন তাহলে মশাই।'

'তাও বলা যায়। গল্পটা পড়ে আমার হাসি পেয়েছিল তখন। তবে ব্যাঙের পক্ষে ব্যাপারটা তেমন হাসির হয়েছিল কিনা আমি জানি না। গল্পটা শুনুন এবার। মার্কটোয়েনের সময়ে সেখানে, ঘোড় দৌড়ের মতন বাজি ধরে ব্যাঙের দৌড় হত। লাফিয়ে লাফিয়ে যে ব্যাঙ, যার ব্যাঙ, আর সব ব্যাঙকে টেক্কা দিতে পারত সেই মারত বাজি। সেইজন্যে করত কি, অন্য সব ব্যাঙকে হারাবার মতলবে যাতে তারা তেমন লাফাতে পারে—লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে যেতে হবে তো—সেইজন্য সবার আড়ালে এক একটাকে ধরে পাথর কুঁচি খাইয়ে বেশ ভারী করে দিত কেউ কেউ।'

'খেত ব্যাঙ সেই পাথর কুঁচি?'

'অবোধ বালক ত! যাহা পায় তাহাই খায়।'

'আমার বিশ্বাস হয় না।' হর্ষবর্ধন ঘাড় নাড়েন।'

'পরীক্ষা করে দেখলেই হয়।' গোবরা বলে: 'এই ত পাওয়া গেছে একটা ব্যাঙ—বাজিয়ে দেখা যাক না এখন—খায় না খায়।'

গোবরা কতকগুলো পাথর কুচি যোগাড় করে এনে গেলাতে বসল ব্যাঙটাকে। হাঁ করিয়ে ওর মুখের কাছে কুঁচি ধরে দিতেই, কী আশ্চর্য, তক্ষুণি সে গোপালের ন্যায় সুবোধ বালক হয়ে গেল। একটার পর একটা গিলতে লাগল টুপটাপ করে। অনেকগুলো গিলে ঢাউস হয়ে উঠল ওর পেট। তারপর মাথা

হেঁট করে চুপচাপ বসে রইল ব্যাঙটা। ভারিক্কি দেহ নিয়ে লাফানো দূরে থাক, নড়া চড়ারও কোনো শক্তি রইল না তার।

'খেল ত বটে, খাওয়ালিও তো দেখলাম, ব্যাটা এখন হজম করতে পারলে হয়।' দাদা বললেন।

'খুব হজম হবে। ওর বয়েসে কত পাথর হজম করেছি দাদা।' গোবরা বলে: 'ভাতের সঙ্গে এতদিনে যত কাঁকর গিলেছি, ছোটখাট একটা পাহাড়ই চলে গেছে আমাদের গর্ভে। হয়নি হজম?'

'আলবৎ হয়েছে।' আমি বলি: 'হজম না হলে তো যম এসে জমত শিয়রে।'

'ওই ছাখো দাদা!' আঁতকে চেঁচিয়ে ওঠে গোবরা।

আমরা দেখি। প্রকাণ্ড একটা সাপ, গোখরোই হবে হয়ত, এঁকে বেঁকে এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে।

চৌকিদার বলে—'একটুও নড়বেন না বাবুরা। নড়লেই সাপ এসে ছোবলাবে। আপনাদের দিকে নয়, ব্যাঙটাকে নিতে আসছে ও।'

আমরা নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে দেখলাম বটে। আমাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করে সে সোজা এসে ব্যাঙটাকে আত্মসাৎ করল।

সাপটা এগিয়ে এসে ধরল ব্যাঙটাকে, তারপর এক ঝটকায় লহমার মধ্যে পুরে ফেলল মুখের ভেতর। তারপর গিলতে লাগল আস্তে আস্তে।

আমরা দাঁড়িয়ে ওর গলাধঃকরণ-লীলা দেখতে লাগলাম। গলা দিয়ে পুরুষ্টু ব্যাঙটা তার তলার দিকে এগুতে লাগল, খানিকটা গিয়ে থেমে গেল এক জায়গায়, সেইখানেই আটকে রইল, তারপর সাপটা যতই চেষ্টা করুক না, সেটাকে আর নামাতে পারল না। পেটের ভেতর ঢুকে ব্যাঙটা তার পিঠের উপর কুঁজের মত উঁচু হয়ে রইল।

উটকো ব্যাঙটাকে গিলে সাপটা যেন উট হয়ে গেল শেষটায়। মুখখানা তার কেমনতর হয়ে গেল। যারপর নাই বৈরাগ্য হলেই যেমনটা হয়ত দেখা যায়। ভ্যাবাচাকা মার্কা মুখে সংসারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে জবুথবু নট নড়ন চড়ন সে পড়ে রইল সেইখানেই।

তারপর আর কোনো উৎসাহই দেখা গেল না তার।

'ছুঁচো গেলার চেয়েও খারাপ দশা হয়েছে সাপটার। বুঝলে দাদা? সাপের পেটে ব্যাঙ, আর ব্যাঙের পেটে যতো পাথর কুঁচি। আগে ব্যাঙ পাথর কুঁচিগুলো হজম করবে তারপরে সে হজম করবে গিয়ে ব্যাঙটাকে। সে বোধহয় আর ওদের এজন্মে নয়।'

'ওদের কে কাকে হজম করে দেখা যাক।' আমি বলি, 'ততক্ষণে আমাদেরও কিছু হজম হয়ে যাক। আমরাও খেতে বসি এধারে।'

চৌকিদারের আনা মাখন রুটি ইত্যাদি খবর কাগজ পেতে খেতে বসে গেলাম। সাপটার অদূরেই বসা গেল। সাপটা মার্বেলের গুলির মতনই নিস্পৃহ ভাবে তালগোল পাকিয়ে পড়ে রইল আমাদের পাশেই।

এমন সময়ে জঙ্গলের ওধার থেকে একটা খসখসানি আওয়াজ এল।

'বাঘ এসে গেছে বাবু!' চৌকিদার বলে উঠল, শুনেই না আমরা তাকিয়ে দেখি সত্যিই। ঝোপঝাপের আড়ালে বাঘটা আমাদের দিকে তাক করে দাঁড়িয়ে।

'রুটি মাখন টাখন শেষ পর্যন্ত বাঘের পেটেই গেল দেখছি।' দেখে আমি দুঃখ করলাম।

'কি করে যাবে? আমরা চেটেপুটে খেয়ে ফেলেছি না সব—

ওর জন্যে রেখেছি নাকি কিছু?' বলল গোবরা—পাঁউরুটির শেষ চিল্‌তেটা মুখের মধ্যে পুরে দিয়ে।

'যেমন করে পাথর কুঁচিগুলো সাপের পেটে গেছে ঠিক সেই ভাবে।' আমি প্রাঞ্জল করি।

'এক গুলিতে সাবাড় করে দিচ্ছি না ব্যাটাকে। দাঁড়ান না।' বলে হর্ষবর্ধন হাতে কী একটা তুললেন—'ওমা! এটা যে সেই সাপটা।' বলেই তিনি আঁতকে উঠলেন—'বন্দুকটা গেল কোথায়?'

'বন্দুক আমার হাতে বাবু।' বলল চৌকিদার : 'আপনি তো আমার হাত থেকে নেননি বন্দুক। তখন থেকেই আমার হাতে এটা রয়েছে।'

'তুমি বন্দুক ছুঁড়তে জানো?'

'না বাবু, তবে তার দরকার হবে না। বাঘটা এগিয়ে এলে এই বন্দুকের কুঁদার ঘায় ওর জান খতম করে দেব। আপনারা ঘাবড়াবেন না।'

হর্ষবর্ধন ততক্ষণে হাতের সাপটাকেই তিন পাক ঘুরিয়ে ছুঁড়ে দিয়েছেন বাঘটার দিকে।

সাপটা সবেগে গিয়ে পড়েছে তার উপর।

কিন্তু পড়ার আগেই না, কয়েক চক্কর পাক খেয়ে, সাপের পেটের থেকে ছিটকে ব্যাঙটা আর ব্যাঙের গর্ভ থেকে যতো পাথর কুঁচি তীর বেগে বেরিয়ে—ছর্‌রার মতই ছুটে—লেগেছে গিয়ে বাঘটার গায়—তার চোখে মুখে নাকে।

হঠাৎ এই বেমক্কা মার খেয়ে বাঘটা ভিরমি খেয়েই যেন অজ্ঞান হয়ে গেল তৎক্ষণাৎ। আর তার নড়া চড়া নেই।

'সর্পাঘাতে মারা গেল নাকি বাঘটা?' আমরা পায়ে পায়ে হতজ্ঞান বাঘটার দিকে এগুলাম।

চৌকিদার আর দেরি না করে বন্দুকের কুঁদার ঘায় বাঘটার মাথা থেঁতলে দিল। তারপর বলল—'আপনার সাপের মারেই মারা পড়েছে বাঘটা। তাহলেও সাবধানের মার নেই বাবু, তাই বন্দুকটাও মারলাম আবার তার ওপর।'

'এবার কী করা যাবে?' আমি শুধাই: 'কোনো ফোটো তোলার লোক পাওয়া গেলে বাঘটার পিঠে বন্দুক রেখে দাঁড়িয়ে বেশ পোজ করে ফোটো তোলা যেত একখান।'

'এখানে ফোটো-ওলা কোথায় পাবেন এই জঙ্গলে? বাঘটা নিয়ে গিয়ে আমি ভেট দেব দারোগাবাবুকে। তাহলে আমার ইনামও মিলবে—আবার চৌকিদার থেকে একচোটে দফাদারও বনে যাব এই ধাক্কায়—এই বাঘ মারার দরুন—বুঝলেন বাবু?'

'দাদা করল বাঘের দফারফা আর তুমি হবে গিয়ে দফাদার?' গোবরা বলল—'বারে!'

'সাপ ব্যাঙ দিয়েই বাঘ শিকার করলেন বটে দেখছি!' আমি বাহবা দিলাম ওর দাদাকে।

সূর্যদর্শন না বলে সূর্যগ্রাস বললেই ঠিক হবে বোধ হয়।

রাহুর পরে এক মহাবীরই যা সূর্যদেবকে বগলদাবাই করেছিলেন, কিন্তু যত বড় বীরবাহুই হন না, হর্ষবর্ধনকে হনুমানের পর্যায়ে ভাবাই যায় না কখনো।

তাই তিনি যখন এসে পাড়লেন, 'সূয্যি মামাকে দেখে নেব এইবার,' তখন বলতে কি, আমি হাঁ হয়ে গেছলাম।

আমার হাঁ-কারের কোনো জবাব না দিয়েই তিনি দ্বিতীয় হেঁয়ালি ঝাড়লেন, 'সুন্দরবনের বাঘ শিকার তো হয়েছে, চলুন এবার পাহাড়ে বাঘটাকেও এক হাত দেখে আসা যাক।'

'যদ্দূর আমার জানা,' না বলে আমি পারলাম না, 'বাঘরা পাহাড়ে বড় একটা থাকে না। বনে জঙ্গলেই তাদের দেখা মেলে। হাতীরাই থাকে পাহাড়ে। পাহাড়দের হাতীমার্কা চেহারা—দেখেছেন তো!'

'কে বলেছে আপনাকে?' তিনি প্রতিবাদ করলেন আমার কথায়, 'টাইগার হিল তাহলে বলেছে কেন? নাম শোনেন নি টাইগার হিলের?'

'শুনব না কেন? তবে সে হিলে, যদ্দূর জানি, কোনো টাইগার ফাইগার থাকে না। বাবুরা বেড়াতে যান সখ করে।'

'সুয্যিঠাকুর সেই পাহাড়ে ওঠেন রোজ সকালে জানেন না? সে নাকি এক অপূর্ব দৃশ্য!'

'তাই দেখতেই তো যায় সবাই।'

'আমরাও যাব। আমি, আপনি আর গোবরা। এই তিনজন।'

বিকেলের দিকে পৌঁছলাম দার্জিলিঙে। টাইগার পাহাড়ের কাছাকাছি এক হোটেলে ওঠা গেল।

খাওয়া থাকার বন্দোবস্ত করে হোটেলের মালিককে অনুরোধ করলাম—'দয়া করে আমাদের কাল খুব ভোরের আগে জাগিয়ে দেবেন···'

'কেন বলুন ত?'

'আমরা এক-একটি ঘুমের ওস্তাদ কিনা, তাই বলছিলাম···'

'ঘুম পাহাড়ও বলতে পারেন আমাদের।' বললেন হর্ষবর্ধন, 'যে ঘুম পাহাড় খানিক আগেই পেরিয়ে এসেছি আমরা। তাই আমাদের বলতে পারেন। আমাদের এই পাহাড়ে ঘুম সহজে ভাঙবার নয় মশাই।'

'নিজগুণে আমরা ঘুম থেকে উঠতে পারব না,' গোবরাও যোগ দিল আমাদের কথায়—'তাই আপনাকে এই বিনীত অনুরোধ করছি...'

'কারণটা কি জানতে পারি?'

'কারণ? কারণ আমরা কলকাতা থেকে এসেছি, এতদূরে এসেছি কেবল ঐ সূর্যোদয় দেখবার জন্যেই।'

'সূর্যোদয় দেখবার জন্য? কেন, কলকাতায় কি তা দেখা যায় না? সেখানে কি সূর্য ওঠে না নাকি?'

'উঠবে না কেন, কিন্তু দর্শন মেলে না। চার ধারেই এমন সব উঁচু উঁচু বাড়িঘর যে, সূয্যি ঠাকুরের ওঠা-নামার খবর টের পাবার জো নেই একদম।'

'তাছাড়া, তালগাছও তো নেইকো কলকাতায়, থাকলে না হয় তার মাথায় উঠে দেখা যেত...' গোবরা এই তালে একটা কথা বলল বটে—তাঁলেবরের মতন।

'তাল গাছ না থাক্, তেতালা বাড়ি আছে তো? তার ছাদে উঠে কি দেখা যেত না মশাই?' বলতে চান ম্যানেজার।

'থাকবে না কেন তেতালা বাড়ি। তেতাল, চৌতাল, ঝাঁপতাল সবরকমের বাড়িই আছে।' বলে হর্ষবর্ধন তাঁর উল্লিখিত শেষের বাড়ির বিশদ বর্ণনা দেন, 'ঝাঁপতাল বাড়ি মানে যেসব সাত-দশ তলা বাড়ির থেকে ঝাঁপ দিয়ে মরবার তালে ওঠে মানুষ, তেমন তেমন বাড়িও আছে বই কি! কিন্তু থাকলে কি হবে, তাদের ছাদে উঠেও বোধ হয় দেখা যাবে না সূর্যোদয়। দূরের উঁচু উঁচু বাড়ির আড়ালেই আবডালেই ঢাকা থাকবে পুব আকাশ।'

'এক হয়, যদি মনুমেণ্টের মাথায় উঠে দেখা যায়...' আমি জানাই।

'তা সেই মনুমেণ্টের মাথায় উঠতে হলে পুরো একটা দিনই লাগবে মশাই আমার এই দেহ নিয়ে···দেহটা দেখেছেন ?'

হর্ষবর্ধনের সকাতর আবেদনে হোটেলের মালিক তাঁর দেহটি অবলোকন করেন। তারপরে সায় দেন—'তা বটে।'

'তবেই দেখুন, এজন্মে আমার সূর্যোদয়ই দেখা হচ্ছে না তাহলে—জন্মটা বৃথাই যাচ্ছে—এই মানবদেহ ধারণ আমার বৃথাই হলো···'

'তাই আমাদের একান্ত অ...'

'এখানে নাকি অবাধে সূর্যোদয় দেখা যায়, আর তা নাকি একটা দেখবার জিনিস সত্যিই···'

'সেই কারণেই আপনাকে বলছিলাম···'

আমাদের যুগপৎ প্রতিবেদন—'দয়া করে আমাদের ভোর হবার আগেই ঘুম থেকে তুলে দেবেন। এমন কি, দরকার হলে ধরে বেঁধে জোর করেও।'

'কোনো দরকার হবে না।' তিনি জানান, 'রোজ ভোর হবার আগে এমন সোরগোল বাধে এখানে যে তার চোটে আপনার থেকেই ঘুম ভেঙে যাবে আপনাদের।'

'সোরগোলটা বাধে কেন ?'

'কেন আবার ? এই সূর্যোদয় দেখবার জন্যেই। যে কারণে যেই আসুক না, হাওয়া খেতে কি বেড়াতে কি কোনো ব্যবসার খাতিরে, ঐ সূর্যোদয়টি সবারই দেখা চাই। হাজার বার দেখেও আশ মেটে না কারো। একটা বাতিকের মতই পেয়ে বসছে বলতে পারেন।'

'আমরাও এখানে চেঞ্জে আসিনি, বেড়াতে কি হাওয়া খেতেও নয়—এসেছি ঠিক ঐ কারণেই··· ।'

'তাই রোজ ভোর হবার আগেই হোটেলের বোর্ডাররা

সব গোল পাকায়, এমন হাঁকডাক ছাড়ে যে, আমরা, মানে, এই হোটেলের কর্মচারীরা, যারা অনেক রাতে কাজ কর্ম্ম সেরে ঘুমাতে যায় আর অত ভোরে উঠতে চায় না, সূর্য ভাঙিয়ে আমাদের ব্যবসা হলেও সূর্য দেখার গরজ নেই যাদের একটুও—একদম সেজন্য ব্যতিব্যস্ত নয়, তাদেরও বাধ্য হয়ে উঠে পড়তে হয় ঐ হাঁকডাকের চোটেই। কাজেই আপনাদের কোনো ভাবনা নেই, কিছু করতে হবে না আমাদের। কোনো বোর্ডারকে আমরা ডিসটার্ব করতে চাইনে, কারো বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটানো আমাদের নিয়ম নয়…তার দরকারও হবে না, সাত সকালের সেই গোলমালে অপেনাদের ঘুম যতই নিরেট হোক না কেন, না ভাঙলেই আমি অবাক হব বরং।'

অতঃপর নিশ্চিন্ত হয়ে হোটেলের ঘরে আমাদের মালপত্র রেখে বিকেলের জলযোগ পর্ব চা—টা সেরে বেড়াতে বেরুলাম আমরা।

তখন অবশ্যি সূর্যোদয় দেখার সময় ছিল না, কিন্তু তা ছাড়াও দেখবার মতো আরো নানান প্রাকৃতিক দৃশ্য মজুদ ছিল তো। সেই সব অপূর্ব নৈসর্গিক সৌন্দর্য দেখতেই আমরা বেরিয়ে পড়লাম।

সন্ধ্যে হয় হয়। এধারের পাহাড়ে পথঘাট একটু ফাঁকা ফাঁকাই এখন। একটা ভুটিয়ার ছেলে একপাল ভেড়া চরিয়ে বাড়ি ফিরছিল গান গাইতে গাইতে।

শুনে হর্ষবর্ধন আহা-উহু করতে লাগলেন।

'আহা আহা। কী মিষ্টি। কী মধুর…কী সুমধুর…'

'কেমন মূর্ছনা!' যোগ দিল গোবরা। শুনে প্রায় মূর্ছিত হয় আর কি।

'একেই বলে ভাটিয়ালি গান, বুঝেছিস গোবরা? কান ভরে শুনে নে, প্রাণ ভরে শোন্।'

'ভাটিয়ালি গান বোধ হয় নয় এ,' মৃদু প্রতিবাদ আমার —'সে গান গায় পূব বাংলার মাঝিরা, নদীর বুকে নৌকার ওপর বৈঠা নিয়ে বসে। ভাটির টানে গাওয়া হয় বলেই বলা হয় ভাটিয়ালি।'

'তাহলে এটা কাওয়ালি হবে।' সমঝদারের মতন কন হর্ষবর্ধন।

'তাই বা কি করে হয়?' আমার বক্তব্য: 'গোরু চরাতে চরাতে গাইলে তাই হত বটে, কিন্তু cow ত নয়, ওতো চরাচ্ছে ভেড়া।'

'কাওয়ালিও নয়?' হর্ষবর্ধন যেন ক্ষুণ্ণ হন।

'রাখোয়ালী—মানে রাখালী গান বলতে পারো দাদা।' ভাই বাতলায়, 'ভেড়া চরালেও রাখালই ত বলা যায় ছোঁড়াটাকে।'

'লোকসঙ্গীতের বাচ্চা বলতে পারেন।' আমিও সঙ্গীতের গবেষণায় কারো চাইতে কিছু কম যাই না, 'এই বেড়ালই বনে গেলে যেমন বনবেড়াল হয়। তেমনি এই বালকই বড় হয়ে একদিন কেষ্ট বিষ্টু লোক হবে একটা। অন্ততঃ ওর গোঁফ বেরুবে নিশ্চয়। তখন এই গানকে অক্লেশে লোকসঙ্গীত বলা যাবে। আপাতত এটা বালকসঙ্গীত।'

ভেড়ার পাল নিয়ে গান গাইতে গাইতে ছেলেটা কাছিয়ে এলে হর্ষবর্ধন নিজের পকেট হাতড়াতে লাগলেন—'ওকে কিছু বক্‌শিশ্‌ দেওয়া যাক্‌। ওমা! আমার মনিব্যাগটা তো হোটেলের ঘরেই ফেলে এসেছি দেখছি। আপনার কাছে কিছু আছে মশাই? নাকি, আপনিও ফেলে এসেছেন হোটেলে?'

'পাগল! আমি প্রাণ হাতছাড়া করতে পারি, কিন্তু পয়সা নয়। আমার যৎসামান্ত যা কিছু আমার সঙ্গেই থাকে, আমার পকেটই আমার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। তবে কিনা—'

বলতে গিয়েও বাধে আমার। চক্রবর্তীরা যে কঞ্জুব হয়,

সে কথা মুখ ফুটে বলি কি করে? নিজগুণ কি নিজমুখে গান করবার?

'তাহলে ওকে কিছু দিন মশাই! একটা টাকা অন্ততঃ।'

দিলাম।

টাকাটা পেয়ে ত ছেলেটা দস্তুরমতন হতবাক্‌। পয়সার জন্যে নয়, প্রাণের তাগাদায় অকারণ পুলকেই সে গাইছিল। তাহলেও খুশী হয়ে, আমাদের সেলাম বাজিয়ে নিজের সাঙ্গো-পাঙ্গদের নিয়ে সে চলে গেল।

খানিক বাদে সেই পথে আবার এক রাখাল বালকের আবির্ভাব! সেই ভেড়ার পাল নিয়ে সেই রকম সুর ভাঁজতে ভাঁজতেই—তাকেও এক টাকা দিতে হয়।

খানিক বাদে আবার আরেক! পঞ্চম স্বরে গলা চড়িয়ে ভেড়া চরিয়ে ফিরছে ঐ পথেই।

তার স্বরাঘাতের হাত থেকে রেহাই পেতে, অর্ধচন্দ্র দেওয়ার মতই, একটা আধুলি ছুড়ে দিয়ে তাকে বিদায় করা হল।

তারপর আরো আরো আরো মেষপালকের গাইয়ে বালকের পাল আসতে লাগল পরম্পরায়—ঐ পথেই। আর আমিও তাদের বিদায় দিতে লেগেছি। তিনটেকে আধুলি, চারটেকে চার আনা করে, বাকীগুলোকে পুঁজি হালকা হওয়ার হেতু বাধ্য হয়েই দশ নয়া পাচ নয়া করে দিয়ে তাদের গন্তব্য পথে পাচার করে দিতে লাগলাম।

'সেই একটা ছেলেই ঘুরে ঘুরে আসছে নাতো দাদা?' গোবরা সন্দেহ করে শেষটায়—'পয়সা নেবার ফিকিরে?'

'সেই একটা ছেলেই নাকি মশাই?' দাদা শুধান আমায়।

'কি করে বলব? একটা ভুটিয়ার থেকে আরেকটা ভুটিয়াকে আলাদা করে চেনা আমার পক্ষে শক্ত। এক ভেড়ার পালকে

আরেক পালের থেকে পৃথক্ করাও কঠিন। আমার কাছে সব ভেড়াই একরকম। এবং ভুটিয়ারা various হলেও প্রায় তাই। সব এক চেহারা।'

'বলেন কি?' হর্ষবর্ধন তাজ্জব হন।

—'হ্যাঁ, সব এক ভ্যারাইটি। যেমন এক চেহারা তেমনি এক রকমের স্বরলহরী—কি ভেড়ার আর কী ভুটিয়ার।'

'আসুন তো, এই টিলাটার ওপর উঠে দেখা যাক ছেলেটা যায় কোথায়।'

ছেলেটা যেতেই আমরা টিলাটার ওপরে উঠলাম।

ঠিক তাই। ছেলেটা এই টিলাটার বেড় ঘেরেই ফের আসছে বটে ঘুরে···গলা ছেড়ে দিয়ে সুরের সপ্তমে।

কিন্তু এবার সে আর আমাদের দেখা পেল না।

না পেয়ে, টিলাটাকে আর চক্কর না মেরেই সে তার নিজের পথ ধরল। তার চক্রান্তের থেকে মুক্তি পেলাম আমরাও।

কিন্তু ছেলেটা আমাকে কপর্দকশূন্য করে দিয়ে গেল। আরেকটু হলে তার গানের দাপটে আমার কানের সব কটা পর্দাই সে ফাটিয়ে দিয়ে যেত। তাহলেও, কানের সাত পর্দার বেশ কয়েকটাই সে ঘায়েল করে গেছে, শেষ পর্দাটাই বেঁচে গেছে কোন রকমে। আমার মত আমার কানকেও কপর্দকশূন্য করে গেছে।

তবুও কোনো গতিকে কানে কানে বেঁচে গেলাম এ যাত্রায়।

প্রাকৃতিক মাধুরির প্রকৃত ভুরিভোজের পর বহুৎ হণ্টন করে হোটেলে ফিরতে রাত হয়ে গেল বেশ।

তখন ঘুমে আমাদের চোখ ঢুলুঢুলু, পা টলছে। কোনো রকমে নাকে মুখে কিছু গুঁজেই না, আমাদের ঘরের ঢালা বিছানায় গিয়ে গড়িয়ে পড়লাম আমরা।

'গোবরাভায়া, দরজা জানালা খড়খড়ি ভালো করে এঁটে দাও

সব। নইলে কোনো ফাঁক পেলে কখন এসে বৃষ্টি নামবে, তার কোনো ঠিক নেই।' সাবধান করলাম আমি গোবর্ধনকে।

'এটা তো বর্ষাকাল নয় মশাই!'

'দার্জিলিংয়ের মেজাজ তুমি জানো না ভাই। এখানে আর কোনো ঋতু নেই, গ্রীষ্ম নেই, বসন্ত নেই, হেমন্ত নেই, খালি দুটো ঋতুই আছেই কেবল। শীত আর বর্ষা—শীতটা লাগাও, আর বর্ষণ যখন তখন।'

'তার মানে?'

'চার ধারেই হালকা মেঘ ঘুরছে ফিরছে—নজরে না ঠাওর হলেও। মেঘলোকের উচ্চতাতেই দার্জিলিং তো! জানলা খড়-খড়ির ফাঁক পেলেই ঘরের ভেতর সেই মেঘ এসে বৃষ্টি নামিয়ে সব ভাসিয়ে দিয়ে চলে যাবে।'

'বলেন কি?'

'তাই বলছি।' আমি বললাম—'কিন্তু আর বলতে পারছি না। ঘুম পাচ্ছি ভারী। ঘুমিয়ে পড়লাম আমি…'

'ঘুমোচ্ছেন তো! কিন্তু চোখ কান খোলা রেখে ঘুমোবেন।' হাঁকলেন হর্ষবর্ধন।

'তেমন করে কি ঘুমোনো যায় নাকি আবার?' না বলে আমি পারি না—'চোখ তো বুজতে হবে অন্ততঃ।'

'কিন্তু কান খাড়া রাখুন। কান খোলা রেখে সজাগ হয়ে ঘুমোন। একটু সোরগোল কানে এলেই বুঝবেন ভোর হয়েছে। জাগিয়ে দেবেন আমাদের তখন।'

'দেখা যাবে।' যদিও সেই ছোঁড়াটা তার গানের চোটে আমার পর্দানশীন কানকে ফর্দাফাই করে গেছে তাহলেও কান ফাঁক হয়ে থাকলেও তা দিয়ে কদ্দূর কতটা দেখতে পারব, তেমন কোনো ভরসা না রেখেই—ওই বলে পাশ ফিরে শুই।

এক ঘুমের পর কেমন যেন একটা আওয়াজে আমার কান খাড়া হয়ে যায়। আমি উঠে বসি বিছানায়। পাশে ঠেলা দিই গোবরাকে—'গোবরা ভায়া, একটা আওয়াজ পাচ্ছ না?'

'কিসের আওয়াজ?'

'পাখোয়াজ বাজছে যেন। কেউ যেন ভৈরোঁ রাগিণী ভাঁজতে লেগেছে মনে হচ্ছে। ভৈরোঁ হোলো গে ভোরবেলার রাগিণী। ভোরবেলায় গায়।'

'পাখোয়াজ বাজছে?' গোবরাও শোনবার চেষ্টা পায়।

হর্ষবর্ধনও সাড়া দেন ঘুম থেকে উঠে—'কী হয়েছে? ভোর হয়েছে নাকি?'

'খানিক আগে কি রকম যেন একটা সোরগোল শুনছিলাম।'

'ভোর হয়েছে বুঝি?'

'ভাবছিলুম তাই। কিন্তু আর তো সেই হাঁকডাকটা শোনা যাচ্ছে না।'

'শুনবেন কি করে?' বলল গোবরা—'দাদা জেগে উঠলেন যে! দাদাই তো নাক ডাকাচ্ছিলেন এতক্ষণ।'

'বললেই হোলো! কক্ষনো আমার নাক ডাকে না, ডাকলে শুনতে পেতুম না আমি? ঘুম ভেঙে যেত না আমার?'

'তুমি যে বদ্ধকালা। শুনবে কি করে? নইলে কানের অত কাছোকাছি নাক? আর ওই ডাকাতপড়া ডাক তোমার কানে যায় না?'

'তুই একটা বদ্ধ পাগল! তোর সঙ্গে কথা কয়ে আমি বাজে সময় নষ্ট করতে চাইনে।' বলে দাদা পাশ ফিরলেন—আবার তাঁর হাঁকডাক শুরু হোলো আগের মতন।

এরপর, অনেকক্ষণ পরেই বোধহয়, হর্ষবর্ধনই জাগালেন আমাদের—'কোনো সোরগোল শুনছেন?'

'কই না তো।' আমি বলি—'বিলকুল চুপচাপ।'

'এতক্ষণেও ভোর হয়নি! বলেন কি! জানালা খুলে দেখা যাক তো…' তিনি বিছানা ছেড়ে উঠে জানালা খুললেন—'ওমা! এই যে বেশ ফর্সা হয়ে এসেছে…উঠুন! উঠুন!! উঠে পড়ুন চটপট।'

আমরা ধড়মড় করে উঠে পড়লাম।

'জামা কাপড় পরে না! সাজগোজ করার সময় নেই—তাছাড়া দেখতেই যাচ্ছেন, কাউকে দেখাতে যাচ্ছেন না। নিন, কম্বলটা গায়ে জড়িয়ে নিন। দেরি করলে সূর্যোদয়টা ফস্‌কে যাবে।'

তিনজনেই শশব্যস্ত হয়ে আপাদমস্তক কম্বল জড়িয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

টাইগার হিলের উঁচু টিলাটা কাছেই। হন্তদন্ত হয়ে তিনজনায় গিয়ে খাড়া হলাম তার ওপর।

বিস্তর লোক গিজ্‌গিজ করছে সেখানে। নিঃসন্দেহ, সূর্যোদয় দেখতে এসেছে সবাই।

'মশাই! সূয্যি উঠতে দেরি কত?' হর্ষবর্ধন একজনকে শুধালেন।

'সূয্যি উঠতে?' ভদ্রলোক একটু মুচকি হেসে ওঁর কথার জবাব দিলেন।

'বেশি দেরি নেই আর।' আমি বললাম—'আকাশ বেশ পরিষ্কার। দিগ্বিদিক উদ্ভাসিত…উঠলো বলে মনে হয়।'

কিন্তু সূর্য আর ওঠে না। হর্ষবর্ধন বাধ্য হয়ে আরেকজনকে শুধান—'সূয্যি উঠচে না কেন মশাই?'

'এখন সূর্য উঠবে কি?' ভদ্রলোক অবাক হয়ে তাকান তাঁর দিকে।

'মানে, বলছিলাম কি, সূর্য তো ওঠা উচিত ছিল এতক্ষণ। পূবের আকাশ বেশ পরিষ্কার। সূর্যের আলো ছড়াচ্ছে চারদিকে—অথচ সূর্যের কোনো পাত্তা নেই।'

'সূর্য কি উঠবে না নাকি আজ?' আমার অনুযোগ।

'ঐ মেঘটার আড়ালে ঢাকা পড়েছে সূর্য, তাই দেখতে পাচ্ছেন না।' তিনি জানালেন—'মেঘটা সরে গেলেই…'

বলতে বলতে মেঘ সরে গেল, প্রকাশ পেলেন সূর্যদেব?

'ও বাবা! অনেকখানি উঠে পড়েছে দেখছি। বেলা হয়ে গেছে বেশ।' আপসোস করলেন হর্ষবর্ধন—'সূর্যোদয়টা আজকেও হাতছাড়া হয়ে গেল দেখছি।'

'ওমা! একি!' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি—'নেমে যাচ্ছে যে! নামছে কেন সূয্যিটা? নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে যে! এ কী ব্যাপার?'

'এরকমটা তো কখনো হয় না!' আমিও বিস্মিত হই—'সূর্য তো এমন ধারা খামখেয়ালী নয়। সূর্যের এমন বেচাল ব্যাপার তো দেখা যায় না কখনো।'

'হ্যাঁ মশাই, এরকমটা হয় নাকি এখানে মাঝে মাঝে? একটু না উঠেই নামতে থাকেন আবার—পথ ভুল হয় সূর্যদেবের?'

'তার মানে?'

'তার মানে, আমরা সূর্যোদয় দেখতে এসেছি কিনা, উদীয়মান সূর্য দেখতে না পাই, উদিত সূর্য দেখেও তেমন বিশেষ দুঃখিত হইনি—কিন্তু একি! উঠতে না উঠতেই নামতে লাগলো যে মশাই!'

'আপনার জন্যে কি পশ্চিম দিকে উঠবে নাকি সূর্য? অস্ত যাবার সময় সূর্যোদয় দেখতে এসেছেন!' ঝাঁঝালো গলা শোনা যায় ভদ্রলোকের—

'কোথাকার পাগল সব! আরেক জন উত্তোর গান তাঁর কথার।

সূর্যদর্শনে বিড়ম্বিত তিনজন আমরা হেঁটমুখে হোটেলে ফিরে এলাম। 'খুব সূর্য দেখা হয়েছে! চলুন এবার কলকাতায় ফেরা যাক—নিজের আবাসেই!' দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললাম।

'আবাসে!' বলতেই যেন শিউরে উঠলেন হর্ষবর্ধন—'আবার সেই বাসে! কলকাতার বাসের কথা ভাবতেই আমার বুক কেঁপে ওঠে।'

'কী ভীড়!' সায় দিল গোবরা দাদার কথায়—'ওঠাই যায় না বাসে, যদি বা ঠেলে ঠুলে উঠলাম কোনো গতিকে নামবার পথ পাইনে আর। কী ধকল রে বাবা!'

'তোর মনে আছেরে গোবরা? প্রথম যখন আমরা কলকাতায় এলাম—টাকা ওড়াবার জন্যে, মনে আছে তোর? একটা প্রকাণ্ড দোতলা বাস একেবারে খালি পাওয়া গেছল না? গোটা বাসটাই ভাড়া করে ফেলেছিলাম আমরা—একশ টাকা দিয়ে?'

'একশ টাকায় একটা বাস ভাড়া—ছিল নাকি কোনো কালে?'

'ছিল। তাহলে শুনুন সে কাহিনী······' বলে হর্ষবর্ধন তাঁদের প্রথম কলকাতায় আমার বৃত্তান্ত বলতে লাগলেন।

আমার ভাষায় তাঁর সেই ভাষণের পুনরুক্তি করি অতঃপর।···

হর্ষবর্ধন আর গোবর্ধন দুই ভাই, কাঠের কারবারের বড় মানুষ। কর্মসূত্রে আসামের জঙ্গলেই চিরটা কাল কাটিয়ে একবার ওঁদের শখ হল কলকাতা শহরটা দেখবার। টাকা তো কামানো কম হয়নি, এবার কিছু কমানো দরকার। তা ছাড়া, তাঁরা কিছু ফেরারি আসামী নন যে সারা জন্মটা আসামেই কাটাতে হবে।

কলকাতা শহরটা চোখে না দেখলেও কানে যে শোনেন নি তা নয়। অনেক কিছুই শুনেছেন—অনেক দিন থেকে এবং অনেক দিক থেকে। মোটর-গাড়ির কথা শুনেছেন, বড় বড় বাড়ির কথা শুনেছেন, বায়োস্কোপের কথা শুনেছেন, এমনকি ছবিতে আজ-কাল কথা কইছে এমন কথাও ওঁদের কানে গেছে।

কিন্তু সবচেয়ে দুঃখের কথা এই যে কলকাতার লোকেরা নাকি মিশুক নয়—পাশের বাড়ির খবর রাখে না, পাড়ার লোককে চিনতে পারে না। রাস্তায় বেরুলে কেবল মানুষ আর মানুষ—কিন্তু আশ্চর্য এই, কেউ কারু সঙ্গে কথা কয় না, উপরন্তু গায়ে পড়ে ভাব করতে গেলে বিরক্ত হয়। এমনকি অচেনা কেউ যদি তোমার গায়ে এসে পড়ে, পরমুহূর্তেই দেখবে তোমার পকেট বেশ হালকা হয়ে গেছে। আলাপ না করলেও বিলাপ—কোনদিকেই রক্ষা নেই।

বাস্তবিক, তাঁদের কলকাতা ব্র্যাঞ্চের কর্মচারী দীর্ঘছন্দে চিঠি লিখে শহরের যা হালচাল জানিয়েছে তাতে ভয়ের কথাই বটে। সবচেয়ে ভাবনার কথা ভাব না করার কথায়—তাঁরা দুই ভাই-ই ভাব করতে মজবুত—চেনা, অচেনা, অর্ধ-চেনার সঙ্গে আড্ডা জমাতে তাঁদের জোড়া নেই—সকালে, বিকেলে, দুপুরে এবং অনেক সময়ে গভীর রাত্রে অনর্গল কথা না বললে তাঁদের ভাত হজম হয় না। গল্প করতে তাঁদের ভারি ভাল লাগে—সেজন্যে কাজ পণ্ড করতেও তাঁরা প্রস্তুত। কথা কইবার জন্যে আহার-নিদ্রা ভুলতে প্রস্তুত, অপরকে নেমন্তন্ন করে খাওয়াতে প্রস্তুত, এমনকি তার সঙ্গে ঝগড়া করতে পর্যন্ত প্রস্তুত। কিন্তু কলকাতার লোকেরা মিশুক নয় এ খবরে তাঁরা ভারি দমে গিয়েছেন।

কিন্তু দুই ভাই মরিয়া হয়ে উঠেছেন—শহরটা একবার ঘুরে আসবেনই, যা থাকে কপালে!

বড় ভাই বলেছেন—'যদি কলকাতাই না দেখলাম, তবে এসে

করলাম কী? কেবল কাঠ—কাঠ—আর কাঠ, কাঠ কি সঙ্গে যাবে?'

কাঠের প্রতি নেহাৎ অবিচার হচ্ছে দেখে ছোট ভাই মৃদু আপত্তি জানিয়েছে—'না দাদা, কাঠ সঙ্গে না গেলেও অন্তিমে কাজে লাগবে।'

বড় ভাই প্রবলভাবে ঘাড় নেড়েছেন—'আমি নাহয় কবরেই যাব, তবু কলকাতাকে একবার দেখে নেব।'

এর পর আর কথা চলে না, কিংবা কথা চললেও কথা বাড়ানোর চেয়ে কলকাতা বেড়ানোর ইচ্ছা ছোট ভাইয়ের মনে তীব্রতর ছিল বলে এ ক্ষেত্রে সে চেপে যায়। অতএব একদা অতি প্রত্যুষে আসামের বিখ্যাত বর্ধন অ্যাণ্ড বর্ধন কোম্পানির দুই বড় কর্তাকে শিয়ালদা স্টেশনে এসে অবতীর্ণ হতে দেখা যায়।

সমস্ত প্ল্যাটফর্মটা এধার থেকে ওধার দু-দু'বার টহল দিলেন, কিন্তু নাঃ, কর্মচারীটার দেখা নেই কোথাও। কাল দু-দুটো জরুরি তার করে জানানো হয়েছে তবু হতভাগা—

গোবর্ধন বলল—'এমন তো হতে পারে সমস্ত রাত জেগে বেচারাকে হিসেব মেলাতে হয়েছে, ভোরবেলার দিকটায় তাই একটু ঘুমিয়ে পড়েছে। আমরা যে এসেই পড়ব এজন্যে হয়ত সে তৈরি ছিল না—'

হর্ষবর্ধন বললেন—'উঁহু।'

গোবর্ধন ভ্রূ কুঁচকে, যেন গভীর দূরদৃষ্টির পরিচয় দিচ্ছে এইভাবে সবচেয়ে শোকাবহ দুর্ঘটনার ইঙ্গিতটা দিল—'কিংবা এমনও হতে পারে যে ব্যাটা কিছুতেই তহবিল না মেলাতে পেরে শেষটায় বাকি যা ছিল মেরে নিয়ে আমরা যখন শিয়ালদায় নামছি তখন সে হাওড়া দিয়ে সট্‌কে পড়ল?'

হর্ষবর্ধন তথাপি নির্লিপ্তভাবে জবাব দেন—'উহুহু।'

বড় বড় গবেষণা এইভাবে পুনঃ-পুনঃ ব্যর্থ হওয়ায় মনে মনে চটে গিয়ে গোবর্ধন বললে, 'তবে তুমি কী ভাবছ?'

হর্ষবর্ধন ভাইয়ের উদ্বিগ্ন মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাস্য করেন—'কিছু না, কলকাতার হালচালই এই। লোকটা নেহাৎ মিথ্যা কথা লেখে নি তো!'

গোবর্ধন বলে—'স্বীকার করি লোকটা কলকাতার, কিন্তু তা বলে নিজের মনিবের সঙ্গে মিশবে না—এমন কখনও হতে পারে?'

হর্ষবর্ধন ভাইয়ের বোকামির বহরে অবাক হন—'কেন, স্পষ্টই তো লোকটাকে দেখা যাচ্ছে না। সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে লোকটার কথা সত্যি। এ তো হাতে-নাতেই প্রমাণ। চল্, বেরিয়ে একটা মোটর ভাড়া করি গে।'

দাদার যুক্তির বহর দেখে ভাইও কম অবাক হল না, কিন্তু নির্বাক হবার কথা তার না হলেও, কথা-কাটাকাটিতে না কাটিয়ে সময়টা মোটরে কাটালেই কাজ দেবে ভেবে আপাতত সে নিজেকে দমন করে ফেলল।

হর্ষবর্ধন জিজ্ঞাসা করেন, 'চিঠিখানা কাছে আছে তো? বাড়ির ঠিকানা আছে তাতে।'

গোবর্ধন ঘাড় নেড়ে জানায়—'চিঠি নেই, তবে মনে হচ্ছে ১৩।১২ রসা রোড, ভবানীপুর।'

হর্ষবর্ধন অত্যন্ত ভাবিত হন—'কেমন বাড়ি ভাড়া করেছে কে জানে! লোকটা নিজে তো মিশুক নয়ই, হয়ত এমন পাড়ায় বাড়ি দেখেছে যেখানে কথা কইতে গেলে লোকে তেড়ে মারতে আসে।'

গোবর্ধন সায় দেয়—'কিংবা মেশবার ভয়ে তাও আসে না।'

'সেইটাই তো আরো ভাবনার কথা—' কিন্তু হর্ষবর্ধনের

ভাবনায় বাধা পড়ে, একজন ট্যাক্সিওয়ালা গাড়ি নিয়ে এগিয়ে আসে —'ট্যাক্সি চাই বাবু, ট্যাক্সি ?'

'যদি মোটরেই চাপি তাহলে তোমার ওই পুঁচকে গাড়িতে যাব কেন হে ? গোবরা, ওই যে ভারি গাড়িখানা খুব ধুমধাড়াক্কা করে আসছে ওটাকে দাঁড় করা।' হর্ষবর্ধন এক বৃহদাকার ওম্‌নিবাসের দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করেন, 'বড় গাড়িতে বেশি ভাড়া লাগবে, এই তো ? কলকাতায় ফূর্তি করতে আসা, টাকার মায়া করলে চলবে কেন ?'

শীতের প্রত্যুষের জনবিরল পথে যাত্রীহীন বাসখানা যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও ছুটছিল, গোবর্ধনের সঙ্কেতমাত্র দাঁড়িয়ে পড়ল। হর্ষবর্ধন উঠেই হুকুম দিলেন—'চালাও তেরোর বারো বসা রোড। কোথায় সেটা, জানা আছে তো ?'

কণ্ডাক্টর জবাব দেয়—'আমাদের তিন নম্বর বাস ওই পথেই তো যায়।'

মনিব্যাগ থেকে একখানা একশ টাকার নোট বের করে হর্ষবর্ধন তার হাতে দেন। কণ্ডাক্টর জানায়—'কিন্তু এর চেঞ্জ তো নেই।'

হর্ষবর্ধন বলেন—'দরকার নেই চেঞ্জ দেবার; সমস্তটাই ওর ভাড়া ধরে নাও। চিরকাল মোটর-গাড়ির গল্প শুনে আসছি, আজ সুযোগ হয়েছে, শখ মিটিয়ে চাপব। যত টাকাই লাগুক, কেয়ার করি না আমরা।'

এতক্ষণে গোবর্ধন কথা বলবার ফুরসৎ পায়—'দিব্যি গাড়ি দাদা, দেখছ কতগুলো সীট, তার ওপরে আবার গদিমোড়া! হাওয়া খেলবার জন্যে এতগুলো জানলা! একটা আয়নাও আছে! এমনি একটা মোটর দেশে নিয়ে যাব, কী বল দাদা ? মোটরগাড়ি আর মোটর-বাড়ি একসঙ্গে!'

'আলবৎ! দেশে নিয়ে যেতে হবে বই কি! যদি চেনা লোকজনের চোখেই না পড়লাম তবে মোটরে চেপে লাভ কী?'

'এখন যে-কদিন কলকাতায় আছি গাড়িখানায় চাপা যাবে বেশ মজা করে, কী বল দাদা?'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়—সে কথা বলতে? সাত দিনের জন্যে এটাকে ভাড়া করে ফেলছি দাঁড়া।'

হঠাৎ বাস দাঁড়াল এবং একটি তরুণী ভদ্রমহিলা উঠলেন। হর্ষবর্ধন একবার তাকিয়ে দেখলেন, তারপর ফিস্‌ফিস্ করে গোবর্ধনকে বললেন—'উঠেছে উঠুক, কিছু বলিস নে যেন। যদি খানিকটা মোটরের হওয়া খেতে চায় খাক না, ক্ষতি কি; জায়গা যথেষ্টই আছে।'

মেয়েটি একটি সিকি বের করে কণ্ডাক্টরের হাতে দিতে গেল। হর্ষবর্ধন বাধা দিলেন—'পয়সা কিসের?'

'খিদিরপুরের ভাড়া।'

'আপনার সিকি আপনি নিজের কাছে রেখে দিন, ওটি আমরা হ'তে দিচ্ছি না! আপনি আমাদের গাড়িতে উঠেছেন, আমাদের সৌভাগ্য, সেজন্যে কোন পয়সা নিতে আমরা অক্ষম।' ব'লে হর্ষবর্ধন গম্ভীরভাবে গোঁফে একবার চাড়া দিয়ে নিলেন।

মেয়েটির বিস্ময় কমতে না কমতেই আবার বাস দাঁড়াল এবং একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি উঠলেন। যেমনি না তিনি মনিব্যাগের মুখ খুলেছেন অমনি গোবর্ধন গিয়ে করজোড়ে নিবেদন করল—'মাপ করবেন, পয়সা নিতে পারব না। আপনি যতক্ষণ ইচ্ছে বসুন, আরামে হাওয়া খান—কিন্তু তার জন্যে ভাড়া দিতে দেব না আপনাকে। মনে করুন এটা আপনার নিজের গাড়ি।'

গোবর্ধনের নিজের গোঁফ ছিল না, চাড়া দেবার জন্যে দাদার গোঁফ ধার নেবে কি না ভাবতে লাগল।

দু' মিনিটের মধ্যে আরো তিন তিন জন ভদ্রলোক, দুটি অত্যন্ত মোটা মেয়েছেলে এবং আধডজন ফচ্‌কে চ্যাংড়া গাড়িতে প্রবেশ করল। এবার হর্ষবর্ধনের কপালে রেখা দেখা দিল এবং গোবর্ধনের ভ্রূ কুঞ্চিত হল; বড় ভাইকে চাপা গলায় প্রশ্ন করলেন—'কে বলছিল রে কলকাতার লোকরা মিশুক নয়?'

কিছুক্ষণেই বাস বোঝাই হয়ে গেল, হর্ষবর্ধন প্রত্যেক অভ্যাগতকেই সাদরে অভ্যর্থনা করেছিলেন এবং তাদের ভাড়া দিতে নিরস্ত করতে তাঁর কম পরিশ্রম হচ্ছিল না। লোকগুলোর অপব্যয়-প্রবৃত্তি দেখে গোবর্ধন আর বিস্ময় দমন করতে না পেরে দাদাকে তার অভিমত জানাল—'কলকাতার লোকগুলো ভারি খরচে কিন্তু দাদা।'

'চলে আসুন। জায়গা যথেষ্টই রয়েছে। আরামে হাওয়া খান। একটি পয়সা দিতে হবে না। আমাদের সৌভাগ্য যে আপনারা অনুগ্রহ করে আসছেন।' হর্ষবর্ধন চুপ করবার ফুরসৎ পান না।

আরও প্যাসেঞ্জার উঠতে লাগল, বাসের দু' ধারের সীট ভর্তি হয়ে গেল, এমনকি মাঝ-পথে দু'থাক লোক গাদাগাদি দাঁড়িয়ে গেল,—দরজা, ফুটবোর্ড পর্যন্ত ভর্তি হবার দাখিল। অবশেষে একজন চীনাম্যান ভিড় ঠেলে ঢুকে পড়তেই গোবর্ধন সবিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল—'দাদা, দাদা, দেখ একজন চীনাম্যান।'

দাদা, অদৃষ্টপূর্ব এবং ইতিহাস-বিশ্রুত হুয়েন-সাং ফা-হিয়েনের বংশধরটিকে পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ করে গম্ভীরভাবে নিজের মাথা নাড়লেন—'হুঁ, ওদের দাড়ি হয় না বটে!'

গোবর্ধন যোগ করে—'ভারী মজা দাদা! কামাবার হাঙ্গামা নেই—ওরাই পৃথিবীতে সুখী।'

এমন সময়ে কণ্ডাক্টর জানাল যে রসা রোড এসে এসে পড়েছে। দুই ভাই ব্যস্ত হয়ে ঠেলে-ঠুলে কোন রকমে নেমে পড়লেন, নামবার

আগে ঘোষণা করলেন—'ওহে, যতক্ষণ এঁরা চাপতে চান চাপুন, যেখানে এঁরা যেতে চান এঁদের নিয়ে যাও। আরও যে টাকা লাগে আমাদের ঠিকানায় এসে নিয়ে যেয়ো—তেরোর বারো রসা রোড, বুঝলে? আর আপনারা, বন্ধুগণ, বিদায়! আরামে ঘুরুন ফিরুন সারা দিন, যত খুশি, যতক্ষণ খুশি! কারুর একটি পাই পয়সা লাগবে না।'

বাস থেকে নেমেই গোবর্ধন প্রশ্ন করল—'কলকাতার হালচাল কী রকম বুঝলে দাদা?'

'হ্যাঃ! কে বলে কলকাতার লোকেরা মিশুক নয়? একেবারে মিথ্যা কথা, বাজে কথা, ভুয়ো কথা! মেশার ধাক্কায় আমার দম আটকে যাবার জোগাড় হয়েছিল। শেষকালে একটা চীনাম্যান পর্যন্ত—! আর কিছুক্ষণ থাকলে হয়ত সাহেব-সুবোরাও এসে উঠত! বাপ রে বাপ! এ রকম গায়ে-পড়া মিশুক লোক আমি দুনিয়ায় দেখি নি! কিন্তু একটা সর্বনাশ হয়েছে—'

গোবর্ধন ব্যস্ত হয়ে ওঠে—'কী? কী? পকেট মেরেছে নাকি?'

'উঁহু! আমাদের ঠিকানাটা দিয়ে ফেলেছি যে ওদের। ভারি মুস্কিল করেছি। খপ করে বাড়ি ঢুকেই খিল এঁটে দিতে হবে, আর যদি সম্ভব হয় বাড়ির চারধারে কাঁটা-তারের বেড়া দিয়ে দেওয়া ভাল। তাতে অনেকটা নিরাপদ। কলকাতার লোক যে-রকম মিশুক দেখছি, বাড়ি চড়াও হয়ে আমাদের সঙ্গে খেতে-শুতে না চেয়ে বসে, কী জানি!'

চওড়া ফুটপাথে পা দিয়েই হর্ষবর্ধন প্রশ্ন করেন—'কাকে জিজ্ঞাসা করি?'

এইমাত্র তিনি গোবর্ধনকে যে দারুণ দুর্ভাবনা ব্যক্ত করেছেন,

তার চেয়েও গুরুতর ভাবনা তাঁর কাঁধে ভর করে—কলকাতার মত শহরে এত ঘর-বাড়ির মধ্যে নিজের 'থাকৃতব্য' জায়গার খোঁজ করা কী ভীষণ ঝকমারি! এই সব মস্ত মিশুক লোকদের মাঝখানে কি ফুটপাথেই শেষে সমস্ত দিনরাত কাটাতে হবে নাকি?

গোবর্ধন জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকায়।

'বাড়ির ঠিকানাটা বাগাবার কী হবে?' হর্ষবর্ধনের প্রশ্ন হয়।

গোবর্ধন জবাব দেয়—'কেন, বাড়ির ঠিকানা তো পাওয়াই গেছে, এখন ঠিকানার বাড়ি বল!'

'ওই একই কথা, একই কথা। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি কাকে?'

'বোধ হয় নিরাপদও নয় জিজ্ঞাসা করা। যদি এখন খুড়ো, জ্যাঠা, মাসি, পিসি, মামা, মাস-শাশুড়ি সব নিয়ে এসে হাজির করে আমাদের বাড়ি? যে রকম সব মিশুক লোক!'

'হুঁ'। হর্ষবর্ধন মাথা চালেন—'বাড়িতে ভারি গোলমাল হবে তাহলে।'

গোবর্ধন আরো বেশি মাথা নাড়ে—'নিজেরা পুরো ভাড়া গুণেও শেষে চৌকির তলাতেও শোবার জায়গা পাব কি না সন্দেহ!'

'তবে?' হর্ষবর্ধন মুহ্যমান হয়ে পড়েন।

গোবর্ধন দাদার দিকে তাকায়—'ফুটপাথে লাট্টু ঘোরাচ্ছে, ওই ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করব?'

'নিরাপদ তো?'

'না-হয় যত-রাজ্যের ছেলে—ওর বন্ধুদের সব জুটিয়ে আনবে, এই না? তা আসুক গে। ছেলেরা বাড়ির মধ্যে থাকতে খুব কমই ভালবাসে। একবার বাইরে ছাড়া পেলে হয়—তারপর গড়ের মাঠ ব'লে কি একটা দেদার ফাঁকা জায়গা আছে না কলকাতায়? তুমিই তো বলছিলে?'

'সনাতনখুড়োর কাছে শুনেছিলাম বটে। কিন্তু কোন্‌দিকে জানি নে তো।'

'সেইটা জেনে কোন একটা খেলার ছুতো করে ছেলেদের সব ভুলিয়ে ভালিয়ে গড়ের মাঠে নিয়ে গিয়ে সেইখানে ছেড়ে দিয়ে এলেই হবে।'

হর্ষবর্ধন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে আদেশ দেন—'তবে ওকেই বল্‌ তাহলে।'

দু'জনে লাট্টু-নিরত খোকার দিকে অগ্রসর হন—গোবর্ধনই সাহস সঞ্চয় করে—'ওহে খোকা, শোন তো এদিকে!'

লাট্টুর চক্রান্তে ব্যস্ত থাকলেও তার দিক থেকে তীক্ষ্ণ জবাব আসে—'খোকা বললে আমি সাড়া দিই না!'

গোবর্ধন ভড়কে যায় কিন্তু দাদা পাশে থাকতে ভয়ের কী আছে এই ভেবে মরিয়া হয়ে ওঠে; তার কম্পিত কণ্ঠ শোনো যায়—'তবে কী বললে তুমি সাড়া দাও শুনি?'

'খোকা বললে আমি সাড়া দিই না। দেব কেন? আমি কি খোকা? খোকা তো যারা দুধ খায়।' ছেলেটি নিজের অভিমত স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করে দেয়।

ব্যাপার সহজ নয় বিবেচনা করে এবার হর্ষবর্ধন নিজেই আগুয়ান হন—'ওহে বালক! খোকা বলা তোমাকে খারাপ হয়েছে আমরা মেনে নিচ্ছি, এখন বল তো বালক, এখানে এইসব বাড়ির মধ্যে তেরোর বারো কোন্‌টি?'

হর্ষবর্ধনের গুরু-গম্ভীর আওয়াজে বালকের 'লাট্টু শীলতা' তৎক্ষণাৎ থেমে যায়—'কী বললেন, তেরোর বারো?'

'হ্যাঁ, তেরোর বারো কিংবা ত্রয়োদশের দ্বাদশ—যেটা তোমার বুঝবার পক্ষে সুবিধে।'

ছেলেটি আর বিস্ময় দমন করতে পারে না—'কী করে

জানলেন? আমিই তো! আমারই বয়স তেরো, ইস্কুলে বারো লিখিয়েছে!'

এমন সময়ে পাশ দিয়ে একটা পরিচিত সাইকেল যেতে দেখে ছেলেটি হর্ষবর্ধনের প্রত্যুত্তরের প্রতীক্ষা না করেই মুহূর্তমধ্যে তার পেছনের ক্যারিয়ারে চেপে বসে এবং পরমুহূর্তে বালক ও সাইকেল-চালক দু'জনেরই টিকি এত দূরে দেখা যায় যে উচ্চৈঃস্বরে জবাবটা দেবার কোন সঙ্গত কারণ হর্ষবর্ধন খুঁজে পান না।

'গোবরা, বুঝলি কিছু?'

'না তো।'

'তোর বুদ্ধিশুদ্ধি কিছু নেই দেখছি!'

গোবর্ধন এবার চটে—'বুঝব না কেন? অনেক আগেই বুঝেছি, বুঝবার এতে এমন কী আছে? কলকাতার সাইকেলের পেছনগুলো সব ছেলেদের জন্যে রিজার্ভ করা, এই তো? যে-কোন ছেলে যখন খুশি চাপলেই হল।'

হর্ষবধন বলেন—'তা হতে পারে। কিন্তু ছেলেটারও নম্বর তেরোর বারো—তার কিছু বুঝেছিস? যেমন ঘর-বাড়ির, তেমনি কলকাতার প্রত্যেক ছেলেরই একটা করে নম্বর দেওয়া আছে—মার্কামারা ছেলে সব!'

বলে হর্ষবধন নিজের গোঁফে চাড়া দেন। অনন্যোপায় গোবধন দাদার সঙ্গে সমান পাল্লা দেবার প্রয়াসে একবার দাড়ি চুলকে নেয়—'থাকবেই তো নম্বর। কেন, কলকাতায় ছেলের কি কিছু কম্‌তি? এই যত লোক দেখছ তাদের প্রত্যেকের গড়-পড়তা চারটে-পাঁচটা ক'রে ছেলে—আবার কারু-কারু চোদ্দ পনেরটাও আছে। এত লাখ-লাখ ছেলের মধ্যে পাছে হারিয়ে যায় কি গুলিয়ে ক্যালে সেইজন্যেই এই নম্বর দেওয়া! এ আর আমি বুঝি নি? তোমার ঢের আগেই বুঝেছি।'

'আমার আগেই বুঝেছিস ?' হর্ষবর্ধনের গোঁফ হস্তচ্যুত হয়—'বটে ? তাহলে তুই আমার আগেই জন্মেছিস, তাই বল্ ? আরে মুখ্যু, আগে না জন্মালে কখনো আগে বোঝা যায় ? তাহ'লে আমার ইয়া গোঁফ—তোর গোঁফ নেই কেন ?'

এমন জাজ্বল্যমান উদাহরণের বিপক্ষে গোবর্ধনের বাক্‌বিতণ্ডা অগ্রসর হবার পথ পায় না। কিন্তু হর্ষবর্ধন কি থামবার। 'বড় শক্ত জায়গায় এসে পড়েছিস গোবরা, বুদ্ধি একদম না খেলাতে পারলে কোনদিন মারা পড়বি এখানে। চাই কি, তোকেও নম্বর দেগে দিতে পারে—এখনো তুই ছেলেমানুষ তো! কিন্তু আমার আর সে ভয় নেই।'

হর্ষবর্ধন পুনরায় গোঁফে হস্তক্ষেপ করেন। গোবর্ধন প্রসঙ্গটা অন্য দিকে ফেরাবার চেষ্টা করে—'ম্যানেজারের চিঠিটার মানে বুঝেছ ? বালক লিখতে ভুলে লোক লিখে ফেলেছে। কলকাতার বালকরাই মিশুক নয়। দেখলেই তো—কথার জবাব না দিয়েই সাইকেলে চেপে সটকান দিল!'

হর্ষবর্ধন বলেন—'তোরও যেমন বুদ্ধি তারও তেমনি! আমরা কি এত পয়সা খরচ করে বালকদের সঙ্গে মিশবার জন্যেই কলকাতায় এসেছি ? এ রকম ভয় দেখাবার মানে ? ব্যাটাকে দেখতে পেলেই ডিসমিস করব। আমবা প্রবীণ, প্রাজ্ঞ, প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি—বালকদের সঙ্গে মিশতে যাবই বা কেন ? দূর দূর।'

হঠাৎ গোবর্ধন দাদার পিলে চমকে দেয়—'ঐ যে দাদা! আমাদের পাশেই যে তেরোর বারো!'

হর্ষবর্ধন পাশে তাকিয়ে দেখেন, সত্যিই তো, তেরোর বারোই তো বটে! বাঁ-হাতি সম্মুখের বাড়িটার গায়ে পরিষ্কার নম্বর দাগা—১৩।১২, বারোটাকে স্পষ্ট করবার জন্যেই মাঝে দাঁড়ি দিয়ে দু' ভাগ করে দিয়েছে তাতে হর্ষবর্ধনের সন্দেহ হয় না। হঠাৎ তাঁর মনে

এত পুলকের সঞ্চার হয় যে তিনি ভাইয়ের সমস্ত বোকামি মার্জনা করে ফেলেন। বুদ্ধিহীনতা যতই থাক, দৃষ্টিক্ষীণতা নেই গোবরার।

'ও বাবা। এ যে প্রকাণ্ড বাড়ি! দু'জনে এত ঘরে শোবই বা কী করে?'

'আজ এ-ঘরে, কাল ও-ঘরে এই করলেই হবে।' গোবরা যেন ঘমস্যার সমাধান করে—'সব ঘরগুলোই চাখতে হবে তো একে-একে। তুমি একটায় শুয়ো, আমি আরেকটায় শোব।'

'উঁহু!' হর্ষবর্ধন প্রবল প্রতিবাদ করেন—'সেটি হচ্ছে না, আমার ভূতের ভয় করবে তাহলে। তোকে আমার কাছে-কাছে থাকতে হবে। এত বড় বাড়িতে রাত্রে একলা থাকা আমার কম্ম না।'

সাহসী গোবর্ধন দাদার দুর্বলতার সুযোগে একটু মৃদু হাস্য করে নেয়। 'বেশ, তোমার কাছেই থাকব আমি। কিন্তু তুমি আমায় আর যখন-তখন বোকা বলতে পারবে না।'

'দূর, তুই বোকা হতে যাবি কেন? আমার ভাই কখনো বোকা হয়!' হর্ষবর্ধন ভাইয়ের পিঠ চাপড়ে দেন—'ছেলেটা যেমন খোকা নয়, তুইও তেমন বোকা নয়।'

দাদার বিরাট পৃষ্ঠপোষকতায় পড়তে পড়তে টাল সামলে নেয় গোবর্ধন—'হ্যাঁ, মনে থাকে যেন। ফের আমাকে বলেছ কি আমি অন্য ঘরে গিয়ে শুয়েছি। কি ছাতেই শুয়ে থাকব গিয়ে, দেখো!'

হর্ষবর্ধনের কণ্ঠ করুণ হয়—'বিদেশে বিভুঁয়ে এসে অমন করিস নে গোবরা। ভূতের তাড়ায় কোনদিন হয়ত জানলা টপ্‌কে রাস্তাতেই লাফিয়ে পড়তে হবে আমায়! বিদেশে এসে বেঘোরে প্রাণটা যাবে তাহলে! আচ্ছা, এই কথা রইল, তুই যদি একগুণ বোকা হোস আমি একশো গুণ বোকা। তাহলে হবে তো?'

'না, তুমি তাহ'লে হাজার গুণ।' গোবরা গম্ভীরভাবে বলে।

'বেশ ভাই।' হর্ষবর্ধনের মুখ ম্লান হয়ে আসে।

দাদার ম্রিয়মানতায় গোবর্ধনের দুঃখ হয়—'আমি হলে তবে তো তুমি হবে। আমি একগুণও না, তুমি হাজার গুণও না।'

অতঃপর দুই ভাই দরজার সম্মুখে সমাগত হন। দরজায় প্রকাণ্ড ভারি তালা লাগানো। এত কষ্ট করে কলকতায় পৌঁছে গৃহদ্বারে এসে যে এভাবে অভ্যর্থনা লাভ করবেন হর্ষবর্ধন এ রকম আশঙ্কা কোনদিন করেন নি। তিনি ভারী মুষড়ে পড়েন।

গোবরা বলে—'ভেঙে ফেলব? কী বল দাদা? যখন ভাড়া দেব তখন তো আমাদেরই বাড়ি এখন?'

হর্ষবর্ধন বলেন—'ভেঙে ফেলবি, চৌকিদারে কিছু বলবে না তো?'

গোবরা জবাব দেয়—'কলকাতায় আবার চৌকিদার কিছু আছে নাকি?' তবু একবার সতর্ক দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকিয়ে নেয়; 'তিনতলা বাড়ির যদি ভাড়া গুণতে পারি তাহলে সামান্য একতালা ভাঙার দাম দিতে পারি না নাকি?'

'তবে ভেঙেই ফ্যাল্!' হর্ষবর্ধন হুকুম দেন।

গোবর্ধন প্রবল পরাক্রমে তালার সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করে, কিন্তু অল্পক্ষণেই তার বোধগম্য হয়, অসামান্য তালাকে সামান্য জ্ঞান করা তার অন্যায় হয়েছে। মোটা তালাটা যে-দুটি কড়াকে স্বীকার করে রয়েছে সে-দুটি অতি ক্ষীণকায়, অগত্যা তাদের ওপরেই কড়াকড়ি করা যাক ভেবে নিয়ে গোবর্ধন তালাকে তালাক দিয়ে কড়া ধরেই নাড়ানাড়ি শুরু করে দেয়। কিন্তু যতই টানাটানি করুক, দুটোর একটাও ছাড়বার পাত্র নয়। গোবর্ধন ঘেমে, নেয়ে, হাঁপিয়ে বসে পড়ে।

হর্ষবর্ধন এবার দরজার ওপর নিজেই পদাঘাত আরম্ভ করেন। দরজা প্রবল প্রতিবাদ জানায়, কিন্তু এক ইঞ্চি পিছু

হটে না—হটবার কোন মতলব করে না। কাঠের কী কঠোর দুর্ব্যবহার।

তাঁর বিরক্ত কণ্ঠ থেকে বহির্গত হয়—'দূর ছাই! এ কি ভাঙবার দরজা! কলকাতায় ভালো কাঠ চালান্ দেবার ফল ছাখ্ গোবরা, আমাদের কাঠ আমাদের সঙ্গেই শত্রুতা করছে! ছ্যা ছ্যা!'

গোবর্ধন গুম্ হয়ে থাকে।

হর্ষবর্ধন বলতে থাকেন—'এবার থেকে কাঠ পচিয়ে ঘুন ধরিয়ে পাঠাব তেমনি। আমাদের ম্যানেজার তো আর আকাঠ নয়, সে কি আর সাধে বার-বার করে লিখে পাঠায় কলকাতায় ভালো কাঠ পাঠাবেন না, পাঠাবেন না, এখানে ভালো কাঠ চালিয়ে তেমন লাভ নেই; খেলো কাঠ পাঠালেই ভালো হয়। এখন তার মানে বুঝেছি! হুঁ, হাড়ে-হাড়ে বুঝেছি!' হর্ষবর্ধন পাদচারণা শুরু করে দেন।

গোবর্ধনের প্রাণে ক্ষীণ আশার সঞ্চার হয়—'আচ্ছা দাদা, বাড়ির গা দিয়ে একটা লোহার পাইপ দেখছি না—সটান গিয়ে ছাদে উঠেছে?'

'হ্যাঁ, দেখছি তো।'

'আমি ওই ধরে ছাদে উঠি গিয়ে, তারপর নেমে এসে ভেতর থেকে একটা জানলা খুলে দেব, তুমি তখন সেই জানালা দিয়ে, সেঁধিয়ো, কেমন?'

'পারবি উঠতে?'

'আমার তাল গাছে ওঠা অভ্যাস, নারকোল গাছেও উঠেছি। খেজুর গাছেই কেবল উঠিনি কখনো।'

তখন দুই ভাই বাড়ির পাশে এসে দাঁড়ান। হর্ষবর্ধন পাইপের গতিবিধি পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ করে দেখেন—'হ্যাঁ ছাদ পর্যন্তই গেছে বটে। কিন্তু পাইপ বেয়ে ওঠা কি সোজা রে? পারবি তো?'

গোবর্ধন বলে—'ওঠার চেয়ে নামাই সুবিধে বোধহয়। সর্‌-সরিয়ে নেমে গেলেই হল।'

হর্ষবর্ধন ঘাড় নাড়েন—'তা বটে। কিন্তু না উঠলে নামবি কী করে ?'

'তাই করি, কী বল দাদা ? বারকতক উঠি আর নামি, কেমন ? বেশ মজা হবে।'

'হুঁ, খুব ভালো একসাইজ। ওতে তোর সাইজও বাড়বে। কাল থেকে ওটা করিস, আজ একবার উঠেই চট্‌ করে একতলার জানালাটা খুলে দে বরং। রেলে চেপে চেপে তখন থেকে গা ঝিম্‌-ঝিম করছে। ভেতরে গিয়ে একটু গড়িয়ে নেওয়া যাক ততক্ষণ। কিন্তু দেখিস, সাবধান, পা ফস্‌কে পড়ে যাস না যেন।'

গোবর্ধন পাইপস্থ হয়। যুগপৎ তার হস্তক্ষেপ আর পদক্ষেপ চলতে থাকে। হর্ষবর্ধন হাঁ করে তাকিয়ে থাকেন।

পাইপ-পথে গোবর্ধন উর্ধ্বলোকে অদৃশ্য হয়, হর্ষবর্ধন হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকেন—কখন জানলা-যোগে গৃহপ্রবেশের আমন্ত্রণ উন্মুক্ত হবে। কিন্তু অনেকক্ষণ কেটে যায়, তবুও গোবর্ধনের দেখা নেই। হর্ষবর্ধনের ভয় হয়, অতবড় বাড়িতে হারিয়ে গেল না তো! ভাবতে থাকেন, কী সর্বনাশ দেখ দেখি! ঐ প্রকাণ্ড বাড়ির মধ্যে হারিয়ে গেলে খুঁজে বার করা কি সোজা! আর তাছাড়া খুঁজবেই বা কে! ঐ বিপুল ভুঁড়ি নিয়ে খাড়া পাইপ বেয়ে ওঠা হর্ষবর্ধনের কম্ম নয়। শেষটা কি ভাই খুইয়ে আসামীর মতই তাঁকে আসামে ফিরে যেতে হবে নাকি! তাঁর চোখ-মুখ কাঁদো কাঁদো হয়ে আসে।

কিন্তু না—একটু পরেই একতলার একটা জানলার ছিটকিনি

খুলে যায়। গোবর্ধন বত্রিশ পাটি দাঁত বার করে দাদাকে অভ্যর্থনা জানায়। হর্ষবর্ধনের ধড়ে প্রাণ আসে, কিন্তু গোবর্ধনের মুখের হাসি মুখেই মিলিয়ে যায়—'তোমার পেছনে ও কী দাদা ?'

হর্ষবর্ধন পেছনে তাকিয়ে দেখেন, বিরাট জনতা। তারা যে গোবর্ধনের পাইপ-লীলা দেখবার জন্যেই দাঁড়িয়ে, এ কথা তাঁর মনে হয় না,—মুহূর্তমাত্রের মস্তিষ্ক-চালনায় যে বিপদজ্জনক আশঙ্কার আভাস তাঁর চিত্তলোকে চম্‌কে যায় তারই আতঙ্কের ধাক্কায় তিনি পড়ি কি-মরি হয়ে জানলার দিকে হন্যে হন। ছুটে গিয়ে জানলার অভিমুখে দুই হাত বাড়িয়ে দেন, আঁকড়ে উঠবার চেষ্টা করেন—কিন্তু কেবল হাতাহাতি করাই সার হয়, জানলা তাঁকে আদপেই আমল দিতে চায় না। জানোয়ার বলে এতদিন যাদের ঘৃণা করে এসেছেন, মনুষ্য-পদ-বাচ্য হর্ষবর্ধন এখন তাদের প্রতিই ঈর্ষান্বিত হন—হাতকে পায়ের মত ব্যবহার করার দুর্লভ কায়দা কেবল তারাই করতলগত করেছে।

গোবর্ধন দাদার সাহায্যে অগ্রসর হয়—দাদার করমর্দন করে। গোবর্ধনের চেষ্টা থাকে দাদাকে টেনে তুলতে, দাদারও চেষ্টা থাকে ঠেলে উঠতে কিন্তু পৃথিবীর দুশ্চেষ্টা থাকে হর্ষবর্ধনকে ধরাশায়ী করবার। গোবর্ধন এবং মাধ্যাকর্ষণের মধ্যে তুমুল পাল্লা চলে—হর্ষবর্ধন বেচারার প্রাণান্ত হয়। তিনি বাঁচলেও তাঁর ভুঁড়ি বোধহয় আর বাঁচে না এ-যাত্রা! এ রকম অবস্থায় মরিয়া হয়ে উঠতে মানুষের কতক্ষণ ? জলে পড়লে হর্ষবর্ধন যেমন কুটোকে অবলম্বন করতে দ্বিধা করতেন না, স্থলে পড়ায় এখন তেমনি গোবর্ধনকে তৃণবৎ জ্ঞান করে ঝুলে পড়লেন। গোবর্ধন দাদার সঙ্গে সঙ্গে ভূমিসাৎ হল।

হর্ষবর্ধন বলেন,—'পড়লি তো ? এই ভয়ই করছিলাম আমি ! গায়ে যদি হতভাগার একটুখানি জোর থাকে !'

গোবর্ধন সঙ্কুচিত হয়ে যায়।

'আবার তো সেই পাইপ বেয়েই উঠতে হবে? সে কি চারটিখানি কথা?'

গোবর্ধন বলে, 'আচ্ছা, আমি নাহয় পাইপ বেয়েই উঠব, তুমি কিন্তু এক কাজ কর না! আমি কুঁজো হচ্ছি, তুমি আমার পিঠে চড়ে উঠে পড় না কেন—জানালার ওপর?'

'পারবি তো?' হর্ষবর্ধন দ্বিধা বোধ করেন, 'দেখিস, পৃষ্ঠ-ভঙ্গ না হয়ে যায় আবার! বাড়ি গেলে বাড়ি পাব, দাড়ি গেলে দাড়িও পাওয়া যায় কিন্তু তুই গেলে আর তোকে পাব না রে'—হর্ষবর্ধনের মুখের ভাব ভারি হয়ে আসে।

'তুমি ওঠ তো দাদা!' গোবর্ধন দাদাকে উৎসাহিত করে, 'এ কুঁজো কি সহজে ভাঙবার? এ তোমার মাটির কুঁজো নয়!'

'তাহলে উঠছি কিন্তু! উঠি?' হর্ষবর্ধন বারংবার পুনরুক্তি করেন—গোবরা বারংবার অনুমতি দেয়। অবশেষে আর কোন উপায় না দেখে পিঠের উপর একটা পা রাখেন, তখনই নামিয়ে নেন; আবার পদক্ষেপ করেন, কেমন মায়া হয়, আবার নামিয়ে নেন।

'তাড়াতাড়ি কর দাদা!' গোবর্ধন ফিস্‌ফিস্‌ করে—'দেখছ না, কত লোক দাঁড়িয়ে গেছে!'

'ওদের মৎলব বুঝেছি।' হর্ষবর্ধন জবাব দেন।

'বিনে পয়সায় সার্কাস দেখে নিচ্ছে!'

'উঁহু, তা নয়। বাড়ির ভেতরে যাই, তারপর বলছি।'

'দাদা, ভারি দেরি করছ তুমি! লোকগুলো তেড়ে না আসে শেষটায়!' গোবরা অনুচ্চ কণ্ঠে ভয় দেখায়।

লোকগুলো তাড়া করতে পারে এ রকম দুঃসম্ভাবনা হর্ষবর্ধনেরও মনে হয়েছে। সুতরাং তিনি কালবিলম্ব করেন না, গোবর্ধনের

পিঠের উপর চেপে বসে পড়েন, তারপর আর দাঁড়াতে বিশেষ দেরি হয় না—জানলাও সহজে তাঁর নাগাল পায়। হর্ষবর্ধন-ভারে গোবর্ধন যেন আরো ঝুঁকে পড়ে—হয়ত না-মাটির কুঁজোও ভাঙবার মত হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই রুখে ওঠবার তরফে চেষ্টা থাকায় কোন রকমে ভারসাম্য হয়ে যায়।

জানলার অন্তরালে দাদার অন্তর্ধানের পথে গোবর্ধন একটা ঝোঝুল্যমান ঠ্যাং ধরে ফেলে। হর্ষবর্ধন ঠ্যাং নিয়েই ওঠেন, মানে, অগত্যা তাঁকে উঠতে হয়, উপায় কী! ঠাং ফেলে রেখে ওঠা যায় না আর! গোবরাও সঙ্গে সঙ্গে উঠে যায়—অবলীলাক্রমে।

'দেখলে, কেমন দু'জনারই ওঠা হল!' গোবরা বলে। 'পা দিয়েই পাইপের কাজ সারলাম।'

হর্ষবধন সে কথার উত্তর দেন না, অনাহত ভুঁড়ি এবং আহত পায়ের শুশ্রূষা করতে থাকেন। কিন্তু অকস্মাৎ তাঁকে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতে হয়—'কী সর্বনাশ! এখনও খুলে রেখেছিস? বন্ধ করে দে জানলা!'

গোবর্ধন ক্ষিপ্রগতিতে গিয়ে জানলা বন্ধ করে।—'কেন? লাফিয়ে আসবার ভয় করছো?'

'করছিই তো। ওরা কারা, এখনো বুঝতে পারিস নি বুঝি?'

'না তো!' গোবর্ধন বিমূঢ়ের মত তাকায়।

'সেই বাসের লোক সব!'

'অ্যাঁ?' গোবর্ধন তাড়াতাড়ি একটা খড়খড়ি ফাঁক করে দৃষ্টিকে ছড়িয়ে দেয়—'সত্যিই তো! সেই চীনেম্যানটা পর্যন্ত দাদা! দলে বেশ ভারি হয়ে এসেছে এখন!'

'এখানে থাকবার মৎলবে!' হর্ষবর্ধন রহস্যটা বেফাঁস করে দেন। 'বুঝেছিস? সব বিনে ভাড়ায়!'

গোবর্ধন অসন্তোষ প্রকাশ করে—'গাড়ি চড়লি অমনি অমনি,

হাওয়া খেলি···হল। তার ওপর আবার বাড়ি চড়াও! আবদার তো কম না এদের!'

হর্ষবর্ধন জানলায় খিল এঁটে দেন—'আর ভয় নেই।'

গোবর্ধন যোগ করে—'থাক দাঁড়িয়ে। কতক্ষণ আর থাকবে?'

'পাইপ বেয়ে উঠবে না তো?' হর্ষবর্ধনের আশঙ্কা হয়। 'কী মনে করিস তুই?'

'উঠুক গে।' গোবরা দাদাকে ভরসা দেয়, 'চল, আগে থেকে ছাদের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আসি। থাকতে চায় থাকুক গে ছাদে। বাড়িতে ঢুকতে দিচ্ছি না তো—হ্যাঁ!'

দুই ভাই তড়িৎগতিতে সিঁড়ি অতিক্রম করে যান। সর্বোচ্চ দরজাটি অর্গলিত করে তবে দু'জনের দুশ্চিন্তা দূর হয়।

গোবরা বলে চলে—'এখন পাইপ বেয়ে ওঠ আর পাইপ বেয়ে নাম। বাড়িতে ঢোকার ফাঁক রাখি নি বাপু। চীনেম্যান নিয়ে এসে ভয় দেখানো হচ্ছে আমাদের। বটে? এবার চীনেম্যানগিরি বেরিয়ে যাবে—হ্যাঁ।'

হর্ষবর্ধন কিছু বলেন না, নীরবে হাঁপান।

অনন্তর দুই ভাই বিভিন্ন ঘর দেখতে বেরোন হন। প্রত্যেক কামরাতেই খাট, পালঙ্ক, দেরাজ, ডেস্ক, আয়না ও আলমারি, নানা প্যাটার্নের টেবিল চেয়ার ইত্যাদি নানান ফার্নিচারের ছড়াছড়ি।

'আমাদের দামি দামি কাঠ কিনে এনে ভেঙে চুরে ট্যারা বাঁকা করে কী সব বানিয়েছে দেখছিস?' হর্ষবর্ধন ভাইয়ের দৃষ্টি আকর্ষন করেন।

গোবর্ধন ঠোঁট বাঁকায়—'কাঠের শ্রাদ্ধ কেবল!'

'সোজাসুজি চৌকি করলি, টুল করলি, চারকোণা টেবিল করলি, ফুরিয়ে গেল—কাঠ নিয়ে এত মারপ্যাচ কেন রে বাপু!'

'দরকার তো শোবার, বসবার, আর কখনও কদাচ দু'-এক কলম লেখবার। কাজ চলে গেলেই হল।'

'হ্যাঁ, কাজ চলা নিয়ে কথা। কিন্তু এসব কী!' অকস্মাৎ যেন তাঁর পিলে চমকে যায়। 'কাঠগুলোর কী সর্বনাশ করেছে রে গোবরা! ঐ ছাখ একটা গোল টেবিল—মোটে তিনটে পা!'

গোবরা বিরক্তি ব্যক্ত করে—'তিন পায়া তো পদে আছে, ঐ কোণেরটা দেখেছ?'

হর্ষবর্ধন সবিস্ময়ে দেখেন, একটা টেবিলের মোটে একখানা পা—তাও আবার ঠিক মধ্যিখানে—তারই সাহায্যে বেচারা কোন গতিকে কায়ক্লেশে দাঁড়িয়ে আছে।

গোবর্ধন বলে, 'ও টেবিল কোন্ কাজে লাগবে শুনি? ওতে কি শোয়া বসা যাবে?'

হর্ষবর্ধনও সমর্থন জানান—'হুঁ, বসেছ কি কাৎ, আর চিৎপাৎ!'

হঠাৎ হর্ষবর্ধনের আকস্মিক উল্লাস হয়—'দেখলি, দেখলি—কেমন পদ্য হয়ে গেল! বসেছ কি কাৎ, আর চিৎপাৎ!'

হর্ষবর্ধন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানাভাবে কবিতাটাকে আবৃত্তি করেন, গোবর্ধনও করে। তারপর দুই ভায়ে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে ঘাড় নাড়তে থাকেন।

গোবর্ধন বলে, 'আবার মিলেও গেছে কেমন! কোনো খবর-কাগজে ছাপতে দাও দাদা! বেশ পদ্য!'

দুই ভাইয়ের মনে বাল্মীকি-সুলভ আনন্দের সঞ্চার হয়—বাল্মীকির প্রথম কবিতা প্রকাশিত হবার পরই যে রকম আনন্দ হয়েছিল বলে শোনা গেছে।

তারপর দু'ভাই একটা বড় ঘরে আসে। হর্ষবর্ধন বলেন, 'একটু বসা যাক এখন।'

দুটো চার-পায়া টেবিল—যাদের নির্ভরযোগ্যতা সম্বন্ধে সংশয়ের অবকাশ নেই—পাশাপাশি টেনে আনা হয়। একটা হর্ষবর্ধন অধিকার করেন, আর একটাতে গোবরা বসে।

'চেয়ারে গুটিসুটি মেরে বসা আমাদের পোষায় না বাপু। ছড়িয়ে না বসলে বসার আরাম!'

'আলবাৎ দাদা!' গোবরাও বাতলায়: 'এমন আসনে বসতে হবে যে যখন খুশি ইচ্ছে হলে শুয়ে পড়াও শক্ত নয়।'

'খাবার দরকারের মত ঘুমোনোরও দরকারও তো মানুষের প্রতি পদেই। গোবরা, ঐ গদি-আঁটা কিম্ভূতকিমাকার চেয়ার দুটো টেনে আন তো! পা রাখার অসুবিধা হচ্ছে।'

পা রাখার সুবিধার জন্যে চেয়ার আসে। দুই ভাই গ্যাঁট হয়ে বসে থাকেন। সামনের প্রকাণ্ড আয়নায় হর্ষবর্ধনের প্রতিচ্ছায়া পড়ে—আয়নার ভেতরের আর বাহিরের হর্ষবর্ধনেরা পরস্পরের দিকে তাকায় আর নিজের নিজের গোঁফে চাড়া দেয়। গোবর্ধন দাদাদের কাণ্ড দেখে।

অদূরদেশ থেকে জুতোর আওয়াজ আসে। হর্ষবধন অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত করেন—'তারাই! বুঝতে পেরেছিস?'

'তালা ভেঙে ঢুকেছে তাহলে! কী হবে এখন?'

হর্ষবর্ধন হাল ছেড়ে দেন—'কী আর হবে! থাকতে দিতে হবে। তোদের কলকাতার যেমন হালচাল তেমনি তো হবে!'

গোবর্ধন প্রতিবাদ করে—'আমাদের কলকাতা! অমন কথাটি বোলো না! আসামের খাসা জঙ্গল থাকতে এমন জায়গায় আবার মানুষ আসে! ছ্যা ছ্যা!' গোবর্ধন যেন প্রায়শ্চিত্ত করতে প্রস্তুত।

গোবরা দরজার ফাঁক দিয়ে সন্তর্পণে মুখ বাড়িয়ে দেখে, আগন্তুক মোটে একটি লোক এবং একমাত্রই। তার সাহস বাড়ে, হাঁক ছাড়ে—'কে?'

লোকটা চম্‌কে যায়, পালাবে কি দাঁড়াবে ইতস্তত করে—বিড়-বিড় করে কী যে বলে কিছুই বোঝা যায় না।

হর্ষবর্ধন সম্মুখীন হন—'অমন হাঁ করে আমাদের দেখবার কী আছে? ভয় পাবারই বা আছে কী? কলকাতার লোক ভারি অসভ্য বাপু তোমরা!'

ভূত নয়, অদ্ভুত-কিছু এইরকম একটা আঁচ করে এতক্ষণে লোকটার ভয় কমে, তার কম্পিত কণ্ঠে শোনা যায়, 'কে আপনারা?'

'পরিচয়টা দিয়ে দাও না দাদা!'

'বর্ধন কোম্পানির বড় কর্তা আর ছোট কর্তা। আমি শ্রীহর্ষবর্ধন আর ও গোবরা—।'

'উঁহু, শ্রীযুক্ত গোবর্ধন। এখন বল তো বাপু, তুমি কে? কড়ি-কাঠ থেকে নেমেছে বলেই মনে হচ্ছে যেন! ভূত-পেরেত নও তো?'

ভদ্রলোকটি আমতা আমতা করে—'আজ্ঞে না, আমি কর্মচারী।'

'অ্যাঁ? কর্মচারী!' হর্ষবর্ধন লাফিয়ে ওঠেন, 'বলি বাপু, এতক্ষণ কোথায় থাকা হয়েছিল? শিয়ালদায় সকালে যাওয়া হয় নি কেন? মনিব আমি, আর আমার সঙ্গেই মিশতে চাও না এতদূর তোমার আস্পর্ধা—তারপরে তুমি তবিল মেরে সটকেছো—'

'হুঁ, আমরা যখন শিয়ালদায় নামছি তখন তুমি হাওড়া দিয়ে হাওয়া হয়ে গেছো।' গোবর্ধনেরও রোখ চেপে যায়।

'যাও, তোমাকে ডিসমিস করলুম।' হর্ষবর্ধন হুকুম পাশ করেন, —'তবিল যা মেরেছ তা মেরেছ, তা আর ফেরত চাই না। তার কোনো হিসেবও দিতে হবে না তোমায়। টাকা ওড়াবার জন্যই আমাদের কলকাতায় আসা—ওটা এখানকার বাজে খরচের মধ্যেই ধরে নেব।'

'হ্যাঁ, মেরে থাকো ভালোই করেছ, তার কোনো জবাব দিতে হবে না, কিন্তু জবাব হয়ে গেল তোমার। ব্যস, খতম্।'

এতক্ষণে লোকটা কথা বলবার ফাঁক পায়—'আজ্ঞে আপনারা ভুল করছেন, আমি আপনাদের লোক নই। এই বাড়ির মালিকের কর্মচারী আমি।'

হর্ষবর্ধন হতভম্ব হন, উনি ছাড়াও পৃথিবীতে আরো লোক নাকি কর্মচারী রাখে—এও কি সম্ভব? কিন্তু ক্রমশ এ কথাটাও তাঁর বিশ্বাস হতে থাকে। তিনি নিজেকে সামলে নেন, কিন্তু গোঁ ছাড়েন না—'তাহলেও বলি বাপু, তোমার এ কী রকম আক্কেল। আমরা হলুম ভাড়াটে—আর আমাদের তালাবন্ধ করে পালিয়েছ?'

'এটা কি উচিত?' গোবরাও কৈফিয়ৎ চায়।

লোকটা নমস্কার করে—'ও! আপনিই বুঝি মিস্টার নন্দী?'

হর্ষবর্ধন ঘাড় নাড়েন—'উহুঁ, নন্দী নই—কস্মিন কালে না।'

গোবর্ধন যোগ করে—'ভৃঙ্গীও নই, আমরা হচ্ছি বর্ধন। আসামী, কিন্তু ফৌজদারী আসামী নই। আসামের লোক বলেই আসামী।'

লোকটা বলে—'জমিদার গোঁয়ারগোবিন্দ সিং এ বাড়ি কেরায়া করেছেন—আপনি তাঁরই ম্যানেজার তো?' একটু থেমে,—'কিংবা আপনিই বাবু গোঁয়ারগোবিন্দ সিং কি না কে জানে!'

'অত শিং নাড়ছ কেন বল তো হে! আসামের হাতির দাঁত ধরে ঝুলি, শিং দেখে ভয় খাবার ছেলে নই আমরা।' গোবরা দাদার সঙ্গে যোগ দেয়—'তেরোর বারো নম্বরের এই বাড়ি আমাদের ম্যানেজার ভাড়া করে গেছে।'

লোকটা গোবরার কথার প্রতিবাদ করে—'তাহলে আপনারা ভুল বাড়িতে এসেছেন মশাই! এ তো ও নম্বর নয়!'

'আলবাৎ ওই নম্বর! নিজের চোখে দেখা, বললেই হবে?'

'তুমি তো ভারি মিথ্যাবাদী হে!' গোবরা বলে—'তোমার আর দোষ কি দেব, তোমাদের দেশেরই এই স্বভাব। একজন তো চিঠি লিখেছেন যে কলকাতার লোকরা মিশুক নয়। কী রকম যে মিশুক নয় তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি!'

'তুমি বলছ ভাড়া করি নি, বেশ ভাড়া করছি। এখনই করে ফেলছি, এই দণ্ডে। গোবরা, নোটের তাড়াটা বের কর তো! কত ভাড়া তোমার?'

'কী করে আপনাকে এ বাড়ি দেব মশাই? মিঃ সিং যে বায়না করেছেন।'

হর্ষবর্ধন অবাক হন—'সিং-এর বয়স কত?'

'মিঃ সিং দাঁড়াশের জমিদার, শুনেছি খুব বুড়ো মানুষ।'

'ছেলেরাই তো বায়না করে শুনে আসছি চিরকাল—কলকাতার বুড়ো মানুষেরাও নাকি আবার,—অ্যাঁ, এ কী বলে রে গোবরা?'

গোবরাও বিস্মিত হয়—'বুড়ো মানুষের বায়না! আজব শহরে এসে পড়া গেছে দাদা!'

'সে বায়না নয় মশাই, এক মাসের ভাড়া অগ্রিম দাদন দিয়ে গেছেন। দুশো ছত্রিশ টাকা।'

'বেশ, আমরাও নাহয় দাদন দিচ্ছি। পশ্চাৎ দাদনই দিলাম না হয়, কিন্তু ডবল দাদন। দিয়ে দে তো গোবরা চারশো বাহাত্তর টাকা!'

গোবরা গুণে গুণে নোট দেয়—'গেল এ মাসের দাদন! আবার আসছে মাসে দেব—অবশ্য যদি থাকা হয়। মাসকাবারি এসে নিয়ে যেয়ো তোমার দাদনের টাকা!'

নোটের গাদা দেখে লোকটার মুখ সাদা হয়ে যায়, সহজে কথা বেরোয় না। অনেক কষ্টে বহুক্ষণ পরে বলে, 'বেশ, মিঃ সিংএর

জন্যে অন্য বাড়ি দেখতে হবে তাহলে। তিনি আজই দাঁড়াশ থেকে রওনা হবেন কিনা। কাল এখানে পৌঁছনোর কথা আছে।'

হর্ষবর্ধন কি যেন চিন্তা করেন—'একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করব বাপু? কিছু মনে কোরো না। তোমাদের এই শহরে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থাটা কি রকম? কিছু একটা ব্যবস্থা আছেই, না খেয়ে কেউ বাঁচে না নিশ্চয়ই?'

গোবর্ধন বলে, 'না খেয়ে আবার বাঁচা যায় নাকি। তুমি কী যে বল দাদা! খেতে না পেলে লোকে বাঁচাতে চাইবেই বা কেন? খাবার জন্যেই তো বেঁচে থাকা।'

লোকটি জবাব দেয়—'হ্যাঁ, আছে বই কি। ভালো ভালো পাইস হোটেল আছে। সেখানে এক পয়সার ভাত, এক পয়সার ডাল, ঝাল, ঝোল, অম্বল, তরকারি, চচ্চড়ি, শুক্ত, পল্‌তা, মাছের ঘণ্ট, কপির তরকারি—যা চাই সব এক-এক পয়সায় পাবেন।'

'কলকাতার লোক সব সেখানেই গিয়ে খায় বুঝি? বাঃ বেশ ব্যবস্থা তো!'

গোবরা ঘাড় নড়ে—'অনেক পয়সা খরচ হয় কিন্তু!'

'যার যেমন খুশি', লোকটা ভরসা দিতে চায়—'কেউ ইচ্ছে করলে তিন পয়সার খেয়েও চলে আসতে পারে, কেবল ভাত আর ডাল।'

'কতদূর সেই হোটেল?' হর্ষবর্ধন জিজ্ঞেস করেন।

'একটু দূর আছে, জগুবাবুর বাজারের কাছটায়।'

'দেখ, আমরা আজ অনেক খেটে-খুটে আসছি দেশ থেকে—রেল গাড়ি চড়ে এসেছি—গোবরাকে তার ওপরে আবার বাড়িতেও চড়তে হয়েছে। আমাদের আর নড়বার চড়বার ক্ষমতা নেই। তুমি যদি বাপু দয়া করে এখানে আমাদের ডাল ভাত তরকারী

সব কিনে এনে দিয়ে যাও তাহলে বড়ই বাধিত হই। তোমাকে টাকা দিচ্ছি অবশ্য।'

গোবরা উৎসাহিত হয়ে ওঠে—'যত রকম খাবার সব এক-এক পয়সার এনো—দুশো পাঁচশো যতরকম আছে। সকাল থেকে ভারি খিদেও পেয়েছে দাদা!'

'গোটা পাঁচেক টাকা দিলে কুলোবে? দে তো গোবরা টাকাটা।'

'খুচরো তো নেই দাদা! খুচরো নেই বলেই তো ওকে চারশো বাহাত্তরের জায়গায় চারশো আশি দিতে হয়েছে।'

'তবে তো ঐখানেই আট টাকা রয়েছে।' হর্ষবর্ধন উল্লসিত হন, 'সত্যি গোবরা, তুই নিজের খেয়ালে কাজ করিস বটে কিন্তু এক-এক সময় এমন বাঁচিয়ে দিস যে তোকে কোলাকুলি করতে ইচ্ছে করে!'

কোলাকুলির প্রস্তাবে গোবর্ধন ভীত হয়; এত হাঙ্গামার পর আবার যদি ঐ ভুঁড়ির ধাক্কা সামলাতে হয় তাহলেই ও কাবার! তার উপর আবার এই খিদে পেটে!

কথাটা চাপা দেবার চেষ্টা করে সে—'তাহলে বাপু, একটু চট্ করেই আন গে। টাকা পাঁচেকের যত পাইস খাবার, আর যে তিন টাকাটাক্ বাঁচল তুমি নিয়ো। কেমন?'

এ রকম কষ্ট স্বীকারে লোকটার বিশেষ আপত্তি দেখা যায় না। 'বেশ, আপনারা ততক্ষণে নেয়ে-টেয়ে নিন, আমি এসে পড়লুম বলে।' বলে সে চলে যায়—তার পুলকিত পদধ্বনি হর্ষবর্ধনকে বিস্মিত করে।

'এখানকার লোকগুলো অদ্ভুত কিন্তু! একটুতেই খুশি। যা করতে বলবি তাতেই রাজি হয়ে রয়েছে, কেবল বলবার অপেক্ষা!'

'তার উপর ইংরিজি বিদ্যে এককোঁটাও নেই পেটে। নাইস

হোটেলকে বলছে পাইস হোটেল! নাইস মানে ফাস্‌কেলাস,—জান তো দাদা?

'তোর জন্মাবার আগে থেকে জানি!' বলতে বলতে হর্ষবর্ধন টেবিলের উপর লম্বা হন—তাঁর হাই উঠতে থাকে।

সেদিন বিকালের কাহিনী। দুই ভাই গভীর পরামর্শে বসেছেন। আলোচ্য বিষয়, এবার কী করা যায়? নিশ্চয়ই এখনও কলকাতায় আরো অনেক কিছু দেখবার, শোনবার, যাবার এবং চাপবার বস্তু রয়েছে, কিন্তু সে সবের সদ্ব্যবহার করবেন কী করে? জীবনে এই প্রথম তাঁদের কলকাতায় আসা এবং এই হচ্ছে প্রথম দিন। এরই মধ্যে কলকাতার হালচাল যা তাঁরা টের পেয়েছেন সেই সদ্যলব্ধ অভিজ্ঞতা নিয়েই দুই ভাইয়ের আলোচনা চলছিল।

বাস্তবিক, তাঁরা তো নিতান্ত কেউকেটা লোক নন। আসামের বিখ্যাত বর্ধন অ্যাণ্ড বর্ধন কোম্পানির বড় দুই অংশীদার। কলকাতায় এসেছেন ফূর্তি করতে—টাকা ওড়াতে। হ্যাঁ, এ পর্যন্ত জীবনে অনেক টাকা তাঁরা কামিয়েছেন, এবার কিছু কমিয়ে যাবেন, এই ওঁদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। এজন্যে কলকাতার যত কিছু দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, গন্তব্য এবং চাপ্‌তব্য বিষয় আছে সব তাঁরা দেখবেন, শুনবেন যাবেন এবং চাপবেন—আর যতো রকমের খাবার আছে চাখবেন সব—সেজন্যে যত টাকা লাগে দুঃখ নেই।

কিন্তু টাকা ওড়াবার জো কী! টাকা এমন চীজই নয় যে উড়িয়ে দিলেই উড়ে যাবে। গোবর্ধন একবার দুশ্চেষ্টা করেছিল দেখতে, টাকা আকাশে ছুঁড়ে দিলে সত্যিই উড়ে যায় কি না—কিন্তু পরমুহূর্তেই দেখল তা হাতেই এসে পড়ে, কিংবা হাতের নেহাৎ কাছাকাছি। তা ছাড়া কলকাতার মত জায়গায় টাকা ওড়ানো

ভারি কঠিন, হর্ষবর্ধন ভাইকে এই মোট কথাটা বোঝাতে চাচ্ছিলেন। 'দেখলি না সকালে, আমরা একশ টাকা দিয়ে গোটা মোটর ভাড়া করে সবাইকে অমনি হাওয়া খাওয়াতে যাচ্ছি কিন্তু লোকগুলো গায়ে পড়ে সেধে সেধে পয়সা দিতে আসে?'

গোবর্ধন ঘাড় নেড়ে জানায়—'হুঁ, টাকা জিনিসটা উপায় করা সহজ, কিন্তু ওড়ানোই দেখা যাচ্ছে কঠিন।'

'বিশেষ কলকাতার মতন জায়গায়। এখানকার বোকাদের ঠকিয়ে দু' পয়সা করা যায় বেশ। লোকে যে বলে কলকাতার পথে-ঘাটে পয়সা ছড়ানো আছে—নেহাত মিথ্যে নয়।'

'ঠিক বলেছ। কিন্তু আমাদের পয়সারই যে অভাব নেই, এই হচ্ছে দুঃখের বিষয়।'

'হুঁ, হঠাৎ কোনগতিকে গরিব হয়ে যেতে পারলে আবার ব্যবসা ফেঁদে এখানে বেশ বড়লোক হওয়া যেত। কিন্তু যা টাকা জমেছে তাতে কি গরিব হওয়া সম্ভব?' হর্ষবর্ধন উৎসুকচিত্তে গোবর্ধনকে প্রশ্ন করেন।

ছোট ভাই দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করে বলে—'এ জন্মে না।'

হতাশ হয়ে বড় ভাই চুপ করে থাকেন, খানিক বাদে উত্তেজিত হয়ে উঠেন—'তাই বলে কি এমনি করে হাত-পা গুটিয়ে হাল ছেড়ে বসে থাকতে হবে? চেষ্টা করতে হবে না? চেষ্টার অসাধ্য কী আছে? এই আজ কলকাতায় এসেছি—সারা দিনে আর কতই বা খরচ হয়েছে এ পর্যন্ত। এত কম খরচ হলে চলবে কি করে? এই জন্যেই কি কলকাতায় আসা? নতুন নতুন উপায় করতে হবে না টাকা ওড়াবার? মনিব্যাগটায় দু-পাঁচ শো যা ধরে নিয়ে নে, বেরিয়ে পড়ি চল্। দিনটা কি এমনি বৃথায় নষ্ট হবে?'

হর্ষবর্ধনবাবু ভ্রাতা এবং মনিব্যাগ সমভিব্যাহারে বেরিয়ে পড়লেন, তিক্ত বিরক্ত হয়ে। বাস্তবিক, অদ্ভুত জায়গায় এসে পড়া গেছে,

টাকা খরচ করবার একটা পন্থা নেই গো! টাকা ওড়াবার নিত্য নতুন ফন্দি বাৎলাতে পারে এমন একজন লোক ভয়ানক বেশি মাইনে দিয়ে রাখতেও তিনি প্রস্তুত,—হ্যাঁ, এই মুহূর্তেই। এক হাজার—দু'হাজার—যা বেতন চায় নিক।

রাস্তায় বেরিয়েই দেখলেন, একজন লোক মইয়ে উঠে তাঁদের বাড়ির দেওয়ালে প্রকাণ্ড বড় একটা ছবি সাঁটছে। ছবিটা হনুমানের নাকি?—না, হনুমান নয়, দুই ভাই ভালো করে নিরীক্ষণ করলেন—ছবিটা একটা অতিকায় জাম্বুবানের। বড় বড় অক্ষরে ছবির বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া আছে—ছবির মাথায়, নিচে, জাম্বুবানের বগলের দাবায়—'কিঙ্‌কঙ্‌—অত্যন্ত চমকপ্রদ রোমাঞ্চকর চিত্র, রাওনাক্‌-মহলে আসুন!'

'হুঁ, যা বলেছে! এটি যে চমকপ্রদ জাম্বুবান তার ভুল নেই।'

গোবর্ধন সায় দেয়—'খুব রোমাঞ্চকরও তার ওপর। না দাদা?'

হর্ষবর্ধন লোকটিকে ডাকেন—'ওহে ব্যক্তি, শোন শোন।' মই আর ময়দার বালতি হাতে লোকটি এগিয়ে আসে। 'বেশ, বেশ ছবি তোমার। ভারি খুশি হলাম। যাও, একটা আমাদের বাড়ির ভেতরে গিয়ে লাগিয়ে দাও গে।'

লোকটি জানায় এসব বায়োস্কোপের পোস্টার, বাড়ির ভেতরে লাগিয়ে বরবাদ্‌ করা তার সাধ্য নয়। হুকুম নেই।

হর্ষবর্ধন গোবর্ধনকে ফিস্‌-ফিস্‌ করে বলেন—'না লাগায় নাই লাগাবে। রাত্রে এসে তখন চুপি-চুপি খুলে নিয়ে গেলেই হল—কী বলিস? বেশ ছবিখানা। কত বড় হাঁ করেছে ছাখ্‌। একটা বড় কাঠের ফ্রেমে বাঁধিয়ে দেশে নিয়ে যাব।'

গোবর্ধন কানে কানে জবাব দেয়—'হ্যাঁ দাদা। আর যদি এখানে বাঁধাতে বেশি খরচ পড়ে, ছবিটার আন্দাজের একটা বড়

কাঁচ কিনে নিয়ে গেলেই হবে। দেশে তো আর কাঠের দুঃখ নেই! কারিগরকে দিয়ে ফ্রেম বানিয়ে নিতে কতক্ষণ!'

হর্ষবর্ধন দিল্‌দরিয়া হয়ে ওঠেন—'না, না, এখানেই বাঁধাব। লাগুক না কত টাকা লাগবে! কোথায় বৈঠকখানা লেন জানি না, কিন্তু খুঁজে নেব; সেখানে আমাদেরই কাঠের দোকানটা রয়েছে তো, কত চড়া দামে তারা আমাদের কাঠ আমাদেরকেই বিক্রি করে দেখাই যাক না! ম্যানেজারটার কাজের বহর জানা যাবে।' তারপর গোঁফ মুচড়ে নেন—'আরে হাঁদা, আসল কথাটা কী জানিস? তোর বৌদি আসবার সময়ে বলেছিল আমার একটা ফটো তুলিয়ে নিয়ে যেতে। কোথায় ফটো তোলে জানি নে তো, এই বিরাট শহরে কোথায় ফটোর কারখানা কে খুঁজে পাবে? তার বদলে যদি এই ছবিখানি বাঁধিয়ে নিয়ে যাই সে খুশি হবে না কি?'

গোবর্ধন গম্ভীরভাবে বিচার করে, একবার দাদার দিকে একবার কিঙ্‌কঙের দিকে তাকায়, তুলনা করে দেখে বৌদির চোখে কে অধিকতর পছন্দসই হবে, তারপর ঘাড় নেড়ে সমর্থন জানায়।

হর্ষবর্ধন লোকটিকে ডাকেন—'আর একখানা যদি না দিতে পার নাই দেবে। আমরা বাঁধাতাম কিনা! তার দরকারও নেই বিশেষ—গোবরা হতভাগা তো বিয়েই করে নি। কিন্তু কী জান, আমরা বড়লোক কিনা, চিত্রকলার সমঝদার আর পৃষ্ঠপোষক হতে হয় আমাদের। বড়লোক হওয়ার অনেক হ্যাপা, বুঝলে হ্যা? যাক, আমরা দুঃখিত নই সেজন্যে। তা, ছবিখানা আমাদের বাড়ির গায় লাগিয়েছ তার জন্যে কত দিতে হবে তোমায় শুনি? যা চাও বল, লজ্জা কোরো না—কোন দাম দিতেই আমরা কুণ্ঠিত নই।' চাপা গলায় গোবর্ধনের মত নেন—'একশো টাকার একখানা নোট ওকে দিই, কেমন? খুব কম হবে না তো, ছাখ্! কলকাতা শহরে এসে মান-মর্যাদা খোয়ানো চলবে না তো!'

গোবর্ধন 'সেফসাইডে' থাকে, বলে, 'তাহলে ছু-খানাই দাও।'

পোস্টারওয়ালা বোধহয় ঘাবড়ে গিয়েছিল, সে জবাব দেয়—'টাকা নিতে পারব না বাবু, এই হল আমাদের কাজ।'

ছুই ভাই যে বেশ মর্মাহত হয়েছেন তা মুখ দেখেই বোঝা যায়। লোকটা সান্ত্বনা দিয়ে জানায়—'আচ্ছা, আসছে হপ্তায় আর একখানা ছবি লাগিয়ে যাব, সেটা এর চেয়ে বাচ্চা গোছের—সান্ অব কঙ্।'

হর্ষবর্ধনের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে—'বেশ বেশ। সেই ভালো। কিন্তু সেই সঙ্গে একটা ব্রাদার অব্ কঙ্‌ও আনতে পার না? এখনও আমার কোনো ছেলেপুলে হয় নি তো, তবে শ্রীমান…' গোবর্ধনের দিকে তাকিয়ে কথাটা ভাববাচ্যে সেরে নিতে চান।

হর্ষবর্ধন ভাইয়ের ছুঃখ সহ্য করতে অপারগ। তিনি কিঙ্ কঙ্ নিয়ে অম্লান বদনে বাড়ি ফিরবেন আর ভাই খালি হাতে বিষণ্ণ মুখে যাবে—এক যাত্রায় পৃথক ফল—এ চিন্তাও তাঁর অসহ্য।

লোকটা বলে—'আচ্ছা পুছব কর্তাদের। বোধহয় ব্রাদার অব্ কঙ্‌ও বেরিয়েছে অ্যাদ্দিনে।'

হর্ষবর্ধন অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেই মানিব্যাগের মুখ বন্ধ করেন—'সেদিন তোমায় টাকা নিতে হবে কিন্তু!'

গোবর্ধনও মনে করিয়ে দেয়—'হ্যাঁ, সেদিন আর "না" বললে শুনছি না!'

দেয়াল-শিল্পী চলে গেলে পরে হর্ষবর্ধন জিজ্ঞাসু হন—'ছবিটার মধ্যে কী সব লিখেছে পড়ে ছাখ্ তো—ব্যাপারটা কী বলে!'

গোবর্ধন সমস্তটা পড়ে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করে—'ধর্মতলায় রাওনাক্-মহলে একটা বাইশকোপ হচ্ছে—সেখানে যেতে বলছে সবাইকে।'

'চল্, যাই সেখানে। অমনি নাকি রে?'

ঐ যে লিখেছে—"বিলম্বে আসিলে টিকিট পাইবে না।" টিকিট লাগবে।'

'লাগুক না! টাকা খরচ হবে তো তবু! বলছে যখন, তখন আর বিলম্ব করে কাজ নেই, চল যাই।'

'হনুমানের ভাই জাম্বুবান—রামায়ণে পড়নি দাদা? তারই যত কীর্তি-কলাপ, বুঝেছ?'

'অনেকক্ষণ। সমস্কৃত ছবি—নাম দেখে বুঝতে পারছিস না? কিং কং, ততঃ কিং—কিংকর্তব্যবিমূঢ়—এসবই হচ্ছে সমস্কৃত।'

গোবর্ধন উৎসাহিত হয়ে ওঠে—'রামলীলা দেখতে খুব ভালো লাগে আমার। তিন বছর আগে সেই দেখেছিলাম মনে নেই? কিন্তু এ তো আর সে রামযাত্রা নয়, এ হল গিয়ে রামবাইশ-কোপ! তার চেয়ে আরো ভালো হবে নিশ্চয়।'

'মনে আছে বইকি। সে ছিল হনুনানের লঙ্কাকাণ্ড, এ বোধহয় জাম্বুবানের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড-টাণ্ড হবে। ধর্মতলাটা কোন্ দিকে রে, জিজ্ঞাসা কর্ না কাউকে।'

'জিজ্ঞাসা করে কী হবে, ভাববে পাড়াগেঁয়ে, তার চেয়ে একেবারে মোটরে চেপে বসা যাক।' গোবর্ধনের মোটর চাপবার শখ বেজায়। '—সকালে তো একটা একতালা মোটরে চেপেছিলাম, এবেলা কত দোতালা মোটর ছুটোছুটি করছে দেখ না দাদা! ডাকব একটাকে?'

'উঁহু, মোটরে হুস্ করে নিয়ে যায়, শহর দেখা হয় না। যদি কলকাতাই না দেখলাম তো কলকাতায় এসে করলাম কী? এবেলা দোতালা মোটর বেরিয়েছে, কাল সকালে দেখবি তিনতালা, কাল বিকেলে চারতালা—কত কি দেখবি, দু-দিন থাক না, আস্তে আস্তে বেরুবে সব। ভাড়াও হবে তেমনি—নিশ্চয় ডবল, তিনগুণ, চারগুণ —তা কেন, হাজার টাকাই হোক না, আমরা বাপু পিছ-পা নই।'

সগর্বে পদক্ষেপ করতে করতে হর্ষবর্ধন অগ্রসর হন, অগত্যা ব্রাদার অব্ হর্ষবর্ধনকেও মোটর না চাপতে পারার দুঃখ হজম করে দাদার অনুসরণ করতে হয়।

চলতে চলতে হর্ষবর্ধনের হঠাৎ কিসে যেন পা পড়ল, তিনি তক্ষুনি পিছলে দুশো হাত দূরে গিয়ে দাঁড়ালেন। পিছলে সাধারণত লোকে পড়েই যায়, কিন্তু তিনি অবলীলাক্রমে দাঁড়িয়ে গেলেন। অকস্মাৎ তীরবেগে অগ্রসর হবার সময় ধারণা হয়েছিল হয়ত কোন আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটছে, কিন্তু অবশেষে যখন দণ্ডায়মান অবস্থাতেই থাকলেন তখন তাঁর মনে হল, এ তো বেশ মজা!

নিঃশব্দ-চলমান দাদার সমকক্ষতা বজায় রাখতে গোবর্ধনকে সশব্দে দৌড়তে হল। হর্ষবর্ধন পায়ের তলায় তাকিয়ে দেখেন, এই দুর্নিবার গতিরহস্যের মূলে সামান্য একটা কলার খোসা। এরই পিঠে চেপে তিনি এক মুহূর্তে এতখানি পথ অনায়াসে উত্তীর্ণ হয়েছেন। কলকাতায় কলার খোসাও একটা চাপ্তব্য ব্যাপার তাহলে?

হর্ষবর্ধন গোবর্ধনকে গতিরহস্যটা বুঝিয়ে দেন—'ওঃ, এতক্ষণ লক্ষ্যই করিনি, চারদিকেই কলার খোসা ছড়ানো রয়েছে যে! এগুলো কেন ছড়িয়েছে জানিস? চলবার সুবিধের জন্যে। দেখলি না—না-হেঁটে না-দৌড়ে না-লাফিয়ে দুশো হাত এগিয়ে এলাম! লহমায় দুশো হাত আনাগোনা কম কথা নয়!'

গোবর্ধন মাথা নাড়ে—'যা বলেছ! যারা মোটরে যেতে পারে না তাদের জন্যেই রেখেছে বোধহয়। মোটরের মতনই বেগে যায় অথচ ভাড়া নেই একটি পয়সাও! কলকাতার হালচালই অদ্ভুত দাদা!'

'আমার ভারি চমৎকার লেগেছে। এখন থেকে আমি কলার

খোসা চেপেই যাতায়াত করব, কী বলিস? কেন অনর্থক হেঁটে মরি। দেরিও হয় বেশ তাতে।'

'না না, পড়ে যেতে পার দৈবাৎ।' গোবর্ধন আপত্তি জানায়।

'পাগল, আমি পড়ি কখনও? কখনও পড়তে দেখেছিস আমায়? কোনও জন্মে?'

'আমি তা'বলে অত অত দৌড়তে পারব না তোমার সঙ্গে।'

'সেই কথা বল্।' হর্ষবর্ধন হাসতে থাকেন।

এসপ্লানেডের মোড়ে এসে হর্ষবর্ধন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন—'এবার কোন্ দিকে যাব রে? চারদিকেই তো রাস্তা দেখছি।'

গোবর্ধন সংশোধন করে দেয়—'উঁহু, পাঁচদিকে।'

সামনেই একটা কমলালেবুর খোসা পড়ে ছিল, হর্ষবর্ধন সেদিকে ভাইয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন—'এবার একটু রকমফের করা যাক। ঐটায় চেপে যাই খানিক!' বলে যেমন না 'খোসারোহণ' করতে যাবেন, অমনি তিনি চিৎপটাং। তৎক্ষণাৎ উঠে পড়ে হর্ষবর্ধন অপ্রতিভ হয়ে চারিদিকে তাকিয়ে গায়ের ধুলো ঝাড়তে থাকেন, যেন পড়েন নি এমনিভাবে পাশের একজনকে প্রশ্ন করেন—'জায়গাটার নাম কী মশাই?'

লোকটা খোট্টা, এককথায় জবাব দেয়—'ধরম্‌তল্লা—জানতা নেহি?'

'ধড়াম্‌তলা—তাই বল। না পড়ে কি উপায় আছে? ঠিক হয়েছে তবে।' হর্ষবর্ধনের সমঝ্‌দারি—'এখানে এলেই পড়তে হবে।'

গোবর্ধনের কৌতূহল হয়, দাদার সিদ্ধান্তের কারণ জানতে চায়।

'সবাই এখানে ধড়াম্ করে পড়ে যায়। তাই জায়গাটার নাম ধড়াম্‌তলা হয়েছে, বুঝছিস না? পড়তেই হবে যে এখানে!'

'আর কদ্দুর বাপু, তোমার জাম্বুবানের বাইশ্‌কোপ। হেঁটে হেঁটে পায়ের সুতো ছিঁড়ে গেল।' গোবর্ধন বিরক্তি প্রকাশ করে।

হর্ষবর্ধন বিষণ্ণভাবে ঘাড় নাড়েন—'আবার এদিকে খোসায় চাপাও তেমন নিরাপদ নয়।'

'ওখানে এত ভিড় কিসের দাদা ?'

'আরে, ওই যে রওনক্-মহল। দেখছিস না লেখা রয়েছে—ঐ যে সেই ছবিখানা রে! এখানে দেখছি আরো বড় সাইজের রঙচঙে একটা সেঁটেছে।'

গোবর্ধন এবার সাহসী হয়ে একজনকে জিজ্ঞেস করে বসে—'ওই ঘুল্‌ঘুলিটার কাছে এমন ভিড় কেন মশাই ?'

'এখুনি টিকিট কাটা শুরু হবে কিনা।'—লোকটা উত্তর দেয়।

'ক' টাকার টিকিট কাটবে ?' গোবর্ধন দাদাকে প্রশ্ন করে।

'একেবারে সবচেয়ে সামনের সীট, তা য-টাকাই লাগুক।'

হর্ষবর্ধন বিজ্ঞের মত মুখভঙ্গী করেন—'সেবার সনাতনখুড়ো কলকাতা থেকে দেশে ফিরল, তার কাছ থেকে সব আমার জানা। খুড়ো বলে কিনা ঠ্যাটরের সব আগের সীটের দাম সবচেয়ে বেশি—পাঁচ টাকা করে। "ঠ্যাটর" কী—বুঝেছিস ?'

'না তো।'

'ঠ্যাটর হচ্ছে থিয়েটার—বুঝলি। খুড়ো কী মুখ্যু ছাখ্। তবে, খুড়োরই বা দোষ দেব কী। ইংরিজি উচ্চারণ করা কি সোজা রে দাদা।'

গোবর্ধন আবার সেই লোকটিকে শুধায়—'মশাই, একেবারে সবসামনের টিকিট কোথায় দিচ্ছে ?'

লোকটি এবার বিরক্ত হয়—'দেখছেন না ?' ভিড়ের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে—'ঐ তো ফোর্থ ক্লাশের টিকিট ঘর।'

হর্ষবর্ধন দু'খানা দশ টাকার নোট বের করে নিয়ে ভাইয়ের হাতে মানিব্যাগ দেয়—'ধর্ এটা, টিকিট কেটে আনি। থিয়েটারের পাঁচ টাকা হলে বাইশকোপের না হয় দশ টাকাই হোক! তার

বেশি আর কী হবে? ভিড়ের মধ্যে সেঁধুই গে, উপায় কী? সব চাইতে দামি সীটের জন্যে সবচেয়ে বেশি ভিড় হবে জানা কথা।'

গোবরা বলে—'হুঁ, কলকাতার লোকের টাকার অভাব নেইতো।'

নোট দু'খানা দাঁতে চেপে দু' হাতে ভিড় ঠেলে হর্ষবর্ধন ভিড়ের ভেতর গিয়ে সেঁধোন। মুহূর্তপরেই টিকিট-ঘরের ঘুলঘুলি খুলে গেল—খোলামাত্রই তুমুল কাণ্ড। কথা নেই বার্তা নেই, জমাট জনতা সহসা বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের মত উত্তাল হয়ে উঠল—চারিদিকে যেন প্রলয় নাচন শুরু হয়ে গেল। হঠাৎ হর্ষবর্ধন দেখেন তাঁদের মাথার উপরে জন-দুই লোক সাঁতার কাটছে এবং তাদেরই একজন, ডুবন্ত লোক যেমন করে কুটোকে আশ্রয় করে তেমনি করে তাঁর চুলের মুঠি আঁকড়ে ধরেছে। গতিক সুবিধের নয় দেখে হর্ষবর্ধন নোট দু'খানা মুখের মধ্যে পুরলেন—কি জানি চুল ছেড়ে যদি নোট চেপে ধরে। সেই দারুণ ধস্তাধস্তির মধ্যে হর্ষবর্ধন একবার ডুব-সাঁতার দিতে চেষ্টা করলেন, দু'বার শূন্যে উঠলেন, তিনবার কাৎ হলেন, অবশেষে চারবার ঘূরপাক খেয়ে, নিজের বিনা চেষ্টায় ছিটকে বেরিয়ে এলেন; তখন তাঁর খেয়াল হল, নোট দু-খানা গোলমালে গিলে বসেছেন কখন।

'দেখেছিস গোবরা, আমার দশা! ফর্দাফাঁই! আরো দু'খানা নোট দে তো—ও দু'খানা হজম হয়ে গেছে।'

গোবরা পকেটে হাত দিয়ে অকস্মাৎ ভারী গম্ভীর হয়ে যায়, সেখানে ব্যাগের অস্তিত্ব টের পায় না। এই দুর্যোগে বা সুযোগে কে পকেট মেরে সরে পড়েছে। কিন্তু তার বিস্ময় তার বিক্ষোভকে ছাপিয়ে ওঠে—'একি, তোমার কাপড় কী হল দাদা—তোমার কাপড় গেল কোথায়?'

তাই তো! এ কার কাপড় পরে আছেন হর্ষবর্ধন? তাঁর ছিল

লাল-পেড়ে খোপ-দুরস্ত ধুতি—এ কার আধ-ময়লা ফুল-পাড় কাপড় পরে রয়েছন? ভিড়ের ভেতর কখন বদলে গেছে কে জানে।

'তবে আর টিকিট কেটে কাজ নেই দাদা। কাপড় বদলেছো এই ঢের, এর পর যদি ফের চেহারা পালটে যায়?'

ভাবনার কথা বটে। হর্ষবর্ধন বলেন—'তবে চল্ বাড়ি ফিরি। কী আর করব, বেশি খরচ করা গেল না আজ। সমস্ত দিনে আর কটা টাকাই বা ওড়াতে পেরেছি—এই কুড়ি ধরে—যেটা আমার গর্ভে গেল?' তাঁর কণ্ঠে দুঃখের সুর ধ্বনিত হয়।

বাড়ি ফিরে হর্ষবর্ধন চান—'দে তো আমার মনি ব্যাগটা।'

প্রসন্ন মুখে গোবর্ধন জবাব দেয়—'সেটা খোয়া গেছে দাদা, তবে আর-একটা কুড়িয়ে পেয়েছি, অনেক টাকা আছে তাতে।··· দেখছ যেমন পেট-মোটা ব্যাগ।···একি। ব্যাগের আবার হাত-পা কেন গো। কলকাতার হালচালই অদ্ভুত। হাত-পা-ওয়ালা মনিব্যাগ। কিন্তু এর মুখ খোলে না কেন দাদা? এই যে, হাঁ করেছে একটু-খানি···ওমা, এ যে দেখছি মোটর-চাপা-পড়া একটা কোলা ব্যাঙ।'

হর্ষবর্ধন অট্টহাস্য করতে থাকেন—'যাক, বেশ হয়েছে। পাঁচশো টাকা তবু খরচ করা গেল—নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোনো যাবে আজ।'

পরদিন সকাল আটটা বেজে গেল তবু দু' ভাইয়ের ঘুম ভাঙতে দেরি হচ্ছিল। অর্ধতন্দ্রায় হর্ষবর্ধন নানাবিধ সুখস্বপ্ন দেখছিলেন, যেমন—কেবলমাত্র কলার খোসায় চেপে পৃথিবী পরিভ্রমণ করা সম্ভব কি না, কিংবা যদি এমন হত—রেল লাইনের উপর দিয়ে ট্রেন না চলে যদি প্ল্যাটফর্মটাই চলতে শুরু করত তাহলে কী মজাই না হত! কেমন প্ল্যাটফর্মে চেপে, খোলা জায়গায় হাওয়া খেতে খেতে, পায়চারি করতে করতে দিল্লী-মক্কা যাওয়া যেত। ঠিক

এমনি সুখের সময় (মানুষের সুখ বিধাতার অসহ্য।) সহসা হর্ষবর্ধনের বোধ হল, তাঁর ভুঁড়ির ওপর কে যেন সুড়সুড়ি দিচ্ছে! চোখ খুললে পাছে স্বপ্নের আমেজ টুটে যায় সেই ভয়ে তিনি চোখ বুজেই ডাকলেন—'গোবরা, এই গোবরা!'

'উঁ!'

'দ্যাখ্‌তো আমার পেটে কী?'

চোখ না খুলেই গোবর্ধন জবাব দিল—'কী আবার?'

ইতিমধ্যে ভুঁড়ির বোঝাটিকে বেশ সচল এবং সক্রিয় বলে হর্ষবর্ধনের সন্দেহ হয়েছে। ব্যাপারটা কী? অ্যাঁ? নিতান্তই কি নিদ্রার মায়া ত্যাগ করে অকালে চোখ খুলতে হবে? কিংবা খবরের কাগজের বড় বড় হরফে যাদের বলে 'ভীষণ আকস্মিক দুর্ঘটনা!'—তেমনি ভয়াবহ কিছু তাঁরই উদরের উপরে এই মুহূর্তে ঘটে যাচ্ছে? তাঁর ভয় হচ্ছিল চোখ খুলতে।

'দ্যাখ্‌ না, নড়ছে যে রে!'

'পেটে নড়ছে? পিলে-টিলে হবে!' গোবর্ধনও চোখ খোলার কষ্ট করতে প্রস্তুত নয়। হর্ষবর্ধন ভাবলেন গোবরা ভুল বলে নি।

পিলেই হবে, নইলে পেটে আবার নড়বে কী! আসামের পিলে ডাকসাইটে পিলে, কলকাতায় এসে হাওয়া-বদল করে শহরের হালচাল দেখে আন্দোলন শুরু করে দিয়েছে—আশ্চর্য কিছু নয়! আকস্মিক ভুঁড়িকম্পের কারণ অবগত হয়ে হর্ষবর্ধন নিশ্চিন্ত হলেন, আবার তাঁর নাক ডাকতে শুরু করল। ভুঁড়িকম্পে চাপা পড়ার ভয় নেই তো, সে ভয় বরং পাশের লোকের কিছু পরিমাণে থাকলেও ভুঁড়ির যিনি মালিক তিনি একেবারে অকুতোভয়। সুতরাং হর্ষবর্ধন ভৌড়িক বিপর্যয়ে মাথা ঘামানো নিষ্প্রয়োজন বোধ করলেন। তাঁর নাক ডাকতে লাগল আবার।

বর্ধনেরা নিশ্চিন্ত হলেও পিলে নিশ্চিন্ত ছিল না; হঠাৎ গোবর্ধন

অনুভব করল কী যেন একটা লাফিয়ে পড়ল তার পেটের উপর। ভয়ে তার সারা শরীর কুঁকড়ে গেল, কিন্তু চোখ খুলতে সাহস হল না। দাদার পিলে তার পেটে লাফিয়ে আসবে, শারীরতত্ত্বের দিক দিয়ে সেটা কি সম্ভব? সে ভয়ানকভাবে ভাবতে শুরু করল।

ইতিমধ্যে একটা ক্ষীণ আর্তধ্বনি শোনা গেছে—মিঁয়াও!

পিলের ডাক! আওয়াজ শুনে গোবর্ধনের নিজের পেটের পিলে চমকে গেছে; সে ধড়মড় করে উঠে বসল—'এ যে বেড়াল, ও দাদা!' তার কণ্ঠে ও চোখে বিভীষিকা ফুটে উঠল, বেড়ালকে তার ভারি ভয়। হর্ষবর্ধন উঠে বেড়ালটাকে বিপর্যস্ত গোবর্ধনের উদর থেকে সলেজে হাতিয়ে সতেজে ঘরের কোণে নিক্ষেপ করলেন।—'বেড়াল? বেড়াল এল কোত্থেকে? কী বি—পদ!'

বেড়ালটা তৎক্ষণাৎ আবার লাফিয়ে বিছানায় এসে উঠল—তার সেই লাফটাকে একসঙ্গে হাই এবং লং-জাম্পের রেকর্ড বলা যেতে পারে। মার্জার মহাপ্রভুর সন্ত্রস্ত দৃষ্টি অনুসরণ করে দুই ভাই দেখলেন, ঘরের কোণে তিনটে কেঁদো কেঁদো ইঁদুর—নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগে তাঁদের রাত্রের ভুক্তাবশেষের সদ্ব্যবহার করছে। বিছানায় বসে তিন জনে সভয়ে সেই দৃশ্য নিরীক্ষণ করতে লাগলেন।

ভয়ের কথাই বটে। কাবুলে ইঁদুর হয় কি না জানা যায় নি, কিন্তু কাবুলি ইঁদুর বলে যদি কিছু থাকে এগুলি তাহলে তাই। গোবর্ধন সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। কাবুলি বেড়ালের সঙ্গে এরা কেমন ব্যবহার করে কে জানে, কিন্তু গো-বেচারা বাঙালী বেড়ালকে যে এরা আমলই দেয় না তা তো স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। মানুষদের এরা কেমন খাতির করবে তাও বলা যায় না, দুভাই ভারী ভাবিত হয়ে পড়েন।

গোবরা সাহস দেয়—'ভয় কী দাদা, ওরাও তিনজন, আমরাও তিনজনা আছি।'

হর্ষবর্ধন হতাশভাবে ঘাড় নাড়েন—'উঁহু! সম্মুখ-সমরে এই বেড়ালটা ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। দেখলি না? কী রকম পালাতে মজবুদ! কী রকম লাফখানা দিল—বাপ্? এক নম্বরের কাপুরুষ!'

'কাপুরুষ না বলে বরং কাবেড়াল বলো দাদা!' গোবরা তাঁকে শুধরে দেয়।

হর্ষবর্ধন বুক ফুলিয়ে বলেন—'যদি এক-একজন করে আসে আমি পরোয়া করি না ওদের। তা তো আসবে না, একসঙ্গে তাড়া করবে যে!'

তাহলে কী বিপজ্জনক ব্যাপারই না ঘটবে, ভেবে গোবর্ধন শিহরিত হয়। একসঙ্গে তিন-তিনটে কাবুলি ইঁদুরের আক্রমণ ঠেকানো কি সহজ কথা? এ যা ইঁদুর, বেড়াল দূরে থাক, এ রকম বাহন দেখলে বাবা গণেশকেও পালাতে হত। কার বাপু প্রাণের মায়া নেই? গোবরা বলে—'বুঝেছ দাদা, এ চীজ দেখলে গণেশ বাবাজীও পালাতেন, আমরা তো ছার!'

'হুঁ', হর্ষবর্ধন গম্ভীর হয়ে ওঠেন—'আমি ভাবছি যদি তাড়া করে তাহলে কী করব। কড়িকাঠ ধরেই ঝুলতে হবে দেখছি। পালাব কোথায়?'

'হ্যাঁ, দরজা তো ওরাই আগলে রয়েছে!' দুই ভাই কড়িকাঠ ধরে ঝুলছেন, বেড়ালটা দাদার কাছা আশ্রয় করে দোদুল্যমান, আর নিচের থেকে ইঁদুরদের ভয়ঙ্কর লম্ফ-ঝম্প—এই দৃশ্য কল্পনা করে গোবরার হাসি পেল।—'তাই তো, তাহলে তো ভারি মুস্কিল হোলো দাদা! তুমি কি ওই ভারি দেহ নিয়ে ঝুলতে পারবে?'

বেড়ালটাও কটাক্ষে হর্ষবর্ধনের বিপুল কলেবর একবার লক্ষ্য করল, তার মুখভাব দেখে মনে হল গোবর্ধনের মত সেও এ বিষয়ে সন্দেহবাদী। বেড়ালের সহানুভূতি হর্ষবর্ধনের মনকে স্পর্শ করে।

'যদি করেই তাড়া, আমি ভয় খাই নাকি?' হর্ষবর্ধন তাল ঠুকে

বেড়ালটার লেজ মুঠিয়ে ধরেন—'তাহলে এই বেড়ালটাকেই বাগিয়ে ধরব। বেড়ালে ইঁদুর মারে বলে শুনেছি—এই বেড়াল-পেটা করেই ইঁদুর ব্যাটাদের খতম করব তাহলে।'

বেড়ালটা হাতানো লেজের বিরুদ্ধে আপত্তি জানায়—'মিউ।'

অনাহূত ও অবাঞ্ছিত এই চতুষ্পদ ব্যক্তিটিকে গোবরারও ক্রমশ ভাল লাগছিল। ভাল লাগবারই কথা, আসন্ন বিপদের মুখে শত্রুর সঙ্গেও আত্মীয়তা হয়। ভীষণ বন্যাবর্তে মানুষ আর বাঘ একই খড়ের চাল আশ্রয় করে পাশাপাশি ভেসে চলেছে অনেক সময়ে এমনটা দেখা গেছে (দেখার চেয়ে শোনা যাওয়াই সম্ভব, কেননা সেই দারুণ বানের ধাক্কায় দাঁড়িয়ে দেখার লোক তখন বিরল)। যাই হোক, আসল কথা এই, বিপদে পড়লে বাঘের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়, সুতরাং একটা বেড়ালের সঙ্গে গোবরা ভাব জমিয়ে ফেলবে এ আর বেশি কথা কী?

সুতরাং সে দাদার প্রস্তাবের প্রতিবাদ করে—'তাহলে বেড়ালটাও যে সাবাড় হবে—কেষ্টর জীব!'

'হয়, হোক গে। কথায় বলে, যা শত্রু পরে পরে। ইঁদুরও যাক, বেড়ালও যাক—কেষ্টর জীবদের কেষ্টপ্রাপ্তি হোক। ওদের কাউকেই আমার চাই নে।'

'আচ্ছা, ইঁদুরগুলো যদি এখন বিছানায় লাফিয়ে আসে দাদা?'

'কেন, তা আসবে কেন? বিছানা কি ওদের খাদ্য?'

'হ্যাঁ, তুলো খায় শুনেছি। কিন্তু তা নয়, যদি বেড়ালটাকে তাড়া করে আসে?'

'অ্যাঁ, বলিস কী?' হর্ষবর্ধন সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেন, 'তা পারে তাড়া করতে,—যে-রকম মাঝে মাঝে তাকাচ্ছে বেড়ালটার দিকে। কী হবে তাহলে?' হর্ষবর্ধনের হৃৎকম্প হয়।

'তাই তো ভাবছি!'

'দে, ওকে ইঁদুরদের দিয়ে দে—পিকনিক করে ফেলুক ওর জন্যে কি আমরাও প্রাণে মরব নাকি শেষটায় ?'

কিন্তু বেড়ালটা বোধ করি ওদের ষড়যন্ত্র টের পেয়েছিল, এমন ভাবে গদিতে নখ এঁটে বসল যে টেনে তোলে কার সাধ্য ? বেড়ালের সঙ্গে টাগ্ অব্ ওয়ারের প্রাণান্ত পরিশ্রমে দুই ভাই যখন ঘেমে নেয়ে অস্থির, ইঁদুর তিনটে তখন প্রাতরাশ শেষ করে নিঃশব্দে প্রস্থান করেছে। বাহুযুদ্ধে ব্যস্ত থাকায় তিন জনের কেউই এদিকে দৃক্‌পাত করেন নি। প্রথম বেড়ালের নজরে পড়তেই সে ঘাড় ফুলিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল, এতক্ষণ পরে গলা পরিষ্কার করে উঁচু খাদের ডাক ছাড়ল—'ম্যাঁও !'

পরমুহূর্তেই সে বর্ধনদের বাহুপাশ থেকে নিজেকে মুক্ত করে বিছানা থেকে নেমে গেল, দরজা পর্যন্ত একবার টহল দিয়ে এসে এদিক ওদিক তাকিয়ে আর দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করে ইঁদুরদের উচ্ছিষ্টে মনোনিবেশ করল।

বেড়ালের স্বরের তারতম্য থেকেই হর্ষবর্ধন ঘরের পরিবর্তন আবিষ্কার করতে পারলেন। স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে বললেন—'বাঁচা গেল, বাপ্! ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল! ইঁদুরে বেড়াল তাড়ায় এই কলকাতায় এসেই দেখলাম ভাই। এখানকার হালচাল অদ্ভুত !'

'শহুরে ইঁদুর দাদা! যে রকম ভাবভঙ্গী দেখলাম, মানুষেরই তোয়াক্কা রাখে না, তো বেড়াল! আমার তো বুক কাঁপছিল এতক্ষণ !'

'কিন্তু'—খানিকক্ষণ নিঃশব্দে কেটে যায়।

'হুঁ।' গোবর্ধন কী যেন ভাবতে থাকে।

'তুই কী ভাবছিলিস্ ?'

'ভাবছি বেড়ালটা যে শহুরে ইঁদুর দেখে ঘাবড়েছিল হয়ত তার একটা কারণ আছে। ইঁদুর ছাড়াও অন্য একটা কারণ।'

'অন্য কারণ আবার কী! আমাদের কর্মচারী কী লিখেছিল? মনে নেই? কলকাতার হালচালই এইরকম। মেশামেশির পক্ষপাতী নয় এরা। এমনকি, এই বেড়ালেরাও।'

'উঁহু, তা নয়; পিলেগের নাম শুনছো তো?'

'শুনেছি, কী তাতে?'

'শহর জায়গায় ভারি হয়।' গোবর্ধনের চালটা মুরুব্বিয়ানা হয়ে ওঠে—'ব্যায়রামটার নাম পিলেগ কেন জান? পিলে থেকে লেগ পর্যন্ত ফুলে ফেঁপে ওঠে তাই পিলেগ। লেগ কী জান তো?'

হর্ষবর্ধন দাবড়ি দেন—'যা-যাঃ, তোকে আর বিদ্যে ফলাতে হবে না! তোর মাথা!'

'উঁহু, লেগ মানে মাথা নয়, ঠিক তার উলটো। যাকে বলে গিয়ে পা।'

'জানি জানি, তোকে আর বলতে হবে না! ফীট মানেও পা হয়—আবার যে ফীট দিয়ে আমরা কাঠ মাপি, সে হল গিয়ে আর-এক ফীট।'

'আবার অজ্ঞান হয়ে গেলেও ফীট হয়, সে আরেক ফীট্! তাতে কিন্তু লেগ হয় না—লেগে আর ফীটে এইখানেই তফাৎ।'

হর্ষবর্ধন চটে চান—'বুঝেছি রে বুঝেছি। এখন পিলেগের কথা বল্।'

'শহরের ইঁদুর, বুঝেছ, কামড়ালেই পিলেগ। বেড়ালটা কেন ঘাবড়াচ্ছিল, বুঝলে এখন? ইঁদুরের ভয়ে নয়, ঐ পিলেগের ভয়ে।'

'অ্যাঁ, বলিস কী রে?' হর্ষবর্ধন চমকে ওঠেন এবার।

'শহুরে বেড়াল, কত ডাক্তারের বাড়ি ওর যাতায়াত—কত ডাক্তারি কথাবার্তা শোনে, রোগ-ব্যায়রামের ব্যাপার সব ওদের জানা, তাই ও সাবধান, বুঝেছ দাদা, সাবধানের বিনাশ নেই কিনা!'

'তুই ঠিক বলেছিস।' হর্ষবধন সোজা হয়ে বসেন। 'আজ

কিংবা কালই এ বাড়ি আমাদের ছাড়তে হবে। যা ইঁদুরের উপদ্রব এখানে—কখন কামড়ে দেয় কে জানে! কামড়ে দিলেই হল!'

'ব্যস, তাহলেই পিলে থেকে লেগ পর্যন্ত—'

'—আগাগোড়া পিলেগ!' হর্ষবর্ধন বাক্যটা সম্পূর্ণ করে মুখখানা প্যাঁচার মত বানিয়ে তোলেন। গোবর্ধনও দাদার মুখের দ্বিতীয় সংস্করণ হয়ে বসে।

বসে থাকতে থাকতে দুই ভাই অকস্মাৎ উৎপর্ণ হয়ে উঠলেন, তাঁদেরই বাড়ির দুয়ারে খঞ্জনী বাজিয়ে কে সঙ্কীর্তন শুরু করেছে।

হর্ষবর্ধন অভিভূত হয়ে গেলেন, বললেন, 'আহা, কে হরিগুণ গান করে! গোবরা, ডেকে আন উপরে, কোন মহাপুরুষ-টহাপুরুষ হবে!'

নিচের থেকে গোবারার গলা শোনা যায়—'কোন মহাপুরুয় নয় দাদা, একেবারেই টহাপুরুষ।'

'তুই ডেকে নিয়ে আয়।'

খঞ্জনীধারীকে নিয়ে গোবর্ধন ঘরে ঢোকে। একজন খোঁড়া ভিখারী—সিঁড়ি ভেঙে উপরে আসতে অনেক কষ্ট অনেক কসরৎ করতে হয়েছে তাকে। খোঁড়া দেখে হর্ষবর্ধনের দয়া হয়, তিনি সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেন—'ভগবান তোমাকে খোঁড়া করেছেন সেজন্যে দুঃখ ক'রো না ভাই, এ তাঁর দয়া। এ জন্মে আমাদের মত পাপী-তাপীকে হরিনাম শুনিয়ে পুণ্য অর্জন করছ, পরজন্মে তাঁর দয়ায়—'

গোবরা কথাটা পূরণ করে—'তুমি ফুটবল-খেলোয়াড় হবে।'

ভিখারীর মুখ বিকৃত হয়—'আর যা বলেন বাবু, তেনার দয়ার কথা কইবেন নি, তেনার দয়াতেই মরে আছি! ভয় হয়, এ জন্মের ক্ষেতি সারতে পরজন্মে না চার-পেয়ে করে পাঠান আমায়!'

লোকটার বিধাতার কৃপায় অরুচি দেখে হর্ষবর্ধন ক্ষুব্ধ হন—'তুমি বোধহয় পদ্যপাঠ পড় নি, সেই পদ্যটা—'একদা ছিল না জুতা চরণ-যুগলে, একদা ছিল না জুতা—তার পরে কী রে গোবরা?'

গোবরার ধারণা হয়, দাদা ওকে ধাঁধা পূরণ করতে বলছেন; তাই অনেক ভেবে সে লাইনটা মিলিয়ে দেয়—'মোজা পরে চলিয়া গেলাম কর্মস্থলে।'

হর্ষবর্ধন বিরক্ত—'উঁহু, উঁহু! মনে আসছে না পদ্যটা—সেই কবে বাল্যকালে পড়েছি। যাই হোক, তার মোদ্দা কথাটা হচ্ছে এই, একজন লোকের একদিন পায়ে জুতো ছিল না বলে সে সেই রাগে ভগবানকে গাল পাড়ছিল, হঠাৎ দেখল আর একজনের একটা পা-ই নেই; তার তো কেবল জুতোই নেই, আর-একজনের জুতো থাকার প্রয়োজনই নেই মোটে! তখন তার দুঃখ দূর হল।'

গোবরা যোগ করে—'আর যে লোকটার পা ছিল না সে-ও অন্য লোকটার জুতো নেই দেখে অনেকটা আরাম পেল। দু'জনেই ভগবানের অপার মহিমা স্মরণ ক'রে তাঁকে ধন্যবাদ দিতে লাগল।'

ভিখারীটা এই উচ্চাঙ্গের তত্ত্বকথা কতটা হৃদয়ঙ্গম করল সে-ই জানে, কিন্তু সে-ও জোরের সঙ্গে সায় দিল—'দেবেই তো!'

তাঁর শিক্ষার ফল ধরছে দেখে হর্ষবর্ধন পুলকিত হন—'তবেই বোঝ। খোঁড়া হওয়া খুবই দুঃখের তাতে ভুল নেই, কিন্তু ভাই, কানা হ'লে আরও কত কষ্ট! ভগবান যে তোমাকে—'

ভিখারী বাধা দেয়—'যা বলেছেন বাবু, আগে যখন কানা ছিলাম তখন লোকে আমাকে কেবল অচল পয়সা চালাত। বাধ্য হয়ে আমায় খোঁড়া হতে হল—কী করি? ভারি ঠকায় লোকে।'

হর্ষবর্ধন দারুণ বিস্মিত হন—'বল কী? তুমি আগে অন্ধ ছিলে নাকি?'

'ছিলামই তো!'

'তা, চোখ পেলে কী করে ?' গোবরাও দারুণ বিস্মিত।

ভিখারী আমতা আমতা করতে থাকে—'ভগবানের কেরপা ! তা ছাড়া আর কী বলব !'

'তাই বল !' গোবরা আশ্বস্ত হয়। হর্ষবর্ধন বলেন—'সেই কথাই তো বলছিলাম হে ! ভগবানের দয়ায় হয় না কী ?'

ভিখারী তাগাদা লাগায়—'পয়সা দিন বাবু, যাই। অনেক বাড়ি ঘুরতে হবে, বেলা হল।'

'আমাদের কাছে তো পয়সা নেই, নোট আছে। গোবরা—' বলা-মাত্র গোবর্ধন একখানা দশ টাকার নোট বের করে দেয়।

ভিখারী তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে একবার দেখে নেয়—'ওঃ, দশ টাকার নোট ! তা আপনারা দু'জনে দুটো পয়সা দেবেন তো বাবু ? আমি ন' টাকা সাড়ে পনের আনা ফেরৎ দিচ্ছি—' বলে ঝুলি ঝেড়ে রাশীকৃত পয়সা গুনতে শুরু করে।

'উঁহুঁহুঁ—হর্ষবর্ধন বাধা দেন—'তুমি গোটা নোটখানাই নাও। ওর চেন্জ্ দিতে হবে না ; আমরা খরচ করতেই শহরে এসেছি।'

ভিখারীর চোখদুটো ডাগর হয়ে ওঠে, সে অবাক হয়ে যায় ; কিছুক্ষণ ধরে সন্দেহের দৃষ্টিতে নোটখানাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে থাকে, আসল কি জাল আবিষ্কারের চেষ্টা করে। অবশেষে তার সাহস হয়—'বাবু, আপনি কি পুলিসের টিকটিকি ?'

হর্ষবর্ধন স্তম্ভিত হন—'গোবরা, এ বলে কী রে ? আমি টিকটিকি! কলকাতায় এসে কি টিকটিকির মত চেহারা হল নাকি ? আয়নাখানা আন্ তো দেখি !'

গোবরা আয়না আনতে পাশের ঘরে দৌড়ায়। বাবুর ভাবান্তর দেখে, পাছে নোটখানা কেড়ে নেয় সেই ভয়ে ভিখারীও এই অবসরে আস্তে আস্তে সরে পড়ে।

হর্ষবর্ধন আপন মনে বলতে থাকেন—'বৌ বলেছিল বটে, যেয়ো

না কলকাতায়, চামচিকের মতন চেহারা হবে। তা, চামচিকে না হয়ে টিকটিকি হলাম! আশ্চর্য!'

আয়না দেখে হর্ষবর্ধনের ধড়ে প্রাণ আসে—'নাঃ, এখনও অদ্দুর গড়াই নি।' গোবর্ধন দাদাকে ভরসা দেয়, দাদার মুখে আবার হাসি খেলে—'যা ভয় পাইয়ে দিয়েছিল ভিখিরিটা। লোকটা কানা ছিল কি, এখনও সেই কানাই আছে!'

গোবর্ধনও সে বিষয়ে একমত হয়—'হ্যাঁ, এখনও চোখ সারে নি ভালো মতন। তা নইলে তোমার মত লম্বা-চওড়া ভুঁড়িদার লোকটাকে বলে কিনা টিকটিকি! ছ্যাঃ!' ভিখারীর উপর তাবৎ শ্রদ্ধা তার লোপ পায়।

'কিন্তু দেখেছিস, ভিখিরি হলে কী হবে, লোকটার অগাধ পয়সা! সঙ্গে সঙ্গে দশ টাকার চেঞ্জ! কলকাতার ভিখিরিরাও কী বড়মানুষ! আসামের অনেক ধনীকেই কিনতে পারে হয়ত।'

'যা বলেছ দাদা! হাতে-হাতে ন' টাকা সাড়ে পনের আনা নগদ, চাই-কি নিরেনব্বই টাকা সাড়ে পনের আনাও বের করতে পারত হয়ত!'

'তাহলে একখানা একশো টাকার নোটই ভাঙিয়ে নিলি নে কেন? খুচরো টাকা-কড়ির কখন কি দরকার হয় বলা যায় না তো!'

'আর কী দেখলাম জান দাদা? অদ্ভুত ব্যাপার!'

'কী—কী?' হর্ষবর্ধন উৎসুক হন।

'লোকটা আসবার সময় খোঁড়াতে খোঁড়াতে এল, যাবার সময় কিন্তু সিঁড়ি টপকে তর-তর করে নেমে গেল। ভারি আশ্চর্য কিন্তু!'

হর্ষবর্ধন বিন্দুমাত্র বিচলিত হন না—'আশ্চর্য আর কি, এ কি আমাদের আসাম? এ হল গিয়ে শহর কলকাতা। এখানকার হালচালই আলাদা!'

তিনি আয়নার মধ্যে আপনাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন। —'নাঃ, টিকটিকি হবার কোনো দুর্লক্ষণ নেই!'

সাজ-সজ্জা করে দুই ভাই নগর-ভ্রমণের জন্যে বার হন। ফুটপাথের ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে গোবর্ধন হতাশ হয়ে ওঠে—'কই দাদা, তুমি যে বলেছিলে আজ সকালে তিনতালা মোটর বেরুবে? কই এখনও বেরুলো না তো?'

'বেরুবে বই কি, সবুর কর! না বেরিরে যাবে কোথায়? বেরুতেই হবে। তিনতালাও বেরুবে, চারতালাও বেরুবে—তবে, পাঁচতালার কথা বলতে পারি না।'

'পাঁচতালা মোটর বোধহয় নেই দাদা।'

'কলকাতায় কী আছে আর কী নেই কিছুই বলা যায় না। সনাতনখুড়ো এই কথা বলে, বুঝলি?'

'ধুত্তোর তোমার সনাতনখুড়ো!'

'আরে, এত অধীর হচ্ছিস কেন? যদি তিনতালা মোটর এ-বেলা না-ই বেরোয়, দোতালার ছাদে দাঁড়িয়ে যাব না-হয়—সেও তো তিনতালাই হবে।'

'পড়ে যাই যদি?'

'ধুর, পড়বো, কেন? আমি কখনও পড়ি? তবে ধড়ামৃতলার কথা বলা যায় না। সেখানটায় একটু সাবধান হতে হবে, জায়গাটা বড় খারাপ। আর পড়বই বা কেন? মাথার ওপর দিয়ে ববাবর তার চলে গেছে দেখছিস না?'

'দেখছি তো!'

'কেন বল্ দেখি? ধরবার জন্যে। পড়বার মুখেই তার ধরে ফেলবি, ব্যস।'

সত্যিই তো, যতদূর দৃষ্টি যায়—গোবর্ধন চোখ চালিয়ে দেখে—রাস্তার মাঝখান দিয়ে বরাবর তারের লাইন চলে গেছে আর তারই নিচে দিয়ে অতিকায় মোটরগুলো ভীষণ শব্দে দৌড়োদৌড়ি করছে। সে মনে মনে দাদার বুদ্ধির তারিফ করতে থাকে, যথার্থই তার মত দাদা কারো হয় না। সারা দুনিয়ায় দুর্লভ। 'তবে চল দাদা, একটা মোটরের ছাদে উঠে পড়া যাক। ছাদে যাবার সিঁড়িও আছে দেখা যাচ্ছে যেন। থামাব একটাকে?'

'একটু দাঁড়া।' পাশের দোকানের দিকে হর্ষবর্ধনের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়—'দোকানটা এ-রকম দাঁত বের করে রয়েছে কেন রে? দেখা যাক তো!'

উভয়ে দাঁত-বের-করা দোকানের দিকে অগ্রসর হন। বাবা, দাঁতের কী বাহার! দেখলে পিলে চমকায়! 'এটা কিসের দোকান হ্যা?'

একজন সাহেবি-পোশাক-পরা ভদ্রলোক বেরিয়ে এসে হর্ষবর্ধনের কথার জবাব দেন—'আমরা দাঁত তুলি, দাঁত বাঁধাই। আমিই ডেন্টিস্ট।'

'গোবরা তোর পোকা-খাওয়া দাঁতটা তোলাবি?'

'তা তোলালে হয়, পোকারা খেয়ে শেষ করতে কদ্দিন লাগাবে কে জানে? ওদের ওপর বরাত দিয়ে তো বসে থাকা যায় না!'

'হ্যাঁ, তুলেই ফ্যাল্। পরের ওপর নির্ভর করা ভাল নয়। তা, কতক্ষণ লাগবে একটা দাঁত তুলতে?'

ডেন্টিস্ট বলেন—'কতক্ষণ আর? এক মিনিট; আপনি টেরও পাবেন না।'

'কত মজুরি?'

'মজুরি কী মশাই, ফিস বলুন।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই এক এথাই—চেঁচিয়েই বলি আর ফিস-ফিস করেই বলি। মানে, দিতে হবে কত ?'

'দশ টাকা আমাদের চার্জ।'

'বলেন কী মশাই! এক মিনিটের কাজের জন্যে দ—শ টাকা! আপনি কি ডাকাত ? চলে আয় গোবরা, আমাদের পাড়াগেঁয়ে পেয়ে ঠকাচ্ছেন ভদ্রলোক, চলে আয়, আর দাঁত তুলিয়ে কাজ নেই তোর।'

গোবরাও অবাক হয়—'সত্যিই তো! মিনিটে মিনিটে দশ-দশ টাকা রোজগার, তাও আবার পরের দাঁত তুলে! শহুরে ঠক দাদা, পালাই চল এখান থেকে! আধ ঘণ্টা কাঠ চিরলে একখানা তক্তা হয়, তার মজুরি আট আনাও না ; আর এদিকে এক মিনিটে দশ টাকা—তাও আবার গোটা দাঁত নয়, আধখানা দাঁত।'

হর্ষবর্ধন ভারী রুষ্ট হন—'আমরা বেড়াতে এসেছি, খরচ করতেই এসেছি তাতে ভুল নেই, কিন্তু ঠকতে আমরা রাজি নই। হ্যাঁ, যদি ন্যায্য হয় দুশো টাকা নাও দিচ্ছি, কিন্তু ঠকিয়ে কেউ এক পয়সাও নিতে পারবে না আমাদের কাছ থেকে—হুম্!'

মেজাজ আর ধরন-ধারনেই দাঁতের ডাক্তার টেরে পেয়ে গেছলেন যে খদ্দের কেবল দাঁতালোই না, শাঁসালোও বটে। এমন মক্কেল হাত-ছাড়া করা ঠিক নয় ; তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। যদি একটা দাঁতের জন্যে দশ টাকা খরচ করতে নারাজ হয়, না হয় দশটা দাঁতই তুলিয়ে নিক না! তাঁর আপত্তি কি ? কেননা তাঁর পক্ষে তো দশ মিনিটের মামলা! তাহ'লেই তো আর কারো কোনো ঠকা হবে না!

নিতান্ত চলে যায় দেখে তিনি একবার শেষ চেষ্টা করলেন—'দশ টাকায় একটা দাঁত তোলানো যদি লোকসান মনে করেন, না-হয় দু'জনের দাঁত তুলে দিচ্ছি ঐ এক চার্জে।'

হর্ষবর্ধনকে দলের পাণ্ডা বিবেচনা করে ডেন্টিস্ট তাঁকেই হাত করার মতলব করলেন—'দেখুন, বাজার মন্দা, কনপিটিশন খুব কীন, সবই জানি, কিন্তু আমাদের রেট তো কমাতে পারি নে! বরং আপনার একটা দাঁত না-হয় অমনি তুলে দিতে রাজি আছি। এর চেয়ে আর কী কনসেশন আশা করেন বলুন?'

হর্ষবর্ধন অবাক হন—'একেবারে অমনি?'

'একেবারে।'

'পোকায় না খেলেও?'

'ক্ষতি কী?'

হর্ষবর্ধন কিন্তু আপ্যায়িত হন না। 'মশাই, আমরা কলকাতায় এসেছি, টাকা খরচ করব এ কথাও সত্যি; কিন্তু তাই বলে যে অকারণে দাঁত খর্চা করে যাব এ দুরাশা আপনি মনেও স্থান দেবেন না। অমনি হলেও না।'

গোবরা বলে—'হ্যাঁ, টাকা আমাদের অঢেল হতে পারে, কিন্তু দাঁত আমাদের মুষ্টিমেয়। বাজে খরচ করবার মত দাঁত নেই আমাদের।'

হর্ষবর্ধন উষ্ণ হয়ে ওঠেন—'আমাদের পাড়াগেঁয়ে দেখে আপনি হয়ত ভেবেছেন যে একটা দাঁও। কিন্তু ভুল ধারণা মশাই আপনার, যত বোকা আমাদের দেখায় তত বোকা আমরা নই। আমরাও ব্যবসা করি—কিন্তু দাঁতের নয়, কাঠের।'

গোবরা সানাইয়ের কাজ করে—'হ্যাঁ, ব্যবসা করেই খাই আমরা, কিন্তু গলায় ছুরি বসাই না।'

এতক্ষণে ডেন্টিস্ট কথা বলার ফুরসৎ পান—'আমিও না। ছুরি নয়—সাঁড়াশি বসানোই আমার কাজ, তাও গলায় নয়, দাঁতে।' তিনি গোবর্ধনকে সংশোধন করেন।

হর্ষবর্ধন চটে যান—'তা, সাঁড়াশিই বসান আর খুন্তিই বসান

কিংবা হাতাই বসান, এক মিনিটের কাজের মজুরি যে দশ টাকা দিয়ে ফেলব, এত ছেলেমানুষ পান নি আমাদের।'

গোবরা দাদার কথায় সায় দেয়—'আর হাতুড়িই বসান।'

ডেন্টিস্ট যেন এতক্ষণে আলো দেখতে পান—'ও, এই কথা। এক মিনিটের কাজে দশ টাকা দিতে আপনাদের আপত্তি? তা, না-হয় এক ঘণ্টা ধরে আস্তে আস্তে দাঁতটা তুলে দিচ্ছি—তাহলে তো হবে?' তাঁর প্রাণে আশার সঞ্চার হয়।

এবার হর্ষবর্ধন খুশি হয়ে ওঠেন; 'হ্যাঁ, তাহলে আপত্তি নেই। উচিত খাটুনির উচিত দাম নেবেন, এতে নারাজ হবে কে? কী বলিস গোবরা?'

গোবরাও উৎসাহিত হয়—'দু-ঘণ্টা ধরে তুলুন—কুড়ি টাকা নিন—উচিত মজুরি দিতে আমরা পেছোব না। কিন্তু এক মিনিটে—জানতেও পেলাম না, বুঝতেও পেলাম না—এ কী কথা।'

ডেন্টিস্ট গোবরাকে নির্দেশ দেন—'নিন, বসে পড়ুন তাহলে ঐ চেয়ারটায়। আপনাদের অভিরুচিটা স্পষ্ট করে বললেই পারতেন প্রথমে, এত বকাবকি হত না! দেখে নেবেন আপনি, এমনভাবে এত আস্তে একটু একটু করে তুলব যে আপনি তো টের পাবেনই, পাড়াশুদ্ধ লোক টের পাবে যে হ্যাঁ, একটা দাঁত তুলছে বটে।'

গোবর্ধনের ভারি আনন্দ হয়—'হুঁ, যেন পোকারাও টের পায়! ভারি বজ্জাত ব্যাটারা; এমন যন্ত্রণা দেয় আমাকে!' সে জিঘাংসা-পরবশ হয়।

হর্ষবর্ধনের হাসি ধরে না—'এই তো চাই। দাঁত তোলা হবে, কাক-চিল জানতে পাবে না—সে কী কথা। পাড়াশুদ্ধ সবাই জানুক যে হ্যাঁ, একটা মানুষের মত মানুষের দাঁতের মত দাঁত তোলা হচ্ছে। নইলে দাঁত তুলে লাভ কী? ক্যা ফায়দা? কথায় বলে, হাতিকা বাৎ, মরদকা দাঁত।'

ডেন্টিস্ট বাধা দেন—'উঁহু, ভুল হল কথাটা। মরদকা বাৎ হাতিকা—'

হর্ষবর্ধন অসহিষ্ণু হন—'হুঁইই হয় মশাই। হাতিকা বাৎ তো শোনেন নি। কী করে শুনবেন, থাকেন কলকাতায়। আমরা আসামের জঙ্গলে থাকি, দিনরাত শুনতে পাই।'

'যা বাত ঝাড়ে একেকখান মাঝে সাঝে,' গোবরাও যোগ দেয় দাদার কথায়—'বাত নয় তো ঝঞ্ঝাবাত।'

ডেন্টিস্টের চোখ কপালে ওঠে—'কেন, সেখানে কি হাতির দাঁত হয় না?'

'হয় না তা কি বলেছি?' হর্ষবর্ধন ব্যাখ্যা করে দেন, 'কথাটার মানে হল এই যে, হাতির আওয়াজ যেমন জোরালো তেমনি জোর হবে পুরুষের দাঁতের। যাকে কামড়াবে তার আর রক্ষা নেই। সেই যে শক্ত ব্যামো—জল দেখলে ঘাবড়ায়—তাতেই খতম; নির্ঘাৎ। কী ব্যামো রে গোবরা?'

গোবরা মাথা চুলকোতে থাকে—'কি হাইডো না ফাইডো—'

'হ্যাঁ, ফাইড্রো-হোবিয়া। ইংরিজি কথা মনে রাখা কি সোজা রে দাদা।' হর্ষবর্ধন আরো বিশদ হন, 'বুঝলেন মশাই, দাঁতই হল গে মানুষের প্রধান অস্ত্র। প্রথমে দাঁত, তার পরেই হাত।'

গোবরা নিজের গবেষণা যোগ করে—'ও দুটো কাজে না লাগলে তারপরেই পা—পালাবার জন্যে।'

বক্তৃতায় বাধা দেওয়ার জন্যে হর্ষবর্ধন ভাইয়ের উপর গরম হয়ে ওঠেন—'তা ব'লে পা তোমার অস্ত্র নয়। বরং বাহন বলতে পার, পা-ই বহন করে—পায়ে চেপেই তো আমাদের যাতায়াত।'

পাছে দু' ভাই দোকানের মধ্যেই নিজেদের অস্ত্রবলের পরিচয় দিতে শুরু করে দেন সেই ভয়ে ডেন্টিস্ট তাঁর মক্কেলের মনোযোগ

আকর্ষণের চেষ্টা করেন—'বসে পড়ুন চেয়ারটায়। আবার তো অনেকক্ষণ লাগবে দাঁতটা তুলতে।'

গোবরা বলে—'এখন কী করে হবে? এখন তো একঘণ্টা ছেড়ে এক মিনিট সময় নেই আমাদের। শহর দেখতে বেরুচ্ছি এখন, সন্ধ্যার পরে হবে। কী বল দাদা?'

'সেই ভাল। এর ভেতর তুই বরং কাবুলি ইঁদুরের গর্তটা খুঁজে রাখিস। দাঁতটা সেই গর্তে দিলে কাবুলি দাঁত পাবি।'

'কী হবে দিয়ে? আর কি দাঁত উঠবে আমার? এ তো তোমার দুধে-দাঁত নয়।' গোবরার সংশয়।

'এ জন্মে না ওঠে পরজন্মে তো উঠবে? আরে, কর্মফল যাবে কোথায়।'

'তাহ'লে তো কাবুলি হয়ে জন্মাতে হয় দাদা!'

'যদি হয় তো হবে। তোর বুলি শুনিয়ে লোককে কাবু করে দিবি—মন্দ কী।' ভবিষ্যতের কল্পনায় গোবর্ধন মুহ্যমান হয় কি না হয় বোঝা যায় না ঠিক।

ভাইকে করতলগত করে হর্ষবর্ধন অগ্রসর হন। 'আচ্ছা আসি তাহলে ডেন্টিস্ট মশায়। কী দাঁত-ভাঙা নাম মশায় আপনার। কোনো সাহেবে রেখেছিল বুঝি? যেন ইংরিজি ইংরিজি মনে হচ্ছে।'

'হুঁ, যা বলেছ দাদা। ডেনটিশ মেনটিশ কখনও বাঙালীর নাম হয়? পারবেন মশাই, পারবেন—আপনিই পারবেন দাঁত তুলতে। আপনাকে উচ্চারণ করতেই দাঁত উঠে আসে—সাঁড়াশির দরকার হয় না। ডেনটিশ—বাব্বাঃ। কী নাম রে দাদা।'

অতিথিরা অন্তর্হিত হলে ডেন্টিস্ট দু-বার কাঁধের ঝাঁকি দেন—'কোথাকার আমদানি কে জানে। বাহনের সাহায্য যখন নিয়েছে, আর ফিরবে বলে বোধ হয় না। না ফিরুক, যা চমৎকার আইডিয়া একখানা দিয়ে গেছে তারই দাম দশ টাকা।'

এক ঘণ্টা পরে তাঁর দরজার ওপরে নতুন একটা সাইনবোর্ড ঝুলতে দেখা যায় :

'দাঁতই হল মানুষের প্রধান অস্ত্র।
নিরস্ত্র লোককে সশস্ত্র করাই আমাদের কাজ।
আমরা দাঁত বাঁধাই।'

ততক্ষণে দুভাই তিনতালা মোটরের অপেক্ষায় ফুটপাথের ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হয়রান হয়ে পড়েছেন। অবশেষে হর্ষবর্ধন হতাশ হয়ে বলেন—'নাঃ, আর আশা নেই। বেশিতালার মোটর সব ভাড়া হয়ে গেছে আজ। তার চেয়ে এক কাজ করি, ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করা যাক। সেটাও তো একটা চাপবার জিনিস।'

গোবরার মোটরে চাপা শখ, তার তেমন উৎসাহ হয় না—'দূর! ঘোড়ার গাড়িতে আবার মানুষ চাপে।'

হর্ষবর্ধন উত্তেজিত হন—'কেন চাপবে না? ঘোড়ায় চাপে, তো ঘোড়ার গাড়ি। তোর যে কেন এত মোটরের ঝোঁক—আমি বুঝি না। আমার তো নিত্যি নতুন জিনিস চাপতে ইচ্ছে করে। ঘোড়ার গাড়ি কি গাড়ি নয়? আমি ডাকছি ঐ গাড়িটাকে—এই কচুয়ান, কচুয়ান!'

ক্যোচম্যান গাড়ি এনে খাড়া করে। 'কোথায় যেতে হবে বাবু?'

গোবর্ধন অসন্তোষ প্রকাশ করে—'গাড়ি তো নয়, চার চাকার পিঁজরে একখানা।'

হর্ষবর্ধন ততক্ষণে ক্যোচম্যানের কেশবিন্যাস দেখে আত্মহারা—'বাঃ, তোমার খাসা চুল তো হে। কোন্ নাপিতের কাছে ছেঁটেছ?'

'নাপিত নয়, সেলুনের ছাঁট।'

'চালই তো কলে ছাঁটে জানি, আজকাল চুলও কলে ছাঁটছে?

কালে কালে হল কী! তা, কোথায় কিনতে মেলে এই সেলুন-কল? একটা দেশে নিয়ে যাব তাহলে।'

'কোন কল না বাবু, সেলুন হচ্ছে চুল ছাঁটার দোকান।'

'দোকানে চুল ছেঁটে দেয়? কলকাতার হালচালই অদ্ভুত! তা বাপু, তুমি সেই দোকানে নিয়ে চল আমাদের। আমরা তোমার মত করে চুল ছাঁটব। ভাড়া বল, বকশিস বল, দশ টাকা দেব তোমাকে। দে তো গোবরা, একখানা নোট ওকে। নাও, আগাম নাও।' গাড়িতে চেপে হর্ষবর্ধনের স্ফূর্তি হয়, 'ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করেছিলাম বলেই তো চুল ছাঁটার দোকান জানলাম। কখন কিসে কার থেকে কী উপকার হয় কেউ বলতে পারে? কলকাতার মত চুল ছাঁটলে পাড়াগেঁয়ে বলে কারু সন্দেহও হবে না, কেউ আমাদের ঠকাতেও সাহস করবে না আর।'

গোবর্ধন গুম্ হয়ে থাকে।

'তা ছাড়া কলকাতায় এলাম, তার একটা চিহ্ন তো নিয়ে যেতে হবে, আমাদের মাথা দেখে তবু এখানকার হালচালের কিছুটা আন্দাজ পাবে দেশের লোক। তারা কত অবাক হবে ভাব তো!'

তবুও গোবর্ধন সাড়া দেয় না।

'সারা কলকাতা তো মাথায় করে নিয়ে যেতে পারি না, তাই মাথাটাই না হয় কলকাতার মত করে নিয়ে যাই।'

গোবর্ধন এবার জবাব দেয়—'কে যেন গোটা গন্ধমাদনই মাথায় করে নিয়ে গেছল না?'

হর্ষবর্ধন কি-একটা জবাব দিতে যান, কিন্তু বাধা পড়ে; ক্যোচ-ম্যান গাড়ির দরজা খুলে ডাকে—'নামুন বাবু, এসে পড়েছি।'

হর্ষবর্ধনের চোখ কপালে ওঠে—'সে কি! এক মিনিটও তোমার গাড়ি চাপলাম না এর মধ্যেই এসে পড়লাম!'

গোবর্ধন বলে, 'কড়কড়ে দশটা টাকা দিয়েছি!'

ক্যোচম্যান জবাব দেয়—'যেখানে যেতে বললেন নিয়ে এলাম। বিশ্বাস না হয় ঐ দেখুন দোকানের সাইনবোর্ট।'

দুই ভাই গাড়ির দুই জানালা দিয়ে মুখ বাড়ান—সত্যিই, অবিশ্বাসের কারণ নেই, 'সাইনবোর্টে' স্পষ্ট বড় বড় হরফে লেখা—

"এখানে উত্তমরূপে চুল ছাঁটাই আর দাড়ি
কমানো হয়।"

হর্ষবর্ধন তবু ইতস্তত করেন—'এত শিগগির এলে! তোমার গাড়ি যে বাপু মোটরের চেয়েও জোর চলে দেখছি। গাড়ি চাপলাম, তা টেরই পেলাম না!'

গোবরাও নামতে রাজি হয় না—'তোমার কি বাপু পক্ষীরাজ ঘোড়া? একেবারে যেন উড়িয়ে নিয়ে এল!'

কোচম্যান বলে—'তা যখন দশ টাকা পেয়েছি, হুকুম করেন তো আপনাদের আলিপুর ঘুরিয়ে আবার এখানেই নিয়ে আসছি নাহয়। কিন্তু আলিপুর গেলে একটা মুস্কিল আছে।'

'কী? কী মুস্কিল? কিসের মুস্কিল?' দুই ভাইয়ের যুগপৎ জিজ্ঞাসা।

'সেখান থেকে আপনাদের ফিরতে দিলে হয় আবার!' বলে কোচম্যান একটু মুচকি হাসে।

গোবরা বলে—'কেন? কেন ফিরতে দেবে না? কে ফিরতে দেবে না? কার অ্যাদ্দুর ক্ষমতা? আমরা পালিয়ে আসতে জানি।'

হর্ষবর্ধন অধিকতর সমীচীন হন—'উঁহু, দরকার নেই গিয়ে। জায়গাটা বোধহয় খারাপ, প্রাণের ভয়-টয় আছে। নইলে বারন করবে কেন? নেমে পড়্ গোবরা!' তিনি ভুঁড়িকে অগ্রবর্তী করেন, গোবরা তাঁর পশ্চাদ্বর্তী হয়।

গাড়ি চলে গেলে গোবরা আকাশ থেকে পড়ে—'আরে, এ

যে আমাদের সামনের বাড়ি! কাল থেকে দুশো বার এ সেলুনটা আমার নজরে পড়েছে। কেবল ভাবছি, নীল কাচের দরজা দেওয়া ঘরটা কী হতে পারে! তখন তো জানি নি এই-ই সেই সেলুন!'

হর্ষবর্ধন চমকে ওঠেন, 'বলিস কী?' তিনি ঘুরে দাঁড়ান। 'তাই তো! ঐ যে ও ফুটপাথে আমাদের বাড়ি! আর ঐ পাশে ওধারে সেই ডেন্টিনিস্টের দোকান!'

এমন সময় একটি বছর পনেরর ফুটফুটে ছেলে সেলুন থেকে বেরিয়ে আসে। গোবর্ধন তাকে চিনতে পারে—'তোমাকে যেন কোথায় দেখেছি হে? তুমি আমাদের পাশের বাড়ির না?'

ছেলেটি জিজ্ঞেস করে—'কোন্ বাড়ি আপনাদের?'

'ঐ যে আমার ছবি সাঁটা রয়েছে—দেয়ালে—' ভুল ধরতে পেরে হর্ষবর্ধন তৎক্ষণাৎ শুধরে নেন—'উঁহু, আমার নয়, কিং কঙের ছবি সাঁটা রয়েছে আমাদের দেয়ালে—'

'দেখেছি। আর ঐ বাড়িটা আমাদের।' ছেলেটা দাঁত-বের-করা দোকানটা নির্দেশ করে, 'ডেন্টিস্ট আমার বাবা।'

'অ্যাঁ, বল কী? হাঁ কর তো। একি, তোমার সবগুলো দাঁতই যে রয়েছে! একটাও তোলেন নি তো?' হর্ষবর্ধন চমৎকৃত হন।

গোবর্ধন বলে—'তোমার বাবা বোধহয় তোমাকে তত ভালবাসেন না?'

'তোমার দাঁতগুলো সব বাঁধানো বোধহয়?' হর্ষবর্ধন সন্দিগ্ধ।

ছেলেটার ঘোরতর প্রতিবাদ—'বাঃ, তা কেন? কখনই না!'

গোবরার কৌতূহল হয়—'টেনে দেখতে দেবে আমায়?'

'এই যে আমি নিজে টানছি, দেখুন না!' ছেলেটি প্রাণপণ বলে দু'হাতে দু'পাটি আকর্ষণ করে। —'কামড়ে দেখাব আপনাকে?'

'না না।' গোবরা ঘাবড়ায়—'কামড়ালে আমাদের লাগবে না?' সে কারো কামড় খেতে রাজি নয়।

তথাপি হর্ষবর্ধনের সন্দেহ থেকে যায়—'উঁহু, তুমি জান না যে তোমার দাঁত বাঁধানো। দু'পাটিই তোলা হয়েছে, তোমার মনে নেই। তুমি ডেন্টিস্টের ছেলে, তোমার কখনও আসল দাঁত হতে পারে?'

গোবরা বলে—'সেলুনে বুঝি চুল ছাঁটতে গেছলে?'

'দাড়ি কামাতে গেছলাম।'

'এইটুকুন ছেলে, তোমার দাড়ি কই?' বিস্ময়ে হর্ষবর্ধন বিরাট হাঁ করেন।

দাড়িহীনতার লজ্জায় ছেলেটি ম্রিয়মান হয়ে যায়—'দাড়ি আর টাকা কি অমনি আসে মশাই? কামাতে হয়। আমার কথা নয়, আমাদের মাস্টারমশাই বলেন। আমার ইস্কুলের টাইম হল।'

ছেলেটি চলে যায়, দুই ভাই কিয়ৎক্ষণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে থাকেন। অবশেষে গোবর্ধন নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে—'কী রকম বুঝলে দাদা কলকাতার হালচাল?'

হর্ষবর্ধন মাথা চুলকোতে থাকেন—'তাই তো!'

'এ বাড়ির লোকের দাড়ি না-গজাতেই সামনের বাড়ির লোক সেলুন খুলে বসে গেছে। আজব শহর দাদা, কী বল?'

হর্ষবর্ধন দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়েন—'চল্, সেলুনে ঢুকি গে!'

কাল থেকে গোবর্ধন নীল কাচের দরজায় নজর রেখেছে এবং ওর অন্তরালে কী ব্যাপার হতে পারে তাই নিয়ে অনেক মাথা ঘামিয়েছে—সেই নীল কাচের দরজা ঠেলে ভেতরে গিয়ে প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য যে কোনদিন তার জীবনে হবে, তা সে প্রত্যাশা করেনি। নানা চেহারার, নানা বয়সের, নানান সাইজের হরেক রকম লোককে ওই দরজা ঠেলে হরদম্ যেতে-আসতে দেখেছে

আর ভেবেছে, বিশ্বশুদ্ধ লোকই কি ঐ বাড়ির বাসিন্দা। কিন্তু এখন কেবল আর এক মুহূর্তের ব্যবধান—একটু পরেই ঐ রহস্য-লোকের দ্বার তার কাছে উন্মুক্ত হবে। ডিটেকটিভ বইয়ের শেষ পাতায় এসে কিশোর পাঠকের বুক যেমন কাঁপতে থাকে, গোবর্ধনের এখন সেই অবস্থা।

যবনিকা অনাবৃত হলে দেখা যায়, ছোট্ট একখানি ঘর মাত্র। তার মধ্যেই কায়দা করে খান-ছয়েক চেয়ার সাজানো—ছ-টা বিরাট আয়নার মুখোমুখি; সবকটা চেয়ারেই তখন ক্ষুর আর কাঁচির খুব জোর খচাখচ। হর্ষবর্ধন ভাবেন, কী আশ্চর্য, এইটুকু ঘরে বিশ্ব-ভারতের আমন্ত্রণ! যাদের মাথা আছে আর মাথায় চুল আছে তাদের কারুই অব্যাহতি নেই এখানে না এসে—সারা দুনিয়ার দাড়ি কামিয়ে দিচ্ছে এরা! বাহাদুর বটে! গোবর্ধন কী ভাবে বলা যায় না, কী ভাবা উচিত, বোধকরি সেই কথাই তিনি ভাবেন।

যাওয়া-মাত্রই কর্তা-নাপিত এসে দুই ভাইকে সমাদরে অভ্যর্থনা ক'রে, দু'জনকে দুটো কুশন-চেয়ারে বসতে দেয়, একজোড়া মাথা ও গালের দিকে দৃষ্টিআকর্ষণ করে সবিনয়ে জানায় যে ওই দুটি 'চুলহীন ও নির্দাড়ি' হতে সামান্যই আর বাকি আছে, তার পরেই তাঁদের ওপর হস্তক্ষেপ করা হবে।

কলকাতায় আসার পর এই প্রথম অভিনন্দন লাভ, হর্ষবর্ধন খুশি হয়ে ওঠেন। গোবর্ধনও রীতিমতন বিস্মিত। নীল কাচের নেপথ্যলোকের যিনি একচ্ছত্র মালিক তাঁর পর্যন্ত কী অমায়িক ব্যবহার! হ্যাঁ, শহরের হলেও এবং হাতে ধারালো ক্ষুর থাকলেও এমনি লোকের কাছেই গলা (দাড়ি সমেত) নির্ভয়ে বাড়ানো যায়—এমন-কি এর কাঁচির তলায় মস্তক দান করাও খুব শক্ত ব্যাপার নয়।

গোবর্ধন অবাক হয়ে লক্ষ্য করে। সত্যিই, রহস্যলোকই বটে!

ওধারের আয়নার ছায়া এধারের আয়নায় পড়েছে, আর কিছুই না, কিন্তু কী আশ্চর্য। একই আয়নার মধ্যে গোবর্ধন দেখছে একশোটা ঘর, একশোটা আয়না! ঘরগুলো ক্রমশ ছোট হয়ে হয়ে যেন অনন্তে গিয়ে মিলিয়ে গেছে। অদ্ভুত কাণ্ড! গোবর্ধন ভাবছে, এখান থেকে বেরিয়েই দাদাকে প্রস্তাব করবে, এমনি এক কুড়ি বড় বড় আয়না বাড়ি নিয়ে যাবার জন্যে। প্রত্যেক ঘরে দুটো করে মুখোমুখি সাজিয়ে দেওয়া হবে—তাতে ঘরের সংখ্যা বাড়বে, আত্মপ্রসাদও বাড়বে সেইসঙ্গে, অথচ পয়সা খরচ করে ঘর বাড়াতে হবে না। বাড়িতে যে আয়নাটা আছে তার সামনে দাঁড়িয়ে গোবর্ধন এখন কেবল আর-একটা গোবর্ধনকে দেখতে পায় মাত্র, কিন্তু এইরকম পলিসি করলে তখন একশোটা গোবর্ধনকে একসঙ্গে দেখা যাবে—গোবর্ধনের সামনের চেহারা আর পেছনের চেহারা দুটোই যুগপৎ! কী মজাই না হবে তাহলে!

যাদের চুল-দাড়ির গতি হচ্ছিল, হর্ষবর্ধন বসে বসে তাদের ভাবগতিক দেখছিলেন। অবশেষে তিনি ফিস্-ফিস্ করতে বাধ্য হন—'গোবরা দেখেছিস, লোকগুলোর মুখের ভাব খুব হাসি-হাসি নয় কিন্তু!'

'চুল-ছাঁটা কি হাসির ব্যাপার দাদা!'

'জানি, গুরুতর ব্যাপার; কিন্তু তাই বলে এতখানি গোমড়া মুখ করতে হবে এ-ই বা কী কথা?'

গোবরা অভিনিবেশ সহকারে পর্যবেক্ষণ করে—'হুঁ, লোকগুলো যেন হাল ছেড়ে দিয়ে বসে আছে মনে হয়।'

হর্ষবর্ধন সায় দেন—'যা বলেছিস। মাথার হাল বদলাতে এসেছে তো! হাল আর মাথা দুই-ই হল এক জিনিস, বুঝলি? দুটোরই কর্ণ আছে কিনা! মাঝিকে বলে কর্ণধার—শুদ্ধ ভাষায়, জানিস তো?'

গোবর্ধন গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ে—'নাপিতকেও বলা যায় ও-কথা। কর্ণধার তো বটেই, তাছাড়া নাপিতের ক্ষুরেও বেশ ধার।'

একটা আয়নার চেয়ার খালি হয়, হর্ষবর্ধনের আমন্ত্রণ আসে। গোবরা ত্যাগীর ভূমিকা নেয়—'দাদা, তুমিই ছাঁটো আগে, আমার পরে হবে।'

হর্ষবর্ধনের ভাই-অন্ত প্রাণ, ভাইকে ছেড়ে কোন কাজে তাঁর মন সরে না। একসঙ্গে ট্রেনে উঠেছেন, ট্রেন থেকে নেমেছেন, মোটর চেপেছেন, কলকাতার সমস্ত অভিজ্ঞতাই তাঁরা একসঙ্গে আস্বাদ করছেন, অথচ চুল-ছাটার আনন্দ একা তাঁকেই প্রথম উপভোগ করতে হবে! ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে তাঁর মুখ কাঁচুমাচু হয়: 'বেশ, তুই নাহয় আগে দাঁত তোলাস।' তারপর কি ভাবেন খানিকক্ষণ—'আমি না-হয় দাঁত তোলাবই না।' হ্যাঁ, গোবরার দাদৃ-ভক্তির বিনিময় তিনি অবশ্যই দেবেন, দাঁত তোলার আনন্দ থেকে তিনি কঠোরভাবে নিজেকে বঞ্চিত রাখবেন। ভাইয়ের জন্যে বিরাট ত্যাগ স্বীকার করে তাঁর প্রাণ চওড়া হয়ে ওঠে। গোবরা দাদৃভক্ত সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁর ভ্রাতৃভক্তির তুলনাই কি পৃথিবীতে আছে?

চেয়ারে বসে চুল-ছাঁটানো হর্ষবর্ধনের জীবনে এই প্রথম। চুল ছাটার কথা শুনলেই চিরকাল তাঁর গায়ে কাঁটা দিয়ে এসেছে, আর দাড়ি কামানোর সময়ে মনে হয়েছে চীনেম্যানরাই পৃথিবীতে সুখী। চীনে দাড়ির প্রাদুর্ভাব কম, হর্ষবর্ধনের ধারণা সে দেশে বৌদ্ধ ধর্ম প্রসারের এই হচ্ছে একমাত্র কারণ।

হ্যাঁ, দাড়ি কামানোর সময়ে হর্ষবর্ধনের মনে হয়েছে, এর চেয়ে চীন দেশে জন্মানো ভাল ছিল। আসামের গাছ-পালারা বাঁচত, তিনিও রেহাই পেতেন। দেশি নাপিতকে যদি বলেছেন—'দাড়িটা আর একটু ভিজিয়ে নাও হে—বড় লাগছে', অমনি তার জবাব পেয়েছেন, 'দরকার হবে না বাবু, আপনার নয়নজলেই সেরে নিতে

পারব।' বাধ্য হয়ে তাঁকে নিজের দাড়ির উপর অশ্রুবর্ষণ করতে হয়েছে। যদি বলেছেন, 'তোমার ক্ষুরটা ভারি ভোঁতা বাপু!' অমনি বাপুর উত্তর—'ডবল খাটুনি হল তার দ্বিগুণ মজুরি দিন মশাই!' সুতরাং আর-এক দফা অশ্রুবর্জন। আর চুল ছাঁটার কথা না তোলাই ভাল। উবু হয়ে বসে খবরের কাগজের মাঝখানে ফুটো করে মাথা গলিয়ে ঝাড়া দু'ঘণ্টা সে কী কর্মভোগ! চুলের সঙ্গে কাঁচির সে কী ঘোরতর সংগ্রাম—আবার অনেক সময়ে ঠিক চুলের সঙ্গেই না, মাথার খুলি, কানের ডগা, খোদ হর্ষবর্ধনের সঙ্গেও। কাঁচির খোঁচা খেয়ে হর্ষবর্ধন ক্ষেপে যান; ইচ্ছা হয় যে নাপিতকে মনের সাধে দেন দু'ঘা কসিয়ে—কিন্তু দারুণ বাসনা তিনি দমন করে ফেলেন। নাপিতকে মারা আর আত্মহত্যা করা এক কথা, কেননা এমন সুযোগ প্রায়ই আসে যখন নাপিতের ক্ষুর আর গলার দূরত্ব খুব বেশি থাকে না। অনেক ভেবে হর্ষবর্ধন নাপিতকে মার্জনা করে ফেলেন। বিবেচক হর্ষবর্ধন।

কিন্তু প্রাণ নিয়ে পরিত্রাণ পেলেও চুল নিয়ে কি পরিত্রাণ আছে সে-সব নাপিতের কাছে? অনেক ধস্তাধস্তি করে মাথায়-মাথায় হয়ত রক্ষা পান, কিন্তু চুলের অবস্থা দেখে হর্ষবর্ধনের কান্না পায়—আয়নায় যেটুকু স্বচক্ষে দেখা যায় সে তো শোকাবহ বটেই, আর যে অংশ 'পরস্ব' চোখে জানতে হয় তার রিপোর্টও কম মর্মভেদী নয়। এধারে কপচানো, ওধারে খপচানো, কাকে-ঠোকরানো, বকে-ঠোকরানো—যত দিন না চুল বেড়ে আবার ছাঁটাবার মত হয়েছে তত দিন সে মাথা মানুষের কাছে দেখালে মাথা কাটা যায়। এই হেতু কাঁচি-হাতে নাপিতের আবির্ভাব দেখলেই হর্ষবর্ধনের জ্বর আসে, মাথা ধরে, ঘাম হয়, পেট কামড়াতে থাকে—ঠিক যে-সব উপসর্গ ছেলেবেলায় পাঠশালায় যাবার সময়ে অনিবার্যরূপে দেখা দিত।

কিন্তু সে চুল-ছাঁটার সঙ্গে এ চুল-ছাঁটার তুলনাই হয় না। এ

কেমন চেয়ারে বসে সাদা চাদর জড়িয়ে (যাতে একটিও পলাতক চুলও তোমার কাপড়-জামার মধ্যে অনধিকার প্রবেশ না করতে পারে) দস্তুরমত আরাম। ঘণ্টাখানেক চোখ বুজে ঘুমিয়েও নিতে পার, জেগে দেখবে তোফা চুল ছেঁটে দিয়েছে—ঠিক কচুয়ানদের মতই। তুমি কচুয়ান নও বলে যে তোমাকে কম খাতির করবে তা নয়—কোনরকম উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ নেই এসব শহুরে নাপিতের কাছে। যে ঘোড়ার গাড়ি হাঁকায় না তাকেও এরা মানুষ বলেই গণ্য করে। কেন, হর্ষবর্ধনকে কি এরা কম কিছু মর্যাদা দিয়েছে? ঢোকামাত্রই কেমন সাদর সম্ভাষণ—ডেকে চেয়ারে বসানো—সম্বর্ধনা কি কিছু কম করেছে এরা? তবু তো হর্ষবর্ধন কচুয়ান নন! হর্ষবর্ধন গ্যাঁট হয়ে বসে পড়েন চেয়ারে, আরামে গা এলিয়ে দেন। মাথার উপরে হু-হু করে পাখা ঘুরছে—সম্মুখে নিজের চেহারা দেখবার সুবর্ণ সুযোগ—হর্ষবর্ধন স্বর্গসুখ উপভোগ করেন। মুখখানা হাসি-হাসি করে তোলার সাধ্যমত চেষ্টা করেন তিনি। নাপিত একটা নতুন ধরনের কাঁচি হাতে নেয়, কাঁচির কলেবর দেখে হর্ষবর্ধন অবাক হন। কাঁচি না বলে তাকে চিরুনিও বলা যায়, তার মুখের দিকে চিরুনির মত দাঁত আর হাতলের দিকটা অবিকল কাঁচি। হর্ষবর্ধন মনে মনে বস্তুটির নামকরণ করেন—'কাঁচিরুনি' হবে হয়ত। নাপিতকে প্রশ্ন করেন—'অদ্ভুত কাঁচি তো।'

'কাঁচি নয়, ক্লিপ।' নাপিত উত্তর দেয়। 'পেছনটা ক্লিপছাঁটা করতে হবে তো?'

'যেমন কলকাতার দস্তুর তাই কর।'

ঘাড়ের পেছনে ক্লিপ চলতে থাকে, হর্ষবর্ধন শিউরে শিউরে ওঠেন। যন্ত্রটা ততটা আরামদায়ক নয়। যেন ঘাড়ের চামড়া একেবারে চেঁছে নেয়, চুলগুলোকে যেন গোড়া থেকে সমূলে উপড়ে তোলে। কখনও ঘাড় কোঁচকান, কখনও টান করেন, কখনও কাত

হন, কিন্তু কিছুতেই তিনি সুবিধা করতে পারেন না। অবশেষে মরীয়া হয়ে তিনি লাফিয়ে ওঠেন,—'থামাও তোমার কিলিপ। রাখো তোমার কাঁইচি-কাট্। এদিকে ঘাড় গেল আমার! এ যে দেখছি আসামী কাঁচির বাবা গো!'

নাপিত ঘাড় ধরে বসিয়ে দেয়, কোন উচ্চবাচ্য করে না। তার অনেক দিনের অভিজ্ঞতা। পাড়াগেঁয়ে যারা প্রথম চুল ছাঁটায় তারা সবাই এইরকমই করে কিন্তু পরে আবার তারাই চেহারার খোলতাই দেখে খুশি হয়ে আশাতীত বখশিস দিয়ে যায়। ক্লিপ চলতে থাকে, হর্ষবর্ধন একবার কাতর নেত্রে গোবর্ধনের দিকে দৃষ্টিপাত করেন, কিন্তু কী করবেন, ভাগ্যের কবল থেকে কারু কি নিষ্কৃতি আছে? তাঁকে অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করতে হয়। গোবরা তাকিয়ে দেখে, দাদার হাসি-হাসি মুখভাব কেমন যেন কাঁদো-কাঁদো হয়ে এসেছে। নাপিতের হাত থেকে তাঁকে ছিনিয়ে নীল দরজা ভেদ করে সবেগে প্রস্থান করবে কি না সে ভাবতে থাকে। আপন মনে গজরায়,—'আসলে হল খুরপি, নাম দিয়েছেন কিলিপ। তা, খুরপি চালাবে তো বাগানে চালাও গে না! পরের ছেলের মাথায় কেন রে বাপু?'

পেছন শেষ করে সামনে ছাঁটা শুরু হয়, কিলিপের স্থান অধিকার করে কাঁচি। সামনের চুল যেমন তেমনই থাকে, কেবল ডগাগুলো সামান্য ছেঁটে সমান করে দেওয়া। কাজ সমাধা হয়েছে জানিয়ে, পছন্দ হয়েছে কি না নাপিত প্রশ্ন করে। হর্ষবর্ধন সেই প্রশ্ন গোবর্ধনের প্রতি নিক্ষেপ করেন।

গোবর্ধন প্রাণপণে পর্যবেক্ষণ করে, কিন্তু চুল-ছাঁটাটা কোন্ জায়গায় হল খুঁজে পায় না। সামনের চুল তো ছোঁয়াই হয় নি, আর পেছনটা দিয়েছে খুরপি বসিয়ে বেবাক ন্যাড়া করে। সমান করে আঁচড়ালে সামনে দাড়ি পর্যন্ত ঢাকা পড়বে—নাক-মুখই

দেখতে পাওয়া যাবে না, আর পেছনে তো মাথার খুলিই বেরিয়ে পড়েছে, তার সাদা চামড়া ঢাকতে গেলে পরচুলোই পরতে হয় কি না কে জানে। গোবরা স্বাধীন অভিমত দেয়,—'সামনে তো তুমি দেখতেই পাচ্ছ।'

'হুঁ, সামনেটা একটু কমানো দরকার।' হর্ষবর্ধন মন্তব্য করেন। কিন্তু হঠাৎ তাঁর আশঙ্কা হয়, কমাতে বললে হয়ত কাঁচি ছেড়ে কিলিপ দিয়ে কামাতে শুরু করে দেবে। ভয়াবহ যন্ত্রটার দিকে বঙ্কিম কটাক্ষ করে তিনি বলেন,—'না, থাক।'

'তাহলে হেয়ার ড্রেস করি?' নাপিত হর্ষবর্ধনের অনুমতির অপেক্ষা করে। হর্ষবর্ধন মনে মনে আলোচনা করেন, হেয়ার মানে তো চুল, অবশ্য খরগোসও হয় কিন্তু এখানে চুলই হবে, কিন্তু ড্রেস করবে—সে আবার কী? চুলে কাপড় পরাবে নাকি? তিনি ভয়ে-ভয়ে প্রশ্ন করেন,—'কিলিপের ব্যাপার ট্যাপার নয় তো?'

'না না, মাথায় গোলাপ-জল দিয়ে—'

'তা দাও, তা দাও।' ঘাড়ের পেছনটা তখন থেকে ভারি জ্বলছিল, জল পড়লে হয়ত ঠাণ্ডা হতে পারে ভেবে হর্ষবর্ধন উৎফুল্ল হন। 'আচ্ছা, চুল না ছাঁটলে বুঝি তোমরা গোলাপ-জল বাজে খরচ কর না—না?' নাপিত ঘাড় নাড়ে। 'কর? বটে? আহা, তা জানলে আমি ড্রেস হেয়ারই করাতাম, তাহ'লে চুল ছাঁটত কোন্ হতভাগা?'

নাপিত গোলাপ-জল দিয়ে চুলগুলো ভিজিয়ে দেয়, দিয়ে চুলের মধ্যে আস্তে আস্তে আঙুল চালায়। হর্ষবর্ধনের আরাম লাগে, ঘুম পায়। কিন্তু ক্রমশই নাপিতের 'ড্রেস হেয়ারের' জোর বাড়তে থাকে, তার আঙুলগুলো যেন লৌহঘটিত হয়ে ওঠে—সে তার সমস্ত বাহুবল প্রয়োগ করে হর্ষবর্ধনের খুলির ওপর। হর্ষবর্ধন লাফাবার চেষ্টা করেন কিন্তু পারেন না, লাফাবেন কী করে? পায়ের জোরে

মানুষ লাফায় বটে, কিন্তু লাফাতে হলে পা ও মাথা একসাথে তুলতে হয়। এ ক্ষেত্রে তাঁর শ্রীচরণ স্বাধীন থাকলে কী হবে, মাথা যে নিতান্তই বে-হাত! মাথা বাদ দিয়ে লাফানো যায় না। হর্ষবর্ধন আর্তনাদ করেন,—'এই! এ কী হচ্ছে? কী হচ্ছে এ? এ কী রকম তোমাদের ড্রেস-হেয়ার? এ তো ভাল নয়।'

খোট্টারা যেমন প্রবল পরাক্রমে বর্তন মলে, গোবর্ধন দেখে, সেই তালে দাদার ড্রেস হেয়ার চলছে। সে বিরক্তি প্রকাশ করে,—'এ কি বেওয়ারিশ মাথা পেয়েছে যে চটকে-মটকে নিচ্ছ তুমি?'

নাপিত এসব কথায় কান দেয় না, তার কাজ করে যায়। সে কখনও রগ টিপে ধরে, কখনও মাথায় থাবড়া মারে, কখনও সমস্ত চুল মুঠিয়ে ধরে গোড়া ধরে টানে, কখনও দু'ধার থেকে টিপে মাথাটাকে চ্যাপটা করার চেষ্টা করে, কখনও ঘাড় ধরে ঝাঁকুনি দেয়—তার দেহের সমস্ত শক্তি এখন করতলগত। হর্ষবর্ধনের বাধা দেবার ক্ষমতা ক্রমেই কমে আসে, তিনি নির্জীব হয়ে পড়েন। তাঁর ক্ষীণ কণ্ঠ শোনা যায়,—'গোবরা, তোর বৌদিকে বলিস আমি সজ্ঞানে কলকাতা-লাভ করেছি!' এর বেশি আর তিনি বলতে পারেন না। কিন্তু গোবরা বুঝতে পারে দাদার অবস্থা সঙ্কটাপন্ন, দাদাকে সজ্ঞানে আসাম-লাভ করাতে হলে এই মুহূর্তেই এখান থেকে সটকান দিতে হবে। সে যেন ক্ষেপে যায়—'ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও বলছি আমার দাদাকে; নইলে ভাল হবে না কিন্তু!'

নাপিত হতভম্ব হয়ে হাতের কসরৎ থামায়।

'এমনিভাবে মাথাটাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলছ যে—এর মানে?'

'চুলের গোড়া শক্ত হয় এতে।'

'চুলই রইল না তো চুলের গোড়া। টেনে টেনে তো অর্ধেক চুল ওপড়ালে, মাথায় চুল আর রইলো কোথায়?'

'এ রকম করলে মাথা ছেড়ে যায়।'

'মাথা ছেড়ে যায়?' গোবরা যেমন অবাক হয়, তেমনি চটে। 'ছেড়ে যায়? ছেড়ে গেলে তুমি জোড়া দিতে পারবে?'

নাপিত কী উত্তর দেবে ভেবে পায় না। গোবরা কণ্ঠে আরো জোর দেয়,—'যে মাথা তুমি দিতে পার না সে মাথা নেবার তোমার কী অধিকার?'

হর্ষবর্ধন ঘেরাটোপের ভিতর দিয়ে আঙুল বাড়িয়ে ক্লিপটা হাতাবার চেষ্টা করেন,—'গোবরা, সহজে না ছাড়ে যদি তাহ'লে দে এই যন্তরটা ওর ঘাড়ে বসিয়ে! মজাটা টের পাক।...মাথা ছাড়িয়ে দেবেন—ভারি আবদার!'

গোবরা বলে,—'না, দরকার নেই ঝগড়াঝাঁটির। এই নাও তোমার মজুরি দশ টাকা। দেশে চুল ছাঁটতে দশ পয়সা—কলকাতায় না-হয় দশ টাকাই হবে, এর বেশি তো না? দাদা, আর দেরি ক'রো না, উঠে এস। চল পালাই।'

দুই ভাই নাপিতকে নিশ্বাস ফেলার অবকাশ দেয় না, চক্ষের পলকে সেলুন পরিত্যাগ করে।

বাইরে এসে হর্ষবর্ধন হাঁপ ছেড়ে বাঁচেন। হতাশভাবে মাথায় হাত বুলোন,—'সত্যিই তো, টাক ফেলে দিয়েছে দেখছি! যাক, খুব রক্ষা পাওয়া গেছে! আর-একটু হলে মাথাটাই ফেলে আসতে হত।'

গোবর্ধন ঘাড় নাড়ে,—'এরা পেছনের চুল দেয় দাড়ি কামানো করে আর সামনের চুল দেয় ছিঁড়ে—একেই কি বলে চুল ছাঁটা? আজব শহরের অদ্ভুত হালচাল!...অ্যাঁ, এত লোক জমছে কেন চারদিকে?'

দুই ভাইকে কেন্দ্র করে ক্রমশই জনতা আরো ভারি হতে থাকে, হর্ষবর্ধন ফিস-ফিস করে বলেন—'দু'জনের দু'রকম চুল দেখে অবাক হচ্ছে বোধহয়?'

'উঁহু', গোবরা অনুচ্চ কণ্ঠে জানায়, 'তোমার বোরখাটা খুলে ফেলনি এতক্ষণেও ?'

পালাবার মুখে ঘেরাটোপ ফেলে আসার অবকাশ সামান্যই ছিল, কিন্তু সেটাকে তখন পর্যন্ত গায়ে জড়িয়েই রেখেছেন হর্ষবর্ধন। খেয়াল হল এতক্ষণে। সত্যিই, লোকে যা বলে মিথ্যা নয়, কলকাতার হালচাল অদ্ভুত! ঘেরাটোপ খুলে ফেলতেই জনতা আপনার থেকেই ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল, কোন উচ্চবাচ্য করল না।

চাদরটা গুটিয়ে বগলে চেপে হর্ষবর্ধন বলেন,—'এই ছাখ্!'—তাঁর হাতে সেই ভয়াবহ ক্লিপটা। —'আমি ইচ্ছে করে আনি নি, পালাবার সময় আমার হাতে থেকে গেছে—কী করব ? ফেরৎ দিয়ে আসি ?'

'পাগল! আর সেখানে যায় ?' গোবরা ভয় দেখায়। 'আবার যদি শুরু করে দেয় ঐটে দিয়ে ?'

'তবে থাক এটা। দেশে গিয়ে দীনু নাপিতকে দেখাব। এবার যে ব্যাটা আমার চুল ছাঁটতে আসবে দেব এটা তার ঘাড়ে বসিয়ে—তা সে কলকাতার নাপিতই কি আর আসামের নাপিতই কি!'

'বেশ করেছ এটা নিয়ে এসে। কলকাতার বহুৎ লোক তোমাকে চার পা তুলে আশীর্বাদ করবে। ঘাড় বাঁচিয়ে দিলে অনেকের!'

হর্ষবর্ধন মাথা নাড়েন,—'যা বলেছিস তুই! একখানা মানুষ-মারা কল!' ক্লিপ দিয়ে একবার পিঠ চুলকে নেন তিনি। 'যাক, ঘামাচি মারা যাবে এটা দিয়ে।'

'বৌদি কাক তাড়াবে এই দেখিয়ে। কাকের উৎপাত থেকে বাঁচা যায় তাহ'লে। মানুষ এ দেখলে ভয় খায় আর কাক খাবে না ? কী বল দাদা ?'

'তখন থেকে ঘাড়টা কী জ্বালা করছে! মাথাটাও টাটিয়ে রয়েছে! চুলের ওপর দিয়ে কি কম ধকলটা গেল! চুল ধরে কি

কম টানাটানি করেছে নাকি ? এক চুলের জন্য বেঁচে গেছি আজ। ইসকুলের সেই যে কি ইসপোর্ট হত মনে আছে ? হুবহু তাই।'

'হুঁ, ওয়ার অব্ টাগ।'

হর্ষবর্ধন ব্যাখ্যা করে বিশদ করেন,—'ওয়ার মানে যুদ্ধ,—বালিশের ওয়াড়ও হয় আবার,—সে হোলো গে আলাদা ওয়াড়—'

গোবর্ধন বাধা দেয়,—'কেন, আলাদা হবে কেন ? আমরা ছোট বেলায় বালিশ নিয়ে যুদ্ধ করি নি ? পিটিয়ে কত বালিশের তুলো বের করে দিয়েছি।'

'দূর মুখ্যু, বালিশের ওয়াড় বুঝি ওকে বলে ? বালিশের জামাকে বলে বালিশের ওয়াড়, তাও জানিস না ? ওয়ার অব্ টাগ,—অব্ মানে হল 'র'—আর টাগ ? টাগ মানে কী ?'

'কী জানি ! টাক-ফাক হবে।'

'তাই হবে বোধহয়। ওয়ারের চোটে প্রায় টাক পড়ে গেছে আমার। হ্যাঁ, কথাটা হবে ওয়ার অব্ টাক, বুঝলি ? লোকের মুখে-মুখে 'টাক' 'টাগ' হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

গোবরা মুখখানা গম্ভীর করে,—'উঃ, কাল থেকে কী টেকো লোকই না দেখছি রাস্তায়। কলকাতার লোকের এত টাক কেন বোঝা গেল এখন।'

'কেন ?'

'এইসব দোকানে চুল ছাঁটার জন্যে। দু-বার ছাঁটলেই টাক—চাঁদি একদম পরিষ্কার ! চুল ছাঁটালেই চুল ধরে টানতে দিতে হবে—এই হল এখানকার দস্তুর।'

'বলিস কী রে ! ভাগ্যিস গোঁফ ছাঁটি নি, তাহ'লে কী সর্বনাশই না হত।' হর্ষবর্ধন সভয়ে গোঁফ চুমরান। গোঁফ তাঁর ভারি আদরের বস্তু। এই হচ্ছে তাঁর একমাত্র ব্যক্তিগত সম্পত্তি যার ভাগ, সাধ থাকলেও, তাঁর ভাইকে দেবার সাধ্য ছিল না তাঁর।

যতদূর সম্ভব এবং নাপিতের সাধ্য নিশ্চুল তো হয়েছেন, অতঃপর কী করা যায় এই কথাই তিনি ভাবছিলেন। দ্রষ্টব্য দেখতেই তিনি বাড়ি থেকে পাড়ি দিয়েছিলেন, অবশেষে এখানে এসে চাপ্তব্য জিনিসেরও সাক্ষাৎ পেলেন—মোটর গাড়ির থেকে মায় কলার খোসা পর্যন্ত চাপতে কিছুই আর বাকি থাকল না—এমনকি যা তাঁর দুঃস্বপ্নেরও অগোচর ছিল সেই ভয়াবহ ছাঁট্তব্য কাজটাও তিনি এইমাত্র সমাধা করে এসেছেন। এর পর আর কী করা যায়? অতঃপর? ততঃকিম্??

গোবর্ধনের কাছে তিনি নিজের মনোভাব ব্যক্ত করলেন কিন্তু তার চিন্তাধারা যে অন্য পথে খেলছিল তা প্রকাশ পেতেও দেরি হল না। সে বলল,—'কেন? চাপ্তব্য তো কতই এখনও বাকি রয়ে গেল। টেরাম আর ঠেলা গাড়ি তো চাপিই নি এখনো। রিক্শো না রিশকো কি বলে—ওই যে মানুষ-টানা দু'চাকার—ওর রসও তো এখনও টের পেলুম না। তেতালা মোটরের কথা ছেড়েই দাও। ইষ্টিশনে সেই যে টাক্সি না টাশ্কি কি বলছিল তাও চাপা হয় নি। দাদা, এস, ঐ রকম একটা পুঁচকে মোটর ভাড়া করে ঘোরা যাক ততক্ষণ।'

'থাম থাম। তোর কেবল মোটর আর মোটর।' হর্ষবর্ধন খাপ্পা হয়ে ওঠেন,—'কেন, কলার খোসায় যে চাপা গেল সেটা কি চাপা নয়? কটা লোক চাপতে পারে?'

'সে তো তুমিই কেবল চেপেছ। আমি তো চাপি নি।'

'কে বারণ করছে চাপতে? একঝুড়ি কলা কিনে ফেললেই হল। কলার খোসা মোটরের চেয়ে জোর যায়—হ্যাঁ। চোখে-কানে দেখতে দেয় না। হুম্।'

'তা বেশ, কেনো না কেন? ওই তো ওখানে ঝুড়িতে করে

বিক্রি করছে। আমি টাশ্‌কি চেপে কলা খেয়ে খেয়ে খোসা ফেলতে ফেলতে যাই, আর তুমি পেছন পেছন খোসায় চেপে চেপে আসতে থাকো। আমি বরাবর জুগিয়ে যেতে পারব, খোসার অভাব হবে না তোমার, তা বলে রাখছি।'

গোবর্ধনের প্ল্যানটা হর্ষবর্ধনের ঠিক মনঃপূত হয় না। তিনি ঘাড় নেড়ে গম্ভীরভাবে বলেন,—'উঁহুঁ।' খানিক পরে পুনরায় নিজের কথায় সায় দেন—'তা হয় না।'

কোন্‌টা হয় না, টাশ্‌কি চাপা কি কলা খাওয়া, গোবর্ধন দাদার মন্তব্য থেকে সেই দুরূহ তত্ত্ব উদ্ধারের প্রয়াস পাচ্ছে, এমন সময় একজন অপরিচিত লোক এসে উভয়কে অভিবাদন করল। 'খবর-কাগজ দেব বাবু?' লোকটা এক কাগজওয়ালা।

'কাগজে আর কী হবে?' হর্ষবর্ধন চিন্তা করে বলেন, 'চুল-ছাঁটা তো হয়েই গেছে।'

গোবর্ধন বলে,—'শালুনে চুল ছাঁটতে গেলে তো কাগজের দরকার হয় না, ওরা কাপড় দিয়ে মুড়ে দেয়।'

'খবর-কাগজ থাকলে কে যেত ঐ হতভাগা শালুনে? ওর চেয়ে কাগজে মাথা গলিয়ে উবু হয়ে বসে ঘরোয়া নাপিতের কাছে ছাঁটানো ঢের ভাল। হ্যাঁ, ঢের ভাল!' এই বলে হর্ষবর্ধন হকারের দিকে ঝোঁক দেন,—'তা বাপু, একটু যদি আগে আসতে—নেওয়া যেত তোমার একখান কাগজ। গোবরা ছাঁটবি নাকি, নেব কাগজ?'

'এসেছে যখন এত আশা করে—কেনো একখান।'

কাগজওয়ালা সেদিনের একখানা বাঙলা কাগজ হর্ষবর্ধনের হাতে দেয়। মুহূর্তমধ্যে তাঁকে বিচলিত হতে দেখা যায়।

'এ কী কাগজ? এত ছোট কেন হে? এ তো আমাদের পুরোনো হিতবাদী নয়! না বাপু, আমাকে প্রকাণ্ড বড় একখানা দাও—

হিতবাদীই দাও কিংবা হিতবাদীর মতই। আজকের হোক, পুরোনো হোক তাতে ক্ষতি নেই। টুকরো-টাকরা এতগুলি আমার কী কাজে লাগবে? মাথা গললেও গা ঢাকা তো পড়বে না এতে?'

'পেতে বসা যাবে অন্তত!' গোবরা আর একটা সম্ভাব্য সদ্ব্যবহারের দিকে দাদার অন্তর্দৃষ্টি আকৃষ্ট করে,—'যদি চেয়ার টেবিলগুলোয় ছারপোকা থাকে?'

'হ্যাঁ, তবে দাও তোমার কাগজ।' হর্ষবর্ধন ঠন্ করে একটা টাকা ফেলে দেন।

'কোন্ কোন্ কাগজ দেব বাবু?' হকার সপ্রশ্ন।

'যা যা আছে দাও না কেন তোমার! এক টাকার মধ্যে কিন্তু—ওর বেশি কিনতে পারব না এখন।' লোকটার বিস্ময়-বিমূঢ়তা কাটিয়ে উঠার আগেই আবার তিনি তাকে কাবু করে দেন —'কি কাগজ দিচ্ছিলে তুমি—এক টাকায় যদি তোমার না পোষায়, তাই না-হয় দাও তুমি দশ টাকার। ঘর তো একখানা নয়, টেবিল চেয়ারও অনেক।'

গোবর্ধন যোগ করে,—'আর যদি থেকে থাকে তাহ'লে ছারপোকাও অঢেল হবে।'

হকার তার বগলের কাগজগুলো গুণতে থাকে হর্ষবর্ধন তার থেকে একখানা টেনে নিয়ে ভাইয়ের হাতে দেন—'কী কাগজ পড়ে ছাখ্ তো গোবরা! হিতবাদী যে নয় তা আমি না-পড়েই বলতে পারি। চেহারা দেখেই বলা যায়। তবে হ্যাঁ, হিতবাদীর বাচ্চা হতে পারে।'

'হ্যাঁ, বাচ্চা হাতি—বাচ্চা হিতবাদীর মতই দেখতে দাদা।' গোবর্ধন নামটা পড়বার প্রয়াস পায়,—'বলছে, আনন্দবাজার পত্রিকা।'

'ঠিক হয়েছে। কলকাতার হাট-বাজারের সব খবর আছে

এতে। সবাই তো কলকাতায় আমাদের মত বেড়াতে আর টাকা ওড়াতে আসে না, হাট-বাজার, কেনা-কাটা করতেই অনেকের আসা হয়। তাদের সুবিধের জন্যেই এই কাগজ—বুঝতে পেরেছিস তুই?'

'যাতে লোকে, মানে যারা পাড়াগেঁয়ে, অনর্থক না ঠকে যায়—বেশ আনন্দের সঙ্গে বাজার করতে পারে। অনেকক্ষণ আগেই বুঝেছি আমি দাদা।'

'হ্যাঁ, তা বুঝবিই তো! বলে দিলুম কিনা!' হর্ষবর্ধন গোবরার ওপর-চালের এই উপরি পাওনায় ঠিক আপ্যায়িত হতে পারেন না,—'এইজন্যেই তোকে কিছু বলতে ইচ্ছে করে না।'

এই বলে তিনি ভাইয়ের প্রতি আর দৃকপাত না করে হকারের বিষয়ে নিজেকে ব্যাপৃত করেন,—'হ্যাঁ হে বাপু, তোমার কাছে 'জগুবাবুর বাজার' বলে কোন কাগজ আছে? নেই? কাছে না থাক একটু পরে এনে দিতে পারবে তো? পুরোনো হলেও চলবে, পুরোনো খবরও পড়া যায়,—খবর থাকলেই হল, খবর পড়া নিয়ে কথা। আজকের খবর আজকেই পড়তে হবে তার কোন মানে নেই। ঐ আমাদের বাড়ি, ওখানে গিয়ে দিয়ে এলেই হবে; অ্যাঁ? কি বলছ? ও নামে কোন কাগজ নেই? একদম নেই? উঁহু—অসম্ভব! এ কখনও হতে পারে? জগুবাবুর বাজার যখন আছে তখন কাগজও নিশ্চয় আছে ওখানকার—নাকি, জগুবাবুর বাজারই নেই তুমি বলতে চাও? বাজার আছে? বাজার আছে তো কাগজ নেই কেন হে! আশ্চর্য! থাকলে ভাল হত। সেই কর্মচারীটা জগুবাবুর বাজারের কাছে কাল নাইস হোটেলের কথা বলেছিল, বিজ্ঞাপন দেখে তার খবরাখবর জানা যেত সব।'

হকারটা ঘাড় নেড়ে জবাব দিচ্ছিল, এতক্ষণে কথা বলার ফুরসুৎ পেল—'সাড়ে দশ আনার কেবল হল বাবু! আর ন টাকা সাড়ে

পাঁচ আনার আনন্দবাজার আমি একটু পরেই দিয়ে যাব আপনার ওই বাসায়—দিয়ে যাব ঠিক, ঘাবড়াবেন না।'

হর্ষবর্ধন কাগজের তাড়না গোবরার কাঁধে চাপিয়ে দেন, দিয়ে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করে বিনা বাক্যবয়ে অবলীলায় বাড়ির অভিমুখে রওনা হন। তখনকার মত ভাইয়ের প্রতি তাঁর আর চিত্ত নেই। তাঁর মনের মধ্যে গজগজ হতে থাকে,—'আমি বললাম বলে তাই জানল, আর বলে কিনা জানি, অনেক আগেই জানতাম! কী ভয়ানক মিথ্যেবাদী দেখেছ? ইস, এমন জানোয়ার নিয়ে মানুষ কলকাতায় আসে? ঘর করে?'

তাড়া স্কন্ধে গোবর্ধন দাদার অনুসরণ করে—সেও কোন কথা বলে না। কোন্‌খানে যে তার ঘাট হল যে-অপরাধে দাদা চটে গেলেন, তার ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক অনেক আন্দোলিত করেও সে তার কাছাকাছি পৌঁছতে পারে না। তার অন্তঃকরণেও ফোঁস-ফোঁসানি শুরু হয়,—'তা যাবে তো যাও না বাপু কলার খোসা চেপে! আমি কি বারণ করেছি, না বাধা দিচ্ছি? কে তোমায় মোটর চাপতে বলছে? সাধছে কে? মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত, আর তোমার দৌড় ঐ ধড়াম্‌তলা! ঐখানে পৌঁচেছ কি অমনি আর-একটি ধড়াম্‌! ব্যাস! ধড় এবার আস্ত থাকলে হয়! ধড় তো নয়, যেন ভূধর!'

বাড়ির ভেতরে গিয়েও রফার কোন লক্ষণ দেখা যায় না। কেউ কারু সঙ্গে কথা কয় না, নিঃশব্দে যত টেবিল চেয়ারের উপর কাগজ পেতে চলে। সমস্ত ঘর নিঃশেষ করে বসবার কামরায় এসে দ্যাখে ডেন্টিস্টের সম্পর্কিত দাড়িবিলাসী সেই ছেলেটি চেয়ারের একখানা কাগজ অপসারিত করে এক মনে কী পড়ছে।

দাঁত তুলবার জন্যে বোধহয় ডাকতে এসেছে—গোবরার এমনই আশঙ্কা হয়, সে ভ্রূকুটি-কুটিল নেত্রে তাকিয়ে থাকে।

হর্ষবর্ধন স্মিতমুখে ওকে অভ্যর্থনা করেন,—'কী, কদ্দুর এগুলো তোমার দাড়ি?'

ছেলেটি অপ্রতিভের মত একটু হাসে,—'আজকের কাগজটা একবার দেখতে এলাম। গোরা বলছিল, আমার কিন্তু বিশ্বাস হয় না—কে একজন পৃথ্বীশ রায় নাকি অমনি অমনি উড়োজাহাজে করে ইটালি বেড়াতে নিয়ে যাচ্ছেন। তা কথাটা সত্যিই বটে।'

'উড়োজাহাজে করে? অ্যাঁ—তাই বললে না তুমি?' হর্ষবর্ধন অবাক হয়ে যান—'জাহাজ আজকাল আবার উড়ছে নাকি গো?'

গোবরা বলে,—'আমি তো জানতাম কেবল ডুবে যায় জাহাজ। কথায় বলে, জাহাজডুবি।'

'তুই থাম্। তুই তো সব জানতিস।' গোবর্ধনকে ধমক দিয়ে হর্ষবর্ধন ছেলেটির অভিমতের অপেক্ষা রাখেন,—'খবর-কাগজে লিখেছে? ছাপার অক্ষরে? কই দেখি। যখন ছেপে দিয়েছে তখন সত্যিই হবে।'

তিনজনেই একসঙ্গে কাগজের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে এবং তিনজোড়া বিস্মিত দৃষ্টি একত্র হয়। হ্যাঁ, সত্যিই বটে। স্পষ্ট অক্ষরেই বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে যে আটাশ বছর থেকে আটাশি বছরের মধ্যে যাদের বয়স এমন দু-জন দুঃসাহসিক সহযাত্রী চেয়েছেন পৃথ্বীশ রায়। তাঁদের তিনি ইটালি নিয়ে যাবেন, আবার ঘুরিয়ে নিয়ে আসবেন—বিলকুল বিনা খর্চায়—ইত্যাদি, এইরকম অনেক কিছুই লেখা রয়েছে সেই কাগজে।

'প্রায় মাসখানেক থেকে বিজ্ঞাপন দিচ্ছে, গোরা অনেক আগেই আমায় বলেছিল। কিন্তু আমাকে কি নিয়ে যাবে?' ছেলেটি হর্ষবর্ধনের মুখের দিকে চায়,—'আমাকে কি আটাশ বছরের মত দেখতে? ঠিক বলুন তো? ভালো করে তাকিয়ে বলুন।'

হর্ষবর্ধন দারুণ ঘাড় নাড়েন—'মোটেই না। একদম না। বরং

আট বছরের মতন অনেকটা। আমাদের আসামের অনেক আট বছরের ছেলে তোমার মতন দেখতে হয়।'

'সেইজন্যেই তো মাসখানেক থেকে, মানে যেদিন গোরার কাছে শুনেছি সেদিন থেকেই দাড়ি কামাতে লেগেছি। কিন্তু কই, এতদিনেও দাড়ি বেরুল না তো।' হতাশভাবে বার-দুয়েক সে গালে হাত বুলোয়—'দাড়ি বেরুলেও না-হয় আটাশ বলে নিজেকে চালাতে পারতাম। কিংবা যদি আগে থেকে বুদ্ধি করে আসামে জন্মাতাম তাহলেও হতে পারত বরং। আপনি বললেন না যে আট বছরের ছেলেও সেখানে প্রায় ডবল হয় দেখতে—'

গোবর্ধন বলে,—'নিশ্চয়! আবার আট বছরেই অনেকের দাড়ি বেরিয়ে গেছে।'

আসামী বালকের সৌভাগ্যে ছেলেটি ঈর্ষান্বিত হয়,—'তাহলে এমনিতেই তো আমি আটাশ বছরের দেখতে হতুম। আর দাড়িও হৃত সেই সঙ্গে। ইটালি যাবার তবে বাধা ছিল কী?'

হর্ষবর্ধন বলেন,—'কিছু না।'

'মাসখানেকের জন্যে আসামে চেঞ্জে গেলেও তো হয়। হয় না?'

'হ্যাঁ, সেখানে গিয়ে খুব কষে আসামী দুধ ঘি খেলেও তোমার চেহারা ডবল হয়ে যাবে এ কথা আমি হলপ করে বলতে পারি। তবে দাড়ির কথাটা—'

গোবর্ধন দাদার বাক্য সমাপ্ত করে দেয়,—'দাড়ি গজায় জল-বায়ুর গুণে। চীন দেশে যে একেবারেই হয় না, তার কী করছি বল? এ তো মিথ্যে কথা নয়, নিজের চোখে দেখলাম কাল সকালে—বাসে আসতে আসতে।'

'আচ্ছা, আমি যদি আসামে গিয়ে দাড়িতে জলপটি লাগিয়ে রাখি আর দিনরাত পাখার হাওয়া লাগাই তাহলেও কি এক মাসে আমার দাড়ি হবে না?' সে গোবর্ধনকে শুধোয় এবার।

'হবে না ? আলবৎ হবে। হতেই হবে দাড়িকে—জল হাওয়ার গুণ তবে কী ?' গোবর্ধন জোরের সঙ্গে জবাব দেয়।

'তবে তাই যাই, বাবাকে জিজ্ঞাসা করি গে। আসামে যেতে হলে বাবার পারমিশন নিতে হবে। আপনাদের সঙ্গে যদি যেতে দেয় তো হয়।' ছেলেটি চলে যায়।

'ইটালি কোথায় দাদা ?' গোবর্ধন ভয়ে-ভয়ে দাদাকে প্রশ্ন করে।

'কোথায় আবার ? বিলেতে।' হর্ষবর্ধনের বিরক্তি তখনও অটুট রয়েছে।

'বিলেত আর ইটালি কি এক জায়গা নাকি ?'

'নিশ্চয় ! খাপরার ইংরিজি যেমন টালি, বিলেতের ইংরিজি তেমনি ইটালি।'

'এইবার বুঝেছি।' গোবর্ধন মাথা নাড়ে,—'নেপালির ইংরেজি যেমন ভুটানি।'

হর্ষবর্ধন কিঞ্চিৎ প্রীত হন,—'কিন্তু সে তো কথা নয়, আমি ভাবছি কি—'

গোবর্ধন দুর্ভাবিত দাদার দুশ্চিন্তার অংশ নেবার ব্যগ্রতা ব্যক্ত করে,—'বল না দাদা, কী ভাবছ তুমি ?'

'ভাবছি যে আমাদের বয়স কিন্তু আটাশ থেকে আটাশির মধ্যে।'

গোবর্ধন তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে—তার বুদ্ধির সমস্ত দরজা-জানলা যেন একযোগে অকস্মাৎ খুলে যায়,—'হ্যাঁ ! ভারি চমৎকার হয় দাদা। এইজন্যেই তো তোমাকে দাদা বলি।' তারপর একটু দম নেয়,—'চোখেই দেখিনি উড়োজাহাজ। সেই উড়োজাহাজে চড়াও হয়ে—বলে জোলো জাহাজেই চাপি নি তো উড়োজাহাজ।'

'তুই আছিস কেবল চাপবার তালে। আমাকে কত দিক

ভাবতে হয়। ছেলেমানুষ সঙ্গে নিয়ে বিদেশে এসেছি, তার উপরে বিদেশ থেকে আরো বিদেশে—। আটাশ হলে কি হয়, তুই ওই ছোঁড়াটার চেয়েও অপোগণ্ড। উড়োজাহাজ উলটে গিয়ে যদি আকাশ থেকে ঝপাৎ করে পড়ে যাস তখন কি আর খুঁজে পাওয়া যাবে তোকে ? হাওয়ার চোটে কোন্ দেশে কোথায় যে উড়ে যাবি কে জানে ! আকাশে অত উঁচুতে হাওয়ার জোর কি কম নাকি ?'

'পড়ব কেন ? আমি তোমাকে আঁকড়ে ধরে থাকবো যে !'

'হ্যাঁ, তাহলে হয়। আমি ভারি আছি, সহজে আমাকে কোনো কিছুতেই ওলটাতে পারবে না।' দাদা বাতলান : 'আর আমার মতন নোঙরে আটকে থাকলে তোর ভরাডুবি হবার কোনো ভয় নেই !'

'তবে আর ইটালি যেতে বাধা কী আমাদের ? বয়েস তো আছেই, তাছাড়া দাড়িও রয়েছে—উড়োজাহাজে চাপতে হলে যা যা চাই।'

'আমি তাই ভাবছিলুম। এ-দুদিনে কলকাতা তো বহুৎ দেখলাম, এখন বিলেতটা বরং দেখে আসা যাক।' হর্ষবর্ধন মাথা চালেন,—'বিলেতের হালচাল আবার কী রকম কে জানে !'

'হ্যাঁ, উড়োজাহাজে চাপতে পারলে মোটরে না চাপলেও চলে যায়, ততটা আর দুঃখ থাকে না। তাই চল দাদা, বিজ্ঞাপনের ঠিকানাটা কারু কাছে বাৎলে নিয়ে এক্ষুনি আমরা বেরিয়ে পড়ি। নইলে আর সবাই আমাদের আগে গিয়ে ভিড় জমিয়ে ফেলবে। দেশে দাড়িওলার তো খাঁকতি নেই !'

'আচ্ছা আমরা যে ইটালি যাব, সেই কথাই যে আমি ভাবছিলাম তা কি তুই জানতে পেরেছিলিস্ ?' হর্ষবর্ধন মুরুব্বির মত একখানা চাল দেন।

'একদম না।' সরল গোবর্ধনের সংক্ষিপ্ত উত্তর।

'আমি কিন্তু জানতে পেরেছিলাম। খবর-কাগজ পড়ে নয়, যেদিন বাড়ি থেকে পা বাড়িয়েছি তখনই জেনেছিলাম যে আমাদের ইটালি যেতে হবে। জানিস ?'

গোবর্ধনের সংশয় হয়, প্রায় প্রতিবাদ করে ফেলে আর কি, কিন্তু উড়োজাহাজে চাপবার লোভে সে চেপে যায়। গোঁফে চাড়া দেন হর্ষবর্ধন,—'বাড়ি থেকে বেরুবার মুখেই পথের ওপর একখানা ইট-এর ওপর একটা টালি পড়ে আছে দেখতে পেয়েছিলাম তখনই আমি টের পেয়েছি যে ইটালি যেতে হবে আমাদের। ছাখ, তোর চেয়ে কত বেশি জানি আমি, দেখলি তো ?'

গোবর্ধন তার মৌন সম্মতি জানায়, তখন দুই ভাইয়ের মধ্যে আবার প্রবল ভাবের সূত্রপাত হয়।

পাগলা ষাঁড়ের হাত থেকে আত্মরক্ষার একটা উপায় প্রায়ই বাৎলাতেন সনাতন খুড়ো। উপায়টি নির্ঘাৎ তাঁরই যে আবিষ্কার করা তা ঠিক বলা যায় না। আদতে তা এক সুপ্রাচীন দার্শনিক সিদ্ধান্ত। প্রবীন সেই ভূয়োদর্শী নাকি বলে গেছেন, ষাঁড় ক্ষেপে তাড়া করে এলে পালিয়ো না, কি মূর্ছিত হয়ে পড়ো না। বিচলিত হবার কিছু নেই, সামনে দাঁড়িয়ে ষাঁড়কে তাড়া করবারও দরকার করে না। অটলভাবে তার সামনে দাঁড়িয়ে তাকে বক দেখাবে। তাহলেই, অবশ্য কি হেতু বলা কঠিন—তৎক্ষণাৎ লজ্জিত হয়ে ফিরে যাবে ষাঁড়। অধোবদনে চলে যাবে।

অর্থাৎ যদি কথোপকথনের ছলে তত্ত্বটা উদ্ঘাটিত করতে যাই তাহলে এই দাঁড়ায় :

পাগলা ষাঁড়ের হাত থেকে বাঁচতে চাও ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

কেন, সে উপায় তো তোমার হাতেই রয়েছে—নিজের হাতেই!

তবু সনাতন কাল থেকেই, সব্বাই, ষাঁড়ের দ্বারা তাড়িত হয়ে, হাতের চেয়ে পায়ের ওপরেই বেশী নির্ভর করে এসেছে। হর্ষবর্ধনরাও। কিন্তু আজ যে কী দুর্মতি হলো শ্রীহর্ষের! শ্রীমান গোবর্ধনের প্ররোচনায় সে সনাতন মতে আস্থাবান হয়ে যা করে বসল তা আর কহতব্য নয়। ষড়দর্শন বা ষাঁড়দর্শনে তার কী ব্যাখ্যা দেয় জানি না, কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শনে তা ভারী রোমাঞ্চকর!

গোড়া থেকেই তাহলে বলা যাক ব্যাপারটা :

কে নাকি কোথায় উড়িয়ে বিলেত নিয়ে যাচ্ছে, তার খবর পেয়ে জবর করে জানবার জন্যে দু' ভাইয়ে বেরিয়েছিলেন। কিন্তু পাঁজি দেখে বোধহয় যাত্রা করা হয়নি, ফুটপাথে পদক্ষেপ করে কয়েক পা না এগোতেই হর্ষবর্ধন হঠাৎ গোবর্ধনের গায়ে খানিকটা ঢলে পড়েছেন। অনেকটা পদ্মার ঢলুনির মতোই, আশপাশের কারোর তাতে খাড়া থাকবার কথা নয়, তলিয়ে যাবার কথাই। গোবর্ধনকেও রাস্তায় তলাতে হয়েছে!

রাস্তার মাঝখানে এমন করে গায়ে পড়াটা কি ভালো? ধূলো ঝেড়ে তীক্ষ্ণকণ্ঠে কথাটা সে দাদাকে সমঝাতে যাচ্ছে, হেনকালে দেখলে, দাদা ততোধিক রুষ্ট হয়ে আরেক জনের ওপর রীতিমতো চড়াও হয়েছেন!

এ সব কী হচ্ছে মশাই? হর্ষবর্ধন একবারে সপ্তমে।

কিছুই করেনি লোকটা, আম খাচ্ছিলো খালি! আম খাচ্ছিলো আর তার খোসাগুলো ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে এধারে ওধারে ছুঁড়ছিলো। ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত, তারই একটায় পা পড়ে পতনোন্মুখ হর্ষবর্ধন, গোবর্ধনের আনুকূল্যে বা দৈবের কৃপায় এইমাত্র নিজেকে সামলেছেন। পড়তে পড়তে অধঃপতনের হাত থেকে বেঁচে গেছেন কোনো গতিকে।

আম খাচ্ছি। বললে লোকটা। নিশ্চিন্ত মুখে বললে। এবং তেমনি নিরুদ্বেগে আঁটি চুষতে লাগলো।

বাস্তবিক, লোকটার কী দোষ! সে তো খোস মেজাজে আম খাচ্ছে, দোষ কিছু হয়ে থাকে তো খোসার; গোবর্ধনের মনে হলো। আর দোষের কথাই যদি বলো, খোসাই বা কি এমন অপরাধী? তার দাদাও কিছু কম যান না সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে ··। গোবর্ধন ন্যায় বিচারের পক্ষপাতী।

আম খাচ্ছেন তা তো দেখতেই পাচ্ছি। হর্ষবর্ধন রুখে উঠেছেন, কিন্তু আপনি খাবেন আম, আর আমরা খাবো আছাড়— এ কি রকম?

গোবর্ধন বললো: আমের আচার হলেও না হয় কথা ছিল··· বেড়ে মজা!

আমি তো আপনাদের আছাড় খেতে বলিনি। আপনারা খাচ্ছেন কেন, আমি তো আম খাচ্ছি কেবল। অম্লান বদনে বললে সেই লোকটা।

আছাড় খেতে বলিনি···আম খাচ্ছেন, তো মাথা কিনেছেন আর কি! বললেন হর্ষবর্ধন: আম যেন আমরা খাইনি কখনো! কেউ যেন আর খায় না!

আম খাচ্ছেন খান কিন্তু আমাদের মাথা খাচ্ছেন কেন? আপনার আম খাবার ফলে আমার দাদা যদি কারোর ঘাড়ে গিয়ে পড়ে সে কি আর আস্ত থাকবে? আমার দাদাকে দেখেছেন? গোবর্ধন তার দেদীপ্যমান দাদার দিকে আম্রভোজীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলো—বলুন, তার হাড়গোড় ঘাড় মাথা সব থেঁতলে যাবে না?

অমন বৃহদাকার হর্ষবর্ধনের দৃষ্টান্তেও ভদ্রলোক বিচলিত হলো না, আরেকটা আমের খোসা ছাড়াতে শুরু করলো। আর ছাড়াতে

ছাড়াতে বললে : কি করবো বলুন, আমরা তো খোসা সমেত খাই না। আপনারা খান কিনা জানা নেই, তবে গরুতে খায়, আমি জানি। বলে সে খোসা ছাড়াতে আর ছড়াতে থাকল।

তাহলে গরু আর আপনি একসঙ্গে খেতে বসলেই ভালো হয় না কি? বললেন হর্ষবর্ধন। তাই বসবেন, তুই ভাইয়ে এবার থেকে।

আপনি খাবেন আম আর আমরা খাবো আমের আছাড় এটা কি ভালো? দেখতে একটু দৃষ্টিকটু হয় না কি? গোবর্ধন উৎসাহিত হয়ে উঠেছে ততক্ষণে : আমের আচার হলেও না হয় কথা ছিলো।

আম্রনিষ্ঠকে পরিত্যাগ করে কয়েক পা এগোতে না এগোতেই আবার এক অনিষ্ট! পুনশ্চ এক ফ্যাচাং—আরেক বিচ্ছিরি ব্যাপার।

ফুটপাথের একটা আলগা পাথরের তলায় জল জমানো ছিলো, হর্ষবর্ধনের পায়ের চাপে একধার থেকে তীরবেগে বেরিয়ে এসে গোবর্ধনকে লাঞ্ছিত করেছে। তার জামা-কাপড় একৃশা।

আরে আরে! পায়ের তলা থেকে পিচকিরি মারে কে রে! আবার কি দোলের রংবাহারের দিন এলো নাকি! হর্ষবর্ধন যেমন বিস্মিত তেমনি পুলকিত।

এই ভুঁইফোঁড় কাদা কোত্থেকে এলো, দাদা? গোবর্ধন কিন্তু ততো খুশী নয় : ইস্! কাপড়-জামার কোথাও ফাঁক রাখে নি!

কাদা কিরে, হাঁদা? খাসা মানিয়েছে তোকে। হর্ষবর্ধন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছেন।—তোর চেহারায় খোলতাই হয়েছে খুব।

বলতে বলতে যেই না তিনি পা তুলতে গেছেন,তাঁর পায়ের চাপ থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে পাথরটার অন্য ধার থেকে আরেক দফা বেরিয়ে এসে তাঁর দফারফা করে দেয়; তাঁকেও বেশ মানানসই করে তোলে।

বাঃ বাঃ, তোফা! জোড় মিলেছে বটে! গোবর্ধন দেখে আর চোখ ফেরাতে পারে না—একেই বলে সর্বজীবে সমদৃষ্টি। এতক্ষণে সে আরাম পায়। ভগবান আছেন বৈ কি! আলবৎ!

কাপড়ের চেহারা বদলানোর সাথে সাথে হর্ষবর্ধনের মুখের চেহারাও বদলেছে, তিনি বললেন ছ্যাঃ! এতবড়ো ফুটপাথ, কিন্তু এর কোথাও কি ছাই পা ফেলবার যো আছে? রাস্তায় তো গাড়ী মোটর গিসগিস—নেমেছো কি খরচ! কিন্তু ফুটপাথেই নিস্তার কই? এমন বড়ো বড়ো রাস্তা, কিন্তু পথ কোথায়?

আমি তো রস্তোর কোনো দোষ দেখি না। এক যাত্রায় পৃথক ফল হলে কি ভালো হতো নাকি? একজন মোটরে চেপে যাবে আর একজন মোটর চাপা পড়বে এটা কি রকম? হনুমানের ভাগ্যে যা, জাম্ববানের ভাগ্যেও যদি তাই হয় তাহলেই আমি খুশি।

বলেছে সমদর্শী গোবর্ধন।

তা তো খুশী হলি, হবি না কেন? এখন একটা ডাইং ক্লিনিং দেখ দেখি, এগুলো কাচাবার ব্যবস্থা করা যাক। দূরাদৃষ্টের পরেই দাদার দূরদৃষ্টি খুলতে থাকে।

কিন্তু খুব বেশি দূর দৃষ্টিনিক্ষেপ করতে হলো না। ডাইং ক্লিনিং অদূরেই ছিলো। নাকের ওপরেই একেবারে। এবং বলতে কি, ডাইং ক্লিনিং ওলারাই, তাঁর মুখের কথা না খসতেই তাঁকে অভ্যর্থনা করলো: 'এই যে—এই যে, আপনার সামনেই আমরা আছি! আপনাদের জন্যই! চলে আসুন, কোনো দ্বিধা না করে চলে আসুন!'

অদ্ভূত যোগাযোগ তো! যেখানে বাঘ সেখানেই সন্ধ্যে। যেখানে দাঙ্গা সেখানেই দারোগা! এমনটি তো দেখা যায় না। হর্ষবর্ধন বিস্ময়ে বিষম খান।

যা বলেছেন মশাই! অদ্ভুত যোগাযোগ। ওই পাথরের ওপরেই আমাদের এই ডাইং ক্লিনিং নির্ভর করছে, সত্যি বলতে কি, কতো জায়গায় যে দোকান খুলেছিলাম, কিসসু হয়নি। কবার যে খদ্দেরের কাপড়-চোপড় সব মেরে দিয়ে পাত্তাড়ি গোটাতে হলো, তবু মশাই এই উটকো কপাল খুললো না। লোকে বলতো, পাথর

চাপা কপাল। সে যে ওই ফুটপাথের পাথর, তা কে জানতো। অবশেষে, এই পাড়ায় এসে এই পাথর পেলাম, আর প্রাণও পেয়েছি। এখন দিনের মধ্যে কাজ কেবল ওই পাথরটার তলায় ঘণ্টায় ঘণ্টায় জল ঢালা। জল ঢেলে কাদা জমিয়ে রাখা। ব্যস্! এও একরকমের পাথর পুজো, কি বলেন? এখানকার ইতর-ভদ্রেরও গুণ গাইতে হয় অবশ্যি! সকলেরই বেশ উঁচু নজর! নীচের দিকে দৃষ্টি নেই কারো—আপনাদেরও সেটা আছে, সে কথাও বলতে হয় বই কি!

বক্তৃতা শুনে গোবর্ধন তো তাজ্জব আর হর্ষবর্ধন একেবারে পাথর। আরেকখানা পাথর বলতে গেলে!

ব্যবসাবুদ্ধি কাকে বলে, বোঝ!—ভালো করে বোঝ গোবরা!

পাথরটাকে পেরিয়ে আর একটু এগোতেই, এবারে এলো সেই ষাঁড়। এলো ঠিক বলা যায় না, সমস্ত ফুটপাথ জুড়ে তেমনি শুয়ে থাকলো—হর্ষবর্ধনরাই তার কাছাকাছি এলেন।

ফুটপাথ ত্যাগ করে পথে নামাও দায়। ট্রাম, বাস, মিলিটারী ভ্যান ভ্যাঁ-ভ্যাঁ করে—কিংবা না করেই ছুটছে আর এদিকে ফুটপাথে ষাঁড় বাবাজীবন এক ফুট পথও ফাঁক রাখেন নি। হর্ষবর্ধন সকাতরে বললেন, পথ ছাড়ো বাপু! গোবর্ধন সংস্কৃত করে জানালো, পথং দেহি। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। সেই বিরাট দেহের নড়াচড়ার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না।

অগত্যা গোবর্ধনচন্দ্র, 'ডিঙিয়েই যাওয়া যাক'—বলে যেই না ডিঙি মেরে সেই ষাঁড়ের ওপর দিয়ে দাদাকে পথ দেখাতে গেছে, কেন, তার কী খটকা লাগলো বলা ভার, ষাঁড়টাও অমনি উঠে পড়েছে এক ঝটকায়। নিজের ওপরে অপর কারও লম্ফঝম্ফ তার তেমন ভালো ঠেকলো না বলেই বোধহয়।

এদিকে, পাহাড় ডিঙোবার মুখে আটকে গিয়ে আঠার মতো

ষাঁড়ের পিঠে লেপটে রইলো গোবর্ধন। ষাঁড়টা লেজের ঝাপটা মারলে, কিন্তু মাছি নয় তো যে উড়ে যাবে, এবং মাছি, এমন কি একটা দাঁড়কাকের চেয়েও বস্তুটাকে বেশী ভারী বলে তার বোধ হতে লাগলো। এই দুর্যোগে হৃষ্টপুষ্ট হর্ষবর্ধনকে সে দেখতে পেলো সামনে। দেখবামাত্র তার ধারণা হলো, তরে পিঠের ওপরে যে দুর্ভোগ চেপে বসেছে, সে ও ছাড়া আর কেউ নয়। গরুর আর কতো বুদ্ধি হবে ? আর ষাঁড় তো গরুরই নামান্তর—বলতে কি !

অতএব, বোঝাকে গুঁতিয়ে পিঠ হালকা করার জন্য হেলেদুলে হর্ষবর্ধনের দিকে সে এগোতে লাগলো।

ষাঁড়ের পিঠ থেকে চেঁচিয়ে উঠলো গোবরা : বক দাদা, বক !

'বকবো ? বকবো কিরে ? বকে কী হবে ? বকলে কি ও শুনবে ? না, বুঝতে পারবে ? বললেন হর্ষবর্ধন : গরুরা কি বাংলা জানে ?

আহা, বক্‌তে কি বলেছি ? সে-বকা নয় গো, সনাতন খুড়োর সেই বক !—সেই বকের কথাই বলছি তো !

গোবর্ধন খোলসা করে দিতেই হর্ষবর্ধনের তখন মনে পড়ে যায়। '—ওঃ, সেই বক। বক দেখানোর বক ? তাই বল্ !'

হর্ষবর্ধনের মন তখন বলছে, পালাও। ষাঁড়ের সামনে দাঁড়িয়ো না। কিন্তু মন পালাও বললে কি হবে, পা নেবার তাঁর ইচ্ছেই নেই আদপে। পায়ের দিকেই না, তাঁর সমস্ত মন তখন হাতের দিকে, নিজের কনুয়ের তাঁবে, ষাঁড়টাকে এক হাত দেখে নেবার মৎলব তাঁর।

ত্রিভঙ্গিম ঠামে দাঁড়িয়ে যণ্ডেশ্বরকে তিনি বক দেখিয়েছেন !

তিনিও বক দেখিয়েছেন আর ষাঁড়ও গুঁতো দেখিয়েছে।

কর্ণের যেমন অক্ষয় কবচ কুণ্ডল নিয়ে জন্ম, হর্ষবর্ধনও তেমনি ভুঁড়ি নিয়ে জন্মেছিলেন বলেই গুজব। ভাগ্যিস ষাঁড়ের গুঁতো জন্মগত সেই পেল্লায় ভুঁড়ির ওপর পড়েছিলো তাই রক্ষে, তা না

হলে কোথাকার ভুঁড়ি কোথায় গড়াত বলা যায় না, হর্ষবর্ধন মারা পড়লেন না। তিনি শুধু চিৎপাত হয়ে পড়লেন। আর সেই সংঘর্ষের প্রবল আলোড়নে গোবর্ধন ষাঁড়ের পীঠস্থান থেকে খসে ফুটপাথে পড়লো।

হর্ষবর্ধন ভুমিশয্যা থেকে উঠে ভুঁড়িতে হাত বোলাতে থাকেন। '—তুই বক দেখাতে বললি। দেখিয়ে কী হোলা ভাখ।'

'ওমা তাইত! গর্ত হয়ে গেছে যে!' গোবরা আঁতকে ওঠে।

'আহা! এটা কেন রে! এটা তো আমার নাই কুণ্ডল!' বলে, কুণ্ডল বাদ দিয়ে ভুঁড়ির অক্ষয় কবচে ছড়ে যাওয়ার দাগটা দেখাতে যান—'না তুই বক দেখাতে বলিস না আমার ভুঁড়ি চোট খায়।'

'সামনে কেন, ষাঁড়ের পেছনে বক দেখাবে তো!'

'লেজের দিকে দেখালে কি দেখতে পায় ষাঁড়? পেছনে কি তার চোখ আছে?' হর্ষবর্ধন অবাক হয়েছেন। '—ষাঁড়েদের তো পশ্চাদদৃষ্টি নেই?'

'তেমনি লেজের দিকে শিংও তো নেই!' গোবর্ধন দেখায়।

'যাক, যা হবার হয়েছে। সনাতন খুড়োর কথাই যখন উঠলো তখন চ, ওর খুরিটা কিনে নিয়ে যাই।'

'সনাতন খুড়োর খুড়ি? সে তো কবে মারা গেছে গো!'

'আহা, সে খুড়ি কেন? তার মাখম কলের জন্যে কলকাতা থেকে একটা খুরি কিনে নিয়ে যেতে বলেছিল না? সাহেবি দোকানে পাওয়া যায় নাকি খুরিটা···' হর্ষবর্ধন গজরান—এখন সেই সাহেবি দোকানটা কোথায় কে জানে!'

'খুড়োর আর কী, বলেই খালাস!' গোবর্ধন গজরায়—'এখন খুড়ি খুড়ি করে আমরা ঘুরে মরি সারা কলকাতা!'

হর্ষবর্ধন মুখভঙ্গী করেন—'কাকেই বা জিজ্ঞাসা করি—কেই বা জানে!'

ওদের পাশ দিয়ে তখন এক মহিলা যাচ্ছিলেন গোবর্ধন তার দিকে দাদার দৃষ্টি আকর্ষণ করে,—'ওকে জিজ্ঞাসা করলে হয় না? মেয়েদের অজানা কী আছে?'

প্রস্তাবটা হৃদয়গ্রাহী হয় হর্ষবর্ধনের। 'তুই জিজ্ঞাসা কর।'

'তুমিই কর দাদা।' গোবর্ধনের সাহসের অভাব।

'কী ভীতু রে!' তিনি ফিসফিস করেন—'কর না তুই, গোবরা! ভয় কীসের?'

'উঁহু!' গোবর্ধন ঘাড় নাড়ে।

অগত্যা হর্ষবর্ধনকেই মরিয়া হতে হয়। অনেকবার হাত কচলে অবশেষে তিনি বলেই ফেলেন—'দেখুন, আমরা একটা মুস্কিলে পড়েছি'—সমস্যাটা তিনি প্রকাশ করেন মহিলাটির কাছে।

মহিলাটি জবাব দেন—'আপনারা হল অ্যাণ্ডারসনের দোকানে যান না কেন? এই পথ ধরে আর কিছুদূর গেলেই তো—'

এই বলে তিনি যথাস্থানের নির্দেশ দিয়ে মোড় ঘোরেন এলগিন রোডের কাছটায়।

পার্ক ষ্ট্রীট বরাবর পৌঁছে তাঁরা এক মুটের কাছে হল অ্যাণ্ডারসনের খবর জানতে চান। গোবর্ধনই বাতলেছিল দাদাকে—মুটেরা তো মোট ঘাড়ে করে কলকাতার সব জায়গা ঘোরে। মোটের ওপর সব কিছুই ওদের জানা থাকার কথা।

—'হলন্দর-সনকো দুকান এহি হ্যায় বাবুজি।'

দেখিয়ে দিয়ে চলে যায় মুটিয়া।

বাড়িটার আপাদমস্তক লক্ষ্য করে হর্ষবর্ধন ঘাড় নাড়েন,—'হ্যাঁ, এই দোকানই বটে। কী বলিস গোবরা?'

'ঠিক। সনাতন খুড়ো যেমনটি বলেছিল মিলছে তার সঙ্গে হুবহু।' গোবর্ধনও ঘাড় নাড়তে কার্পণ্য করে না।

'পড়্ তো! পড়ে ছাখ্ তো, কী লিখেছে বড়-বড় ইংরিজিতে।'

গোবর্ধন বানান করে পড়ে মনে মনে।. তারপর বলে—'বুঝেছ দাদা, এরা সব হল্যাণ্ডের। হল্যাণ্ড বলে একটা দেশ আছে জান তো? হল্যাণ্ড, ইংল্যাণ্ড, ইসকট্‌ল্যাণ্ড—'

'যা যাঃ! তোকে আর ভূগোল ফলাতে হবে না। ভারি তো বিদ্যে! তায় আবার ইসকট্‌ল্যাণ্ড!' হর্ষবর্ধন ধমকে দ্যান—'কী পড়লি তাই বল।'

'ঐ কথাই। হল্যাণ্ড আর তার ছেলেপুলে।' গোবর্ধন ব্যাখ্যা করতে চায়। —'ঐ তো পষ্টই লিখে দিয়েছে। পড়েই ছাখ না! হল্যাণ্ড—অ্যাণ্ড মানে তো এবং? অ্যাণ্ড হার—হার মানে তো তার? হিজ—হার মনে নেই? অ্যাণ্ড হার সন—মানে তার ছেলেপুলে।'

হর্ষবর্ধনের চোখ এবার স্বভাবতই কপালে ওঠে। অ্যাঁ? এত বড় কথা লিখে দিয়েছে! কলকাতায় এসে কারবার করছে কিনা খোদ্ হল্যাণ্ড? সঙ্গে আবার ছেলেপুলে নিয়ে? অবাক কাণ্ড!

হর্ষবর্ধনের চোখ ঘামাতে হয়, বাধ্য হয়েই! চোখ খাটাতে নিজেকে রাজি করা ওঁর পক্ষে সহজ নয়, কেননা একটু খাটালেই তাঁর চোখ টাটায়—চল্লিশের পর থেকেই এমনি। যাই হোক, বদন ব্যাদান করে আকর্ণ চক্ষুবিস্তার করার প্রয়াস পান তিনি।

নাঃ, তেমন ভয়াবহ কিছু নয়। ক্রমশঃ তাঁর হাঁ বুজে আসে—চোখও সংক্ষিপ্ত হয়।

'হার কই? হার?' উষ্ণ হয়ে ওঠেন তিনি—'এইচ্ গেল কোথায়? হার সনের এইচ,—শুনি একবার?' গোবরাকে তাঁর প্রহার করার ইচ্ছে হয়।

'পড়ে গেছে।' গোবর্ধন আমতা আমতা করে—'পড়ে যায় না কি?'

'তোর মাথা! পড়ে গেলেই হল? তক্ষুনি তুলে ধরে আবার

লাগিয়ে দিত না তাহলে ?' হর্ষবর্ধন গোঁফে চাড়া দেন—'ও-কথাই নয়। কথাটা হচ্ছে—হুম্!'

দাদার আবিষ্কার অবগত জন্যে উদগ্রীব হয় গোবর্ধন।

'কথাই হচ্ছে, কিছু না—হলধর আর ইন্দ্রসেন।' বলে গোঁফের ডগায় তিনি হস্তক্ষেপ করেন এবার।

গোবর্ধন অবাক হয়ে যায়—'অতবড় লম্বাচৌড়া কথাটা হয়ে গেল হলধর আর ইন্দ্রসেন!'

'হবে না কেন ?' হর্ষবর্ধন বলেন, 'ইংরিজিতে বানান করতে গেলে তাই তো হবে। কলকাতা কেন ক্যালকাটা হয় তবে? ব্রহ্মদেশ কেন বার্মা হয়ে যায়? গঙ্গা গ্যাঞ্জেস? ইংরিজিতে আমার নাম বানান করে ছাখ্ তাহলেই টের পাবি। করে ছাখ্!'

সে দুশ্চেষ্টা গোবর্ধন করে না—দুঃসাধ্য কাজে স্বভাবতই সে পরাঙ্মুখ এবং পরামুখাপেক্ষী।

অগত্যা হর্ষবর্ধনই প্রয়াস পান—'আমার নামের বানান বড় সোজা না রে! অনেক মাথা ঘামিয়ে তবে বের করেছি। প্রথমে ধর, এইচ—ও—আর—এস—ই,—কী হল? হর্স। তারপরে হবে বি—আই—আর—ডি,—কী হল? বার্ড। তারপর ও—এন, —অন। হর্স-বার্ড-অন! হুম্।'

গোবর্ধনের বিস্ময় ধরে না। ওর দাদার প্রতিভা আছে, সন্দেহ কি!

'মানেও কত বদলে গেল ছাখ!' নিজের অর্থ নিজেকেই তাঁর খোলসা করতে হয়। 'কোথায় আমি হর্ষবর্ধন, না কোথায় আমি ঘোড়ার ওপরে পাখি! কিংবা পাখির ওপরে ঘোড়া? ও একই কথা!'

মানেটা মনঃপূত হয় না গোবরার। ঘোড়ার সঙ্গে তার দাদার

তুলনা—ছ্যাঃ। দাদাকে ইতর প্রাণীর আসন দান করতে কুণ্ঠা হয় তার। অশ্বের চেয়ে বড় স্থান সে দিতে চায় দাদাকে। অশ্বতর বললে বলা যায় বরং!

সে বিরক্তি প্রকাশ করে—'কিন্তু যাই বল দাদা! ইংরিজি করলে নামের আর কোন পদার্থ থাকে না! হর্ষ কথাটার বাংলা মানে হল আনন্দ, আর ইংরিজি মানে কিনা ঘোড়া! ঘোড়ায় আর আনন্দে কত তফাত! ভাব তো একবার!'

গোবর্ধন একটা হাত আকাশে, আর একটা হাত পাতালে পাঠিয়ে যেন ব্যবধানটাকে পরিস্ফুট করতে চায়।

'কিছু তফাত নেই! ঘোড়ার পিঠে চেপেছিস কখনো? চাপলেই বুঝবি।' হর্ষবর্ধনের হর্ষধ্বনি হয়—'ঘোড়া আর আনন্দ এক। একেবারে গায় গায় মিল।'

'হ্যাঁ, যদি পড়ে না যাও তবেই!' গোবর্ধন গোঁ ছাড়ে না।

'তোর যেমন কথা। আমি বুঝি পড়ে যাই কখনো? দেখেছে কেউ? তা আর বলতে হয় না।' ঘোড়ার সঙ্গে নিরানন্দের কোন ঘনিষ্ঠতা তাঁর জীবনে কখনো ঘটেছিল কি না হর্ষবর্ধন সে কথা ভুলে থাকতেই চান। '—কিন্তু আমার ছবিটা কেমন হয় বল্ দেখি? একটা ঘোড়া, তার পিঠের ওপর একটা পাখি। কিংবা ধর্ একটা পাখি, তার পিঠে একটা ঘোড়া—সে যাই হোক। কেমন, খাসা হয় না? চমৎকার!'

নিজের ছবির কল্পনায় নিজেই তিনি মুহ্যমান হয়ে পড়েন।

গোবর্ধন তবু গোমড়া হয়ে থাকে—'এর চেয়ে তোমার সেই ছবিটাই ছিল ভাল।'

'কোন্ ছবি?'

'সেই যে সেদিন একটা লোক মইয়ে উঠে আমাদের বাড়ির দেয়ালে সাঁটছিল—?'

'সেই কোন্ রাজা মহারাজার ছবি!' ভ্রূকুঞ্চিত করে বিস্মৃতির পঙ্কোদ্ধার করেন হর্ষবর্ধন—'কী কিং যেন! না রে?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই কিংকং না কী!' গোবর্ধন সায় দেয়। —'কোথাকার রাজা কে জানে!'

'এবার মনে পড়েছে।' হর্ষবর্ধন বলেন—'ওঃ! আমার সেই আরেক প্রতিমূর্তি—যা দেয়াল থেকে খুলে বাঁধিয়ে দেশে নিয়ে গিয়ে তোর বৌদিকে উপহার দেব বলেছিলাম? হ্যাঁ, সে-ছবি তো ভালই—' হর্ষবর্ধন কথাটাকে সজোরে শেষ করেন—'কিন্তু আমার এ-ছবিই বা এমন মন্দ কী!'

'কী জানি!' গোবরা ঘাড় নাড়ে—'তোমার এই চারপেয়ে ছবি বৌদির পছন্দ হলে হয়!'

হর্ষবর্ধন খাপ্পা হয়ে ওঠেন—'হ্যাঃ, তাই নিয়েই আমি মাথা ঘামাচ্ছি কিনা! তোর বৌদির মনের মত হবার জন্যে হাত পা সব একে-একে ছেঁটে ফেলে দিতে হবে আমায়! বললেই হোলো আর কি!'

ঘোড়ার কথা ছেড়ে গোড়ার কথায় ফিরে আসে গোবর্ধন। 'তা ইন্দ্রসেন না-হয় হল। কিন্তু 'ধর' কই? 'ধর'? হলধরের 'ধর'?'

'চল চল, আর বকতে হবে না তোকে। ধড়ফড় করছিস কেন, 'হল' তো ঐ রয়েছে! মাথা থাকলেই হল, 'ধড়' নিয়ে কি করবি?'

হর্ষবর্ধনের পদযাত্রা শুরু হয়। গোবর্ধন আর বাকব্যয় করে না। দাদার সাথে সাথে এগিয়ে যায়।

দোকানের ভেতরে ঢুকতেই এক বাঙালী কর্মচারী এগিয়ে আসেন—'কী চাই আপনার?'

'আমার কিছু চাই না।' হর্ষবর্ধন বলেন—'আমাদের দেশের

সনাতনখুড়ো—তারই একটা জিনিস চাই, তার জন্যেই কিনতে আসা।'

'কী জিনিস বলুন।'

'আপনাদের এই হলধরের দোকান থেকেই হবে বোধ হয়, অনেকদিন আগে একটা মাখন তোলার কল তিনি কিনে নিয়ে গেছলেন। আমাদের সনাতনখুড়ো। সেই কলের, মশাই, একটা খুরি গেছে হারিয়ে। সেই কলেই লাগানো থাকত সেই খুরি—সেই খুরিটা চাই।'

'মাখন-কলের খুরি? কী রকম বুঝিয়ে দিন তো?'

'আমি কি আর দেখতে গেছি? হারিয়েই গেল, তার আর দেখলাম কখন!'

গোবর্ধন যোগ ছায়—'কি রকম আর? এই, খুরি যেমন হয়ে থাকে।' বাকবিতণ্ডা দেখে এক সাহেব সেল্‌স্‌মান এসে দাঁড়ান—'হোয়াট বাবু?'

বহুদিন থেকেই হর্ষবর্ধণের এই বাসনা ছিল নিজের ইংরিজি বিদ্যার বহরটা কোথাও জাহির করেন—এখন অযাচিতভাবেই সেই সুযোগ এসে উপস্থিত হতে তিনি আর কালবিলম্ব করেন না—'ইয়েস সার। ইয়েস—উই ওয়াণ্ট—উই ওয়াণ্ট এ খুরি—'

'খুরি—হোয়াট?'

'ইয়েস, খুরি। খুরি, সার!'

'খুরি? দি স্পেলিং?' সাহেব প্রশ্ন করে।—'স্পেল্ ইট্।'

'হোয়াট সার?' হর্ষবর্ধনের বোধগম্যতার বাইরে পড়ে প্রশ্নটা।

'বানান করতে বলছে।' বাঙালী বুঝিয়ে দেয়।

'ও! বানান? খুরি—খ-য়ে হ্রস্ব-উ—'

'উঁহুঁ! গোবর্ধন বাধা দেয়—'ইংরিজি বানান। বাংলা কি বুঝবে তোমার সাহেব?'

'ও। ইংরিজি? খুরি—কে-এইচ-ইউ-আর আই—।'

'আই—তুমি ঠিক জান? 'ওয়াই'-ও তো হতে পারে?'

গোবর্ধন ফিসফিসায় কানের গোড়ায়। গোড়াতেই গলদটা তার কানে ধরা পড়ে।

'পাগল! 'ওয়াই' হয় কখনো? বি-এল-এ ব্লে, বি-এল-ই ব্লি, বি-এল-আই ব্লাই। তারপর বি-এল ও ব্লো, বি-এল-ইউ ব্লিউ, আর—বি-এল-ওয়াই ব্লোয়াই।'

'তাহলে খুরি করতে তুমি খুরাই করছ যে!'

'তাই নাকি? তাই তো!' হর্ষবর্ধন আকাশ থেকে পড়েন। 'নো সার নট 'আই'—' তিনি তৎক্ষণাৎ 'ভ্রম-সংশোধন।' যোগ করেন—'বাট 'ই'—ওনলি 'ই' সার।'

বানানটা মনে মনে আন্দোলন করে সাহেব বাঙালী কর্মচারীটিকে উদ্দেশ করে বলে—'ব্রিং দি চেম্বাস, বাবু!'

চেম্বার্স আনীত হলে সাহেব পটাপট পাতা উলটে যায়। এবং ক্রমশ সাহেবের কপালে রেখা পড়ে, ভুরু কুঁচকোয়, নাক সিঁটকোয়—সারা মুখ ব্যাঁকা হয়ে আসে শেষটায়; খুরির কিন্তু খোঁজ পাওয়া যায় না।

গোবর্ধন মন্তব্য করে—'বাব্বাঃ! কী মোটা বই একটা। বোধহয় ইংরিজি মহাভারত।'

'মহাভারত নয়, অভিধান।' কেরানীবাবুটি জানান।

'ড্যাম ইওর খুরি।' সাহেব ঝাঁঝিয়ে ওঠে,—'ব্রিং অক্স-ফোর্ড।'

ইতিমধ্যে এক মেম-সেল্‌স্‌ম্যান এসে কি এক জরুরি কথা বলে, সাহেব তার সঙ্গে ডিপার্টমেণ্টের অন্য ধারে চলে যায়। বেয়ারাকে হাঁক দিয়ে যায়—'ইন্‌কো চেম্বারমে লে যাও।'

'বাবা, কী আওয়াজ একখান্!' গোবর্ধনের পিলে চমকায়।

'হবে না কেন? গোরু খায় যে। গোরুর আওয়াজটা কি কম নাকি?—হাম্—'

গো-ডাকের গোড়াতেই দাদার মুখ চেপে ধরে গোবর্ধন। 'করছ কী? ধরে নিয়ে যাবে যে!'

'হুঃ। নিয়ে গেলেই হল!' হর্ষবর্ধন বুক ফোলান—'মাইরি আর কী!'

'ভুল করে গোরু মনে করে ধরতে পারে তো? তখন খেয়ে ফেলতে কতক্ষণ?' সে ভয় দেখায়ঃ 'ওরা গোরু খায়—তা জানো?'

বেয়ারা এসে ওদের ডাকে—'চলিয়ে, চেম্বারমে চলিয়ে।'

সাদর অভ্যর্থনায় হর্ষবর্ধন আপ্যায়িত হয়ে এগিয়ে চলেন।

যেতে যেতে গোবর্ধন কিন্তু কানাঘুসো করে—আশঙ্কা অব্যক্ত রাখা অসম্ভব হয় ওর পক্ষে—'আমাদের অভিধানের মধ্যে নিয়ে ঢুকিয়ে দেবে নাকি দাদা?'

'হ্যাঁঃ! ঢোকালেই হল!' হর্ষবর্ধন ভড়কাবার ছেলে নন—'কেমন করে ঢোকায় দেখাই যাক না একবার। এত বড় মানুষটাকে চেম্বারের মধ্যে ঢুকিয়ে দেবে—অত সোজা না। আমরা কি জলছবি—যে লাগিয়ে দিতেই অভিধানের গায়ে সেঁটে যাব অমনি?'

ভাইকে অভয় দেবার জন্যে, গটমট করে চলতে চলতেই তাঁকে বুকের ছাতি ফোলাতে হয় অতি কষ্টে।

ওঁদের দুজনকে এক জায়গায় নিয়ে গিয়ে বসিয়ে ছায় বেয়ারা—'আভি বড়া সাহাব চেম্বারমে বাত করতেঁ হেঁ। আপলোগ হিঁয়া বৈঠিয়ে। কল হোনে সে হাম তুরন্ত্ লে যায়েঙ্গে।'

'কলের মধ্যে নিয়ে পিষে ফেলবে না তো দাদা?' গোবর্ধন আবার ঘাবড়ায়।

'হ্যাঃ পিষলেই হল।' অনুচ্চ কণ্ঠে যতটা সম্ভব পরাক্রম প্রকাশ করেন বটে, কিন্তু কলের কথায় উনিও যে বেশ বিকল হয়ে পড়েছেন, ওঁর ভাবান্তর থেকেই সেটা বোঝা যায়।

'হ্যাঃ, পিষলেই হল। আমরা ঢুকতে যাব কেন কলে? আমরা কি ইঁদুর? ইঁদুররাই কেবল বোকার মতন ঢোকে কলের মধ্যে।'

মুখে সাপট দেন বটে, কিন্তু বেয়ারার ভাবভঙ্গী ক্রমশই যেন ওঁর কেমন-কেমন ঠেকে। গোবর্ধনের কাপৌরুষ ওঁর মধ্যেও সঞ্চারিত হতে থাকে। সনাতনখুড়োর খুরির খোঁজ করতে না এলেই যেন ভাল হত, কেবলি ওঁর মনে হয়। মনে মনে সনাতনের মুণ্ডপাত করেন উনি।

এমন সময়ে এক মেমসাহেব বড়-সাহেবের খাসকামরা থেকে বেরিয়ে আসে।

'হোয়াট আর ইউ ডুইং হিয়ার বাবু?'

হর্ষবর্ধন তটস্থ হয়ে ওঠেন,—'ইয়েস সার।'

'ডোণ্ট সার মি। সে—ম্যাড্যাম।'

'ইয়েস সার।' পুনরুক্তির কোথায় ত্রুটি ঘটছে হর্ষবর্ধন বুঝতে পারেন না—ভারি বিব্রত হন। মেমটা এবার দাবড়ি দ্যায় —'সে—ম্যাড্যাম।'

—'ইয়েস ডাম।'

—'হু দি ডেভিল ইউ।'

মেমটা বিরক্ত হয়ে চলে যায়। হর্ষবর্ধন হাঁপ ছেড়ে বাঁচেন।

'তুমি ড্যাম বললে কিনা, মেমটা চটে গেল তাইতে' গোবর্ধন উল্লেখ করে।

'হ্যাঁ, আমি ওকে মা বলতে যাই আর কি!' হর্ষবর্ধন ঈষদুষ্ণই হন—'আমার বাবা কি ওকে বিয়ে করতে গেছে সাতপুরুষে!'

'মা কেন ? ম্যা তো। বললেই পারতে!'

'মা-ও যা ম্যা-ও তাই—একই মানে।' হর্ষবর্ধন টীকা করেন—'আমাদের ভাষায় যাকে মা বলি, ওদের ভাষায় তাকেই বলে ম্যা।'

গোবরা আপত্তি করতে যায়, কিন্তু ওর কথায় কান দ্যান না দাদা।

'ইংরিজির তুই কী জানিস ? তুই শেখাবি আমাকে ? আমাকে আর শেখাতে হয় না ইংরিজি।'

'কিন্তু চটে গেল তো মেমটা।' গোবর্ধন তথাপি গোঁয়ার।

'বয়েই গেল আমার! মেয়ে-ইংরেজ দেখে ভয় খাইনে আমি। আমি কি তোর মতন কাপুরুষ?' বীর বিক্রমে ভাইকে বিধ্বস্ত করে দ্যান তিনি।

'ছাগলরাও তো ম্যা বলে। তুমি কি বলতে চাও যে ছাগলরাও তাহলে ইংরেজ?' বেশ গুরু-গম্ভীর মুখেই গোবর্ধনের প্রশ্ন হয়।

'বেড়ালেও তো ম্যাও বলে, তবে কি তুই বলছিস যে বেড়ালরা সব ছাগল?' হর্ষবর্ধনের বিস্ময় ধরে না—'যদি আমার মত অনেক ভাষা তুই জানতিস তাহলে আর এ কথা বলতিস না। ইতর প্রাণীদের ভাষার মধ্যে ওরকম মিল প্রায়ই থাকে। না থেকে পারে না।' ভায়ের বোধোদয়ের জন্যে নিজের পাণ্ডিত্য প্রকাশ করতে দ্বিধা হয় না তাঁর।

অনেক ভাষা না জেনেও ক্ষোভ যায় না গোবর্ধনের। সে খুঁত-খুঁত করে তবুও—'ছাগলের ভাষায় আর ইংরেজের ভাষায় তোমার কিন্তু মিলের চেয়ে গরমিলই বেশি দাদা; ছাগলের ভাষা শিখতে দেরি লাগে না, ইস্কুলে না গেলেও চলে; কিন্তু ইংরেজের ভাষা শেখা কত শক্ত!'

'শক্ত না ছাই! তোর মত ছাগলের কাছেই শক্ত!' হর্ষবর্ধন গোঁফ চুমরে নেন—'আমার কাছে জল!'

এবার গোবর্ধন চটে। বলে বসে—'তাহলে বল দেখি খুরির ইংরিজি?'

'কেন, বানান তো করেছি? কে এইচ ইউ—'

'বানান করা আর ইংরিজি করা এক হল?'

'পারব না নাকি ইংরিজি করতে? পারবনা বুঝি?' হর্ষবর্ধন কথা চিবুতে শুরু করেন—'এমন কী শক্ত কথা শুনি? এক্ষুনি করে দিচ্ছি!' হর্ষবর্ধন স্মৃতির ক্ষেত্র চষে ফেলতে থাকেন—সেই কৃষিকর্মের দাগ পড়তে থাকে তাঁর কপালে। দারুণ পরিশ্রমে তিনি ঘেমে ওঠেন। কপালের রগ ফুলে ওঠে।

গোবর্ধন গুম হয়ে দাদাকে লক্ষ্য করে।

নিতান্তই মুষড়ে এসেছেন, এমন সময় এক আইডিয়া আসে তাঁর মাথায়—ডুবন্ত লোকে যেমনটা কুটো খুঁজে পায়। ডুবন্ত লোকেরাই পায়, পাওয়াই দস্তুর,—ডুবন্তরা আর কুটোরা প্রায় কাছাকাছিই থাকে কিনা! কুটোর জন্যেই তো ডোবা, তাও না পেলে কে আর কষ্ট করে ডুবতে যাবে বলো?

'পেয়েছি। পেয়েছি ইংরিজি।' হঠাৎ লাফিয়ে ওঠেন হর্ষবর্ধন।

'কী, শুনি?' গোবর্ধন অবিশ্বাসের হাসি হাসে।

'পেয়েছি। মানে, আরেকটু হলেই পেয়ে যাই।' হর্ষবর্ধন ব্যক্ত করেন,—'মানুষের পিঠে সেই যে কী হয় বল্ দেখি তুই, তাহলে এক্ষুনি আমি বলে দিচ্ছি।'

বিরাট আবিষ্কারের মুখোমুখি এসে বৈজ্ঞানিকের ভাবভঙ্গী যেমন হয়,—হর্ষবর্ধনের চোখ-মুখের এখন সেই চেহারা—'বল্ না কী হয় পিঠে?'

'পিঠে তো চুল হয় না।' গোবর্ধন ঘাড় চুলকোয়—'কারু-কারু বুকে হতে দেখেছি অবিশ্যি।'

'যা হয় না তাই কি আমি জিজ্ঞেস করেছি?' হুমকি দেয় হর্ষবর্ধন।

'পিঠে তবে কী হয়? শিরদাঁড়া?'

'সে তো হয়েই আছে। হবে কী আবার?' ভারি বিরক্ত হন তিনি—'আহা সেই যে—যা হলে কেটে বাদ দিতে হয়, তবেই মানুষ বাঁচে। প্রায়ই আবার বাঁচে না।'

'কুঁজ নাকি দাদা?'

'তোর মাথা। বাবা কি আর সাধে নাম দিয়েছিল গোবর্ধন। মাথায় কেবল গোবর।'

'কেন, কুঁজই তো হয় পিঠে। কুঁজ ছাড়া আর কী হবে? তুমি কি বলতে চাও তবে গোদ? না গলগণ্ড?'

'আহা, সেই যে সনাতনখুড়োর যা হয়েছিল একবার। জেলার ডাক্তার এসে অপারেশন করল শেষটায়?'

'ও! কার্বাঙ্কল?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ। কার্বাঙ্কল। এইবার পাওয়া গেছে।' হর্ষবর্ধনের মুখ যেন হাসিখুশির একখানা পৃষ্ঠা হয়ে যায়—'কার্বাঙ্কল থেকে এল আঙ্কল। আঙ্কল মানে খুড়ো—তাহলে খুড়ি মানে কী? বল্‌তো?'

'আমি কী জানি!' গোবর্ধন ঠোঁঠ ওলটায়—'তুমিই তো বলবে।'

'আহা, আমিই তো বলব। তুই বলবি কোত্থেকে? তোর কি অত বিদ্যে আছে? তাহলে ঘোড়ার পিঠে পাখি না বসে গাধার পিঠেই বসত গিয়ে। নামই পালটে যেত তোর। খুরির ইংরিজি?—' মৃদু মধুর হাস্যে তাঁর মুখমণ্ডল ভরে যায়—'খুরির ইংরিজি হল আণ্ট। আণ্ট মানে খুরি।'

'জানতাম। তোমার আগেই জানতাম।' মুখ বাঁকায় গোবর্ধন। 'আবার আণ্ট মানে পিঁপড়েও হয়।'

'হয়ই তো।' হর্ষবর্ধন জোরালো গলায় জাহির করেন। 'আণ্ট তো দু'রকমের—এক, পিঁপড়েরা, আর এক খুড়ি-জেঠি। আমি বললুম বলেই জানলি, নইলে আর জানতে হত না তোকে। আমার সব জানা আছে।'

গোবর্ধন অনেকটা কাহিল হয়ে আসে—'আচ্ছা বেশ, আণ্ট বানান কর দেখি!'

'কেন? সোজাই তো বানান। এ-এন-টি—আণ্ট। 'এ'-তে 'অ'-ও হয় 'আ'-ও হয়। ইংরিজির মজাই ঐ!' মুরুব্বি চালে উনি মাথা চালেন।

'আবার 'এ'-ও হয়।' গোবর্ধন অনুযোগ করে। দাদার অগ্রগতির ধাক্কা সামলানো ওর পক্ষে শক্ত, তবু খুব বেশি পিছিয়ে থাকতেও সে রাজি নয়।

'আচ্ছা, সে তো হল। খুরি তো পাওয়া গেল। এখন মাখন-কলের ইংরিজি পেলেই তো হয়ে যায়—সাহেবকে বুঝিয়ে খুঁজে বার করাই জিনিসটা।' হর্ষবর্ধন জিজ্ঞাসু হন—'জানিস ওর ইংরিজি?'

'মাখন-কল? কলের ইংরিজি তো মিল। যেমন পেপারমিল—'

হর্ষবর্ধন উৎসাহ পান—'হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে এবার। সেই যে একবার কোন্ পেপার মিল একরকমের কাঠের খোঁজ করেছিল আমাদের কাছে?'

'হ্যাঁ, আমারও মনে পড়েছে।' গোবর্ধন সায় ছায়—'আর মাখন? মাখন হচ্ছে বাটার—জানোই তো তুমি। বাট—বাটার—বাটেস্ট। বাট মানে হল কিন্তু, বাটার মানে—মাখন,—আর বাটেস্ট? বাটেস্ট মানে?'

বিদ্যার পরিচয় দেবার মুখেই হোঁচট খেতে হয় গোবরাকে।

'বাটেস্টে কাজ কী আমাদের? বাটারই যথেষ্ট।' হর্ষবধন বলেন—'তাহলে মাখন-কল মানে হলগে, বাটার-মিল। কেমন?'

দাদাকে পরামর্শ দেবার সুযোগ পেয়ে গোবর্ধন যেন বর্তে যায়: 'মিল আবার কবিতারও হয় দাদা!' সে বলে—'তবে কবিতার কলকারখানা হল আলাদা।'

'তুই বড্ড বাজে বকিস গোবরা!' হর্ষবর্ধন একটু বিরক্তই হন—'তাহলে কী দাঁড়াল? আনটু অব এ বাটার মিল—তাই না? তাহলে সাহেবকে গিয়ে এই কথাই বলা যাক—কেমন?'

এমন সময় বেয়ারাটা আবার আসে—'চলিয়ে চেম্বারমে বড়া সাবকো পাস।'

দুরু-দুরু বক্ষে দু'ভাই আপিস ঘরে ঢোকে। অভিধানের মতই প্রকাণ্ড বটে ঘরটা, তবে ততটা ভয়াবহ নয়। দুজনে গিয়ে দাঁড়ায় টেবিলের কাছে।

'হোয়াট ডু ইউ ওয়াণ্ট বাবু?' প্রশ্ন এবং চুরুটের ধোঁয়া প্রকাণ্ড এক লাল মুখের দু'পাশ দিয়ে একই সময়ে এক সঙ্গে বহির্গত হয়।

হর্ষবর্ধন সাহস সঞ্চয় করেন—'উই ওয়াণ্ট ইওর আণ্ট'—

হর্ষবর্ধনের বাক্য শেষ হতে পায় না, সাহেবের চুরুট চমকে ওঠে মাঝখানেই—'হোয়াট?'

হর্ষবর্ধন একটু জোর পান এবার—'উই ওয়াণ্ট ইওর আণ্ট অফ এ বাটার-মিল।'

'ইউ ওয়াণ্ট মাই আণ্ট?' গোল চোখ আরও গোলাকার হয়ে আসে সাহেবের—'ইজ ছাট সো?'

গোবর্ধন জবাব দেয়—'ইয়েস—সার।' কম্পিত কণ্ঠ ওর।

সাহেবের মুখ থেকে চুরুট খসে পড়ে দাঁত কড়মড় করে।

কোট খুলে টেবিলের উপর ফেলে ছায়—আস্তিন গুটোয় সে—মাংসপেশীবহুল বিরাট হাত বিরাটতর বদ্ধমুষ্টিতে পরিণত হতে থাকে।

এই বদ্ধমুষ্টি অকস্মাৎ হয়ত ওদের নাকের সম্মুখীন হতে পারে, কেন জানি না এই রকম একটা ক্ষীণ আশঙ্কা হতে থাকে গোবরার।

প্রায় তাই—

'ওরে দাদারে—!'

দুর্ঘটনার পূর্বমুহূর্তেই গোবর্ধন দাদাকে জাপটে ধরে উদ্যত মুষ্টিকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে উর্ধ্বশ্বাস হয়। বেরুবার মুখে মেমের পা মাড়িয়ে ছায়, বেয়ারার সঙ্গে কলিশন বাধে, ধাক্কা লেগে একটা শো-কেস যায় উল্টে, বাঙালী বাবুটি ইতোনষ্ট-স্ততোভ্রষ্ট হয়ে কোথায় গিয়ে ছিটকে পড়েন কে জানে!—এসব দিকে ভ্রূক্ষেপের অবসর কোথায় তখন? একেবারে চৌমাথায় গিয়ে হাঁপ ছাড়েন ওঁরা।

'বাব্বাঃ! খুব বেঁচেছি!' গোবর্ধন বলে।—'বড্ডো ফাঁড়াটা কেটে গেল আজ!'

'আরেকটু হলেই—হুঁ!' হাঁপাতে থাকে হর্ষবর্ধন।

'বাজার করা সোজা নয় কলকাতায়!' গোবর্ধন বলে—'বুঝলে দাদা?'

'সনাতনখুড়োর যেমন কাণ্ড!' হর্ষবর্ধনও বেজায় রুষ্ট হন—'কলকাতায় খুরি কিনতে পাঠিয়েছে! খুরিদের জন্যে প্রাণে মারা যাই আর কি!'

'একটা বিয়ে করলেই তো পারে বাপু!' দারুণ অসন্তোষে গোবর্ধনও তেতে ওঠে—'খুরির দুঃখ থাকে না আর! মাখন-কলেও লাগিয়ে রাখতে পারে দিনরাত!'

'যা বলেছিস গোবরা!' হর্ষবর্ধন ভায়ের তারিফ করেন—'একটা কথার মত কথা বলেছিস এতক্ষণে!'

'হ্যাঁ তাহলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়! একটা সনাতন হয় আমাদের!'

'আমি শুধু ভাবছি, ব্যাটারা খুরি বোঝে না, আণ্ডও বোঝে না—কী আশ্চর্য্য! এই বিদ্যে নিয়ে হল্যাণ্ড থেকে ব্যবসা করতে এসেছে হেথায়! আশ্চর্য্য!' হর্ষবর্ধন ক্রমশঃই আরো অবাক হন—'কী করে যে এরা দোকান চালায় খোদাই জানেন! যে লালমুখোটা প্রথমে এগিয়ে এল সেটা তো আস্ত একটা আকাট! খুরি বানান বলে দিলুম তবু বুঝতে পারে না!'

'একেবারে হলধর!'

'হ্যাঁ, সেইটেই হলধর। ঠিক বলেছিস তুই।' হর্ষবর্ধন ভাইয়ের কথাই মেনে নেন—অম্লান বদনেই।

'আর যেটা অভিধানের মধ্যে ঢুকে বসে আছে,—মুখ গোঁজ করে, ঘুসি পাকিয়ে—'

ধীরে ধীরে রহস্যকে বিস্তারিত করেন তিনি:

'—সেই ব্যাটাই হল—ইন্দ্রসেন। আসল ইন্দ্রসেন।'

খানিক পরে হর্ষবর্ধন গুম্‌রে ওঠেন আবার।—'জীবনে মার বকুনি খাইনি ভাই কোনোদিন, আর কলকাতায় এসে কিনা মেমের বকুনি খেতে হল। ছি ছি!' নিজেকে তিনি ধিক্কার দেন।

'মেমের বকা আর সাহেবের গলাধাক্কা—তাও খেতে হল আমাদের!' গোবরাও গজরায়—'সোনায় সোহাগা। পেঁয়াজের ওপর পয়জার, গোদের ওপর বিষফোড়া।'

'দেশে গিয়ে এ মুখ দেখাব কি করে? এই পোড়ামুখ, বল্?'

'কলকাতার লোককেও এ মুখ দেখানো যায় না।' সায় দেয় গোবরাও—'কলকাতার মুখও দেখতে চাইনে আর আমরা। চলো দাদা, পৃথ্বীশ রায়ের খোঁজে যাই। কলকাতা ছেড়ে বিলেতেই পাড়ি জমাইগে…'

বিখ্যাত বিমানবীর পৃথ্বীশ রায়ের নাম কে না শুনেছে? তাঁর খেয়াল হয়েছে, নিজের মনো-প্লেনে ইটালি যাবেন—একেবারে নন্‌স্টপ্ ফ্লাইট, কলকাতা থেকে ইটালি এবং ইটালি থেকে ফিরে ফের কলকাতা।

বাঙালীদের মুখোজ্জ্বল করতে যাচ্ছেন তিনি, কিন্তু তাঁর নিজের মুখ খুব সমুজ্জ্বল দেখাচ্ছিল না সকাল থেকে। দু'জন সহযাত্রী চেয়ে খবরের কাগজে তিনি ইস্তাহার দিয়েছিলেন, তার পনের ষোল হাজার জবাব এসেছে কিন্তু প্রায় সবই পনের ষোল বছরের ছেলেদের কাছ থেকে।

তিনি চেয়েছিলেন দু'জন সাবালক সহযাত্রী, আটাশ থেকে আটাশি বছরের মধ্যে যাদের বয়স, স্পষ্ট করে সে কথা জানিয়েও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ঐ বয়সের কোন লোক যে সম্প্রতি বাংলা দেশে আছে, হাজার হাজার আবেদনের ভেতরে তার কোন প্রমাণ তিনি পাচ্ছেন না।

তিনি পরিষ্কার করে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে প্রাণহানির কোন আশঙ্কা নেই, আর যদিই বা এরোপ্লেন বিকল হয় তখন প্যারাস্যুট রয়েছে। তার ওপরে, কোমরে লাইফ বেল্ট বাঁধা থাকবে। সমুদ্রের জলে পড়লেও ভরাডুবির ভয় নেইকো, অথৈ জলে মজা করে ভাসা যাবে তখন—কিন্তু বয়স্ক বাঙালীরা প্রাণরক্ষার প্রলোভনে সহজে পড়তে রাজি নয় পষ্টতই তা বোঝা যাচ্ছে। অনেক ইস্কুলের মেয়েও যেতে চেয়েছে, আট বছরের ছেলেদের কাছ থেকেও অনুরোধ এসেছে কিন্তু আটাশ থেকে আটাশির মধ্যে একজনও না।

পৃথ্বীশ রায় খামের পর খাম খুলছেন আর ঘাড় নাড়ছেন—হ্যাঁ, এইসব ছেলেমেয়েরা যেদিন বড় হবে সেদিন আমাদের দেশও বড়

হবে, কিন্তু ততদিন—। 'নাঃ, আটাশ বছর কি আটাশি বছর আরো অপেক্ষা করবার মতো সময় আমার হাতে নেই। সহযাত্রী বা না-সহযাত্রী, আজই আমাকে যাত্রা করতে হবে।'

একটি ছেলে লিখেছে,—'দেখুন, আমি আপনার সাথী হতে রাজি আছি, কিন্তু একটা শর্তে! আপনাকে এক সময়ে এরোপ্লেনটা বিগড়ে দিতে হবে, যেমন বায়োস্কোপে দেখা যায় তেমনটি হলেও চলবে; এরোপ্লেনে আগুন লাগিয়েও দিতে পারেন, তাতেও আমার আপত্তি নেই। শুধু আমাকে একবার প্যারাস্যুটে নামবার সুযোগটা দিতে হবে কেবল। অজানা দেশে অচেনা লোকেদের মধ্যে হঠাৎ আকাশ থেকে নামতে পারলে ভারি মজা কিন্তু—!'

আর একটি চিঠির বক্তব্য,—'আমাকে কি আপনি সঙ্গে নেবেন? আমার একটু মুস্কিল আছে। আমার বয়স আটাশ বছর কিন্তু দেখতে বেজায় ছোট দেখায়। দেখলে আপনার মনে হবে বারো কি চোদ্দ—এই হয়েছে গণ্ডগোল। এই কারণে আমাকে ইস্কুলেও খুব নিচু কেলাসে ভর্তি করে দিয়েছে। কিন্তু আমি সত্যি-সত্যি বলছি আমার আটাশ বছর বয়স—সবে আটাশ পেরোলাম সেদিন। আপনি আমাদের পাড়ার টুনুকে জিজ্ঞেস করতে পারেন।'

এই দুটি আবেদন-সম্পর্কে গুরুতর বিবেচনা করছেন, এমন সময়ে দুটি ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন। পৃথ্বীশ রায় মুখ তুলে চাইলেন,—'কে আপনারা?'

এক নম্বর ভদ্রলোক দু-নম্বরকে দেখিয়ে বললেন,—'উনি হচ্ছেন হর্ষবর্ধন। আমার দাদা।'

'ও হচ্ছে তস্য ভ্রাতা।' দু-নম্বর জানালেন,—'ওর নাম গোবরা।'

এক নম্বর সংশোধন করে দিলেন,—'উঁহু। শ্রীমান গোবর্ধন।'

পৃথ্বীশ রায় কিঞ্চিৎ বিস্মিত হন—'তা, কী চাই আপনাদের?'

হর্ষবর্ধন বলেন,—'আমরা আপনার সঙ্গে একটু ঘুরে আসতে চাই।'

গোবর্ধন আবার সংশোধন করে,—'উঁহু! উড়ে আসতে।'

'ওঃ, উড়োজাহাজে ইটালি যাবেন? তা বেশ তো, বেশ তো! আপনাদের বয়েস?'

হর্ষবর্ধন ভাল করে গোঁফ চুমরে নেন,—'আটাশ থেকে আটাশির ভেতর।'

গোবর্ধনও প্রয়োজন-মত গম্ভীর গলায় সায় দেয়,—'হুঁ, তার থেকে একটা দিনও কম নয়।'

এর পর আর সন্দেহের অবকাশ থাকে না; পৃথ্বীশ রায় বলেন, —'তবে কাল সকাল দশটার সময় হাজির থাকবেন দমদমায়। দমদম এরোড্রোম, বুঝলেন?'

হর্ষবর্ধন ভয়ে-ভয়ে প্রশ্ন করেন,—'তা, ভাড়া কত পড়বে? এমন খুব বেশি লাগবে না তো?'

গোবর্ধন বলে,—'দশ হাজার পর্যন্ত আমরা উঠতে পারি। বেশি টাকা তো সঙ্গে আনা হয় নি।'

'হ্যাঁ, আসাম থেকে কলকাতায় এসেছি বেড়াতে। বিলেত যাওয়ার মতলব আগে ছিল না তো! তা, আপনি যখন খবরের কাগজে ছাপিয়েছেন যে তিন দিনে বিলেত ঘুরিয়ে আনবেন—'

গোবর্ধন মধ্যপথে বাধা দেয়,—'উড়িয়ে আনবেন।'

'হ্যাঁ, বিলেত উড়িয়ে আনবেন, তখন আমরা ভাবলাম, মন্দ কী? এই ফাঁকে বিলেত ঘুরে—ওর নাম কি—বিলেতটা উড়ে আসা যাক না।'

পৃথ্বীশ রায় বলেন,—'আপনাদের সহযাত্রী পাচ্ছি এই আমার সৌভাগ্য। এক পয়সাও লাগবে না আপনাদের।'

গোবর্ধনের চোখ কপালে ওঠে,—'অ্যাঁ, বলে কীরে দাদা। বিনে পয়সায় বিলেত?'

হর্ষবর্ধনও কম অবাক হন না,—'ওমনি-ওমনি নিয়ে যাবেন?'

'নিয়ে যাব আবার নিয়ে আসব—একদম মুফৎ। বরং আপনারা দাবি করলে কিছু না হয় ধরে দিতে রাজি আছি।'

হর্ষবর্ধনের বিস্ময়ের সীমা থাকে না,—'না, আমরা কিছু চাই না। আমরা তো রোজগার করতে কলকাতায় আসি নি, টাকা ওড়াতেই এসেছি এখানে।'

'কিন্তু দেখছ তো দাদা, টাকা ওড়ানো কত শক্ত এখানে!' গোবর্ধন যোগ করে,—'আমি তখনই বলেছিলাম তোমায়!'

হর্ষবর্ধন পিছপা হবার পাত্র নন,—'তা বেশ, বিনে পয়সায়ই সই, ওমনিই যাব বিলেত। বিলকুল ওমনি। তার কী হয়েছে?'

পৃথ্বীশ রায় বলেন,—'একটু ভুল করছেন। বিলেত নয়, ইটালি।'

'ওই যাকে বলে ভাজা চাল তারই নাম মুড়ি। বিলেত আর ইটিলি একই কথা। সমুদ্দুর পেরুলেই বিলেত, তা ইটিলিই কি আর আন্দামানই কি!'

গোবর্ধন অমায়িকভাবে হাসতে থাকে,—'ও আর আমাদের বোঝাতে হবে না।'

পৃথ্বীশ রায় বলতে শুরু করলেন,—'দেখুন, যদিও উড়োজাহাজে প্রাণহানির কোন ভয় নেই, তবু—'

হর্ষবর্ধন বাধা দেন,—'আমরা জানি। আকাশে আবার ভয়টা কিসের? এ তো লাইনে বাঁধা রেলগাড়ি নয় যে কলিশন বাধবে! আকাশে এন্‌তার ফাঁকা, কোথায় ধাক্কা লাগবে বলুন! কার সঙ্গেই বা লাগবে? তুই কী বলিস গোবরা?'

গোবরা জবাব দেয়,—'তুমিই বল না, কোনো পাখিকে কি

কখনো মরতে দেখেছো? মানে খাঁচার পাখি নয়, আকাশের পাখিকে? আকাশে যারা ওড়ে তাদের মরণ নেই দাদা! মৃত্যু হয় না সেখানে। আর উড়োজাহাজ তো বলতে গেলে পাখির মতই। এখুনি পথে আসতে আসতে দেখলে না—ইয়া বড়-বড় ছুই পাখা!'

পৃথ্বীশ রায় তথাপি বোঝাতে চেষ্টা করেন,—'তা বটে, পাখা থাকলেই পাখি হয় বটে, কিন্তু আরশোলা আর এরোপ্লেন বাদ। কিন্তু আমার কথা তো তা নয়! প্রাণহানির ভয় নেই সে কথা সত্যি, তবু আমি বলছিলাম কি, আপনাদের কি লাইফ ইন্‌শিওর করা আছে? নেই? তা, একটা করে ফেলুন না কেন যাত্রার আগে, বলা যায় না তো! আজকেই করে ফেলুন। যদিই একটা বিপদ আপদ ঘটে যায়, একটা প্রিমিয়াম দেয়া থাকলে আত্মীয়-পরিবার তখন টাকাটা পাবে।'

হর্ষবর্ধন ঘাড় নাড়েন,—'হ্যাঁ, লাইফ ইন্‌শিওর জানি বই-কি! আসামের জঙ্গলেও ওরা গেছে। তা আপনি যখন বলছেন, পঞ্চাশ হাজার কি লাখ খানেকের একটা করে ফেলা যাক। তা আমার নামেই করুন, ওর নামে করে কাজ নেই—ও কখনো আমার আগে মরবে না। আর আমি ম'লে টাকাটা যেন গোবরাই পায়। হ্যাঁ, যা বলেছেন, যদিই দৈবাৎ উড়ো কল বেগড়ায়, বলা যায় না তো! কলকব্‌জার কথা—কে বলতে পারে? আর, পড়লেই তো সব চুরমার—হাড়গোড় একদম ছাতু! ছাত থেকে পড়লেই ছাতু হয়, আর আকাশ থেকে পড়লে তখন কি আর কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে!'

পৃথ্বীশ রায় জিজ্ঞাসা করেন—ওঃ, উনি আপনার সঙ্গে যাচ্ছেন না তাহলে?'

'নিশ্চয়ই যাচ্ছে। যাচ্ছে না কে বললে? ওকে ছেড়ে আমি

যমের বাড়ি যেতেও রাজি নই', হর্ষবর্ধন জোরালো গলায় জবাব দেন,—'বিলেত তো বিলেত!'

পৃথ্বীশ রায়ের উড়োজাহাজ ইটালির এরোড্রোমে পৌঁছতেই সেখানকার প্রবাসী বাঙালীরা ভিড় করে এল। অভিবাদন ও অভিনন্দনের পালা শেষ হলে হর্ষবর্ধন সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করলেন,—'দেখছিস গোবরা, বাংলা ভাষাটা কী রকম ছড়িয়ে পড়েছে দুনিয়ায়। সবার মুখেই বাংলা আজকাল!'

'হুঁ দাদা, নইলে বিলিতি সাহেবদের মুখে বাংলা বুলি!'

পৃথ্বীশ রায় বুঝিয়ে দেন যে সমাগত ভদ্রলোকদের সাহেবি পোশাক হলেও আসলে তাঁরা বাঙালী, ব্যবসা বাণিজ্য কিংবা পড়াশুনোর ব্যাপারেই এঁদের বিদেশে বাস; বাঙালী বলেই বাঙালীকে সম্বর্ধনা করতে এঁরা সবাই এসেছেন। তখন দুই ভাই দস্তুরমত অবাক হয়ে যায়। 'বটে? বুঝেছি তাহ'লে, কাঠের কারবার নিয়েই এদের এখানে থাকা!' হর্ষবর্ধন ঘাড় নাড়তে থাকেন।

'তা আর বলতে!' গোবর্ধন যোগদান করে,—'কাঠের জন্যে আসামের জঙ্গলে গিয়ে মানুষ বাস করে, তা বিলেতে আসবে এ আর বিচিত্র কী!'

পৃথ্বীশ রায় জানান যে সন্ধ্যার মুখেই ওঁরা দেশমুখো হবেন; এঞ্জিনের অবস্থা ভাল নয়, এইজন্যে সমস্তদিন ওঁর কল মেরামত করতেই যাবে। হর্ষবর্ধন বলেন,—তাহ'লে এই ফাঁকে এই বিলিতি শহরটা একবার দেখে নেওয়া যাক না কেন?'

গোবর্ধন সায় দেয়,—'হুঁ, যখন পুরো একটা দিন পাওয়াই যাচ্ছে!'

মুকুল বলে একটি বছর পনের ষোলর ছেলে এগিয়ে আসে,—'আসুন, এখানে যা যা দেখবার আছে আপনাদের সব দেখাব আমি।'

হর্ষবর্ধন অবাক হন,—'অ্যাঁ, এইটুকুন ছেলে তুমিও কাঠের কারবারে লেগেছ? এই বয়সেই?'

মুকুল বলে,—'না, আমার বাবা ডাক্তার।'

গোবর্ধন ব্যাখ্যা করে,—'তার মানে, তিনি তোমাকে ব্যবসাতে সাহায্য করেন। মরলেই তো কাঠের খরচ!'

হর্ষবর্ধন পুলকিত হয়ে ওঠেন,—'বাপ ডাক্তার, ছেলের কাঠের কারবার; এর চেয়ে লাভের ব্যাপার কী আছে? ব্যবসার দুটো দিকই একচেটে—ডবল লাভ! আমার ছেলেকে আমি ডাক্তারি পড়াব। আর নাতিকে দেব আমাদের কারবারে, বুঝলি গোবরা?'

পৃথ্বীশ রায় মনে করিয়ে দেন,—'আপনারা সন্ধ্যার আগেই ফিরবেন কিন্তু।'

'সে আর বলে দিতে হবে না। আপনি আমাদের ফেলে চলে গেলেই তো হয়েছে! এখান থেকে হেঁটে বাড়ি ফেরা আমাদের কম্ম নয়!'

গোবর্ধন মিনতি জানায়,—'দোহাই, তা যেন যাবেন না! দেখছেন তো, দাদা মোটা, একটু হাঁটলেই ওঁর হাঁপ ধরে। আমি হাঁটতে পারলেও দাদা পারবে না।'

হর্ষবর্ধনের আত্মসম্মানে ঘা লাগে—'হুঁ! দাদা পারবে না! নিশ্চয় পারবে, আলবৎ পারবে, দাদার ঘাড় পারবে! হেঁটে দেখিয়ে দেব?' গোঁফে তা' দিতে দিতে সদর্পে তিনি অগ্রসর হন।

'আসুন আপানারা আমার মোটরে।' হর্ষবর্ধনের অভিযানে মুকুল বাধা দেয়,—'ঐ যে আমার বেবি-কার ঐখানে, আমি নিজেই ড্রাইভ করি।'

কিন্তু হর্ষবর্ধন থামেন না, তাঁর অগ্রগতি ততক্ষণে শুরু হয়েছে। গোবর্ধন সভয়ে দাদার বিরাট পদক্ষেপ দেখতে থাকে, তার আশঙ্কা হয় হয়ত একেবারে আসাম না গিয়ে দাদা হয়ত ক্ষান্ত হচ্ছেন না। কিন্তু সন্দেহ অমূলক, হর্ষবর্ধন সটান মোটরে পৌঁছে গ্যাঁট হয়ে বসেন।

তখন আশ্বস্ত হৃদয়ে গোবর্ধনও দাদার অনুসরণ করে। কিন্তু হর্ষবর্ধন ভায়ের দিকে দৃকপাত করেন না, তিনি ভয়ানক চ'টে গেছেন, তিনি নাকি ভয়ানক মোটা, হাঁটতে গেলে তাঁর হাঁপ ধ'রে যায়—দেশে হ'লেও ক্ষতি ছিল না কিন্তু বিলেতে এসে তাঁকে এমনধারা অপমান, সব বাঙালী সাহেবদের সামনে, ছি! ছি! তিনি জোরে জোরে গোঁফে তা' দিতে থাকেন।

মুকুল ওঁদের মিউজিয়মে নিয়ে যায়, সেখান থেকে চিত্রশালায়। 'এই যে সব চমৎকার চমৎকার ছবি দেখছেন, এসব হচ্ছে মাইকেল এঞ্জেলোর। পৃথিবীর একজন নামজাদা বড় আর্টিস্ট।'

'অ্যাঁ, বল কী? আমাদের মাইকেল? বিলেতে এসে ছবি আঁকত নাকি সে? বটে?' হর্ষবর্ধনের বিস্ময় ধরে না!

'মাইকেল এঞ্জেলোকে আপনারা জানলেন কী করে?'

'বাঃ, মাইকেলকে জানব না? তুমি অবাক করলে! তুমি তাঁর মেঘনাদবধ পড় নি?'

মুকুল ঘাড় নাড়ে,—'না তো। আমি জন্ম থেকেই এখানে কিনা, দেশে যাই নি তো কখনো।'

'বল্ না গোবরা, বল্ না সেইটে মুখস্থ—সম্মুখ সমরে পড়ি চূড়বীরামণি, বহু বীর—বহু বীর—হুঁ, মনে পড়েছে, বীর বহু চলি যবে গেলা যমপুরে—অকালে—তার পরে—তার পরে?'

গোবর্ধনও সহজে দমবার নয়,—'হুর্‌রে হুর্‌রে হুর্‌রে করি গর্জিল ইংরাজ, নবাবের সৈন্যগণ ভয়ে ভঙ্গ দিল রণ—'

হর্ষবর্ধন বিরক্ত হন, বাধা দিয়ে কন,—'উহু, উহু। ও যে মিলে গেল। মাইকেলের মেলে না। তোর কিছু মনে থাকে না, তুই একটা অপদার্থ! একেবারে রাবিশ! আবার আমাকে বলিস হাঁটতে পারে না।'

এতক্ষণে প্রতিশোধ নিতে পেরে হর্ষবর্ধন একটু খুশি হন, মুকুলকে সম্বোধন করেন,—'তুমি মাইকেল পড় নি তো? শুধু তার ছবি দেখেচো কেবল। মাইকেল পড়ে দেখো, অনেক বই আছে মাইকেলের।'

গোবর্ধন বলে,—'পড়লে বোঝা যায় বটে, কিন্তু পড়াই শক্ত। দাঁতভাঙা ব্যাপার।'

হর্ষবর্ধন খাপ্পা হয়ে ওঠেন,—'পড়লে বোঝা যায়? তুই তো সব জানিস মাইকেলের! বল্ দেখি "হস্তী নিনাদিল"—এর মানে কী—বল্‌তো?'

বার-বার অপমানে গোবর্ধনও গরম হয়,—'তুমি বল দেখি?'

'আমি? আমি জানি না? আমি না জেনেই তোকে জিজ্ঞেস করছি বুঝি?' হর্ষবর্ধন গোঁফ পাকানো ছেড়ে আমতা আমতা করেন,—'এমন কী শক্ত মানেটা শুনি—হস্তী নিনাদিল?' এ তো জলের মত সোজা। "নিনাদিল"র "নি" বাদ দিলেই টের পাবি। কিংবা "হস্তিনী নাদিল" তাও বলা যায়।' গোবর্ধন তাঁর পাণ্ডিত্যে কাবু হয়ে পড়েছে দেখে পুনরায় তিনি গোঁফে হস্তক্ষেপ করেন,—'হুঁঃ, এই তোর বিদ্যে! তবু "হ্রেষাধ্বনি" এখনো জিজ্ঞাসাই করি নি।'

গোবর্ধন এবার ভীত হয়, 'হ্রেষাধ্বনি' চাপা দেবার জন্যে বলে, —'মাইকেলের ছবিগুলো কিন্তু বেশ, না দাদা?'

'বেশ না ছাই, এর চেয়ে ওর পদ্য ভাল ঢের।' দাদা নিজের পাণ্ডিত্যকে এমন করে উড়িয়ে দিতে নারাজ: 'হস্তিনী নাদিল—মানেটা বুঝতে পারলি তার?'

'খুব বুঝেচি।' দাদার ব্যাখ্যায় ভাই নাক সিটকায়: 'তুমি বিলেতে এসে বড্‌ডো গন্ধ বার করছো দাদা! চেপে যাও চেপে যাও। যেখানে সেখানে এত নাদানাদি ভালো কি?'

মুকুল ওদের আরও অনেক কিছু দেখায়। মাইকেল এঞ্জেলোর গড়া মূর্তি, মাইকেল এঞ্জেলোর ভাস্কর্য, মাইকেল এঞ্জেলোর ফ্রেস্‌কো, এবং আরও কত কি কারুকার্য। মাইকেল এই বিদেশে এসে এত কাণ্ড করে গেছে ভেবে দু-ভাই কম অবাক হয় না। বলতে গেলে গোটা ইটালিটাই গড়ে পিটে দিয়ে গেছে মাইকেল।

হর্ষবর্ধন মাইকেল-গর্বে গর্বিত হয়ে ওঠেন,—'মাইকেলের বাড়ি কোথায় ছিল জানিস গোবরা?'

'যশোরে না খুলনায় যেন।'

'উঁহুঃ, আসামে। আমাদের আসামে। আসামী ছাড়া কেউ অত খাটতে পারে? কি রকম প্রাণ দিয়ে খেটেছে।'

'হ্যাঁ, ঠিক যেন ফাঁসির আসামী!' গোবর্ধন আর দাদার প্রতিবাদ করে না। —'ফাঁসির আসামীর মত প্রাণ দিয়ে খাটতে পারে কেউ? দুর্গা বলে ঝুলে পড়ে একেবারে।'

মুকুল ওদের বিখ্যাত রোমান ফোরাম দেখায়; হর্ষবর্ধন প্রশ্ন করেন,—'এও আমাদের মাইকেলের তো?'

'না, তাঁর জন্মাবার হাজার বছরেরও আগে তৈরি।'

'ওঃ!' হর্ষবর্ধন কিঞ্চিৎ হতাশ হন।

অতি প্রাচীন কালের একটা প্রস্তর-স্তম্ভের কাছে এসে হর্ষবর্ধন আবার প্রশ্ন করেন,—'মাইকেলের?'

'এ তাঁর জন্মাবার দু' হাজার বছর আগেকার।'

হর্ষবর্ধন দমে যান, মুকুল তাঁকে একটা বিরাট প্রস্তর-মূর্তি দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করে,—'ওটা কার মূর্তি জানেন?'

হর্ষবর্ধন সন্দিগ্ধ নেত্রে তাকান,—'মাইকেলের বোধহয়?'

'উঁহু। ভাস্কো ডা গামা ; নাম শোনেন নি ?'

'গামা, গামা—নামটা শোনা-শোনা মনে হচ্ছে যেন। খুব কুস্তি লড়ে বেড়াত লোকটা না ?'

'ভাস্কো-ডা-গামা ভারতবর্ষ আবিষ্কার করেছিল এ কথা ইতিহাসে লেখা আছে, কিন্তু কুস্তি-টুস্তির কথা তো পড়ি নি।' মুকুল জানায়।

'ভারতবর্ষ আবিষ্কার করেছিল ? তুমি অবাক করলে বাপু! এই-মাত্র আমরা সেই ভারতবর্ষ থেকেই আসছি, কিন্তু কই এ-রকম কথা তো শুনি নি। অত বড় দেশটা আবিষ্কার করল আর আমরা তার কিচ্ছু টের পেলাম না। বিন্দু-বিসর্গও জানতে পারলাম না ?'

গোবর্ধন বলে,—'তুমি ভুল পড়েছ, ভারতবর্ষ নয়, কুস্তি আবিষ্কার করেছিল গামা। আমার ভালরকম জানা।'

'কী গামা বললে ? ভাস্কো ডা গামা ? বেশ নামটা কিন্তু। তা লোকটা কি মারা গেছে ?'

'অনেক দিন। চারশো বছরেরও আগে।'

'চারশো বচ্ছর! বল কী ? তা কিসে মারা গেল ?'

'তা কী জানি।' মুকুল মাথা নাড়ে।

'বসন্ত বোধহয় ?' হর্ষবর্ধন জিজ্ঞাসা করেন।

'বইয়ে তো পড়ি নি, জানি না।' মুকুল আরও জোরে মাথা নাড়তে থাকে।

গোবর্ধন বলে,—'হামও হতে পারে।'

'হতে পারে—তাও হতে পারে—বেঁচে নেই যখন, কোন কিছুতে মারা গেছে নিশ্চয়।' মাথা নাড়তে নাড়তে মুকুলের ঘাড়ে ব্যথা হয়।

'বাপ মা আছে ?'

'অসম্—ভব।' প্রশ্ন শুনে মুকুল আকাশ থেকে পড়ে। 'ছেলে-পুলেই বেঁচে নেই তো বাপ মা ?'

'নাতিপুতি ?'

'নাতিপুতি না হাতি! তিনকুলে কেউ বেঁচে নেই লোকটার—যদ্দূর আমি জানি।'

অবশেষে ওরা পৃথিবীর সবচেয়ে বিস্ময়কর বস্তুর সম্মুখীন হয়—মিশরের কোন এক রাজার মামি। মুকুল উৎসাহে লাফাতে থাকে, 'দেখছেন?—মামি। মামি।'

হর্ষবর্ধন কিছুক্ষণ গম্ভীরভাবে লক্ষ্য করেন,—'কী বললে? কী নাম ভদ্রলোকের?'

'নাম? ওর কোন নাম নেই—ইজিপ্‌সিয়ান মামি।'

'মাইকেলের মত কোন নামজাদা লোক হবে বোধহয়? তা এই বিলেতেই কি এর জন্ম?'

'না—ইজিপ্‌সিয়ান মামি।'

'আমাদের বাংলা দেশের—মানে, আমাদের আসামের তবে?'

'না, না, বলছি তো, ইজিপ্‌সিয়ান।' মুকুল এবার ক্ষেপে যায়।

'ও, তাই বল। এতক্ষণে বুঝেছি। ইংরেজ।'

'না, ইংরেজ নয়, ফরাসী নয়, জার্মান নয়, ইটালির লোকও নয়, এমনকি বাঙালীও না—ইজিপ্টায় এর জন্ম।'

'ইজিপ্টায় জন্ম? ইজিপ্টা বলে কোন দেশের নাম তো কখনো শুনি নি।' হর্ষবর্ধন সন্দেহভরে মাথা নাড়েন। 'ইজিপ্টায়, না, ইজিচেয়ারে? তুমি জান ঠিক?' গোবর্ধন প্রশ্ন করে।

'ইজিপ্টা কোনো বিদেশ-টিদেশ হবে। গোবরা, তলায় কী লেখা রয়েছে পড়ে ছাখ তো।'

'এফ-আর্-ও-এম্—ফ্রম্; ই, জি, ওয়াই, পি, টি। ফ্রম—ফ্রম মানে হইতে, আর ই-জি-ওয়াই-পি-টি?'

'এগ্‌ওয়াইপ্ট্। এগ্‌ওয়াইপ্ট্ হইতে। এগ্ মানে ডিম। অর্থাৎ যেখান থেকে আমাদের দেশে ডিম চালান যায় সেখানকার

আমদানি এই লোকটা। বোধহয় কোন ডিমের আড়ৎদার-টাড়ৎদার।'

.. 'মামি—মামি।' গোবর্ধন প্রশ্ন করে,—'কার মামি হে? এর মামা কোথায়?'

মুকুলের ঘাড় টন্-টন্ করছিল, সে হাত নেড়ে জানায় যে ওর জানা নেই।

'দেখছিস গোবরা, কি রকম মজা করে শুয়ে আছে লোকটা—ত্থাখ্! কেমন শান্তশিষ্ট মুখের ভাব।'

গোবর্ধন মুকুলের মুখে তাকায়,—'এ কি—অ্যাঁ—এ কি মারা গেছে নাকি হে?'

'নিশ্চয়। তিন হাজার বছর।'

হর্ষবর্ধন চমকে ওঠেন—'অ্যাঁ, বল কি? তিনি হাজার বছর ধরে এমনি করে মরে পড়ে রয়েছে?

গোবর্ধনের বিশ্বাস হয় না,—'তিন হাজার বছর। হতেই পারে না। তিন দিনে মানুষ পচে ওঠে, আর এ কিনা তিন হাজার—'

হর্ষবর্ধনের মুখ এবার অত্যন্ত গম্ভীর হয়,—'শোন ছোকরা, তুমি কী বলতে চাও বল দেখি? বাংলা দেশ থেকে এসেছি বলে কি আমাদের বাঙাল পেয়েছ? যা খুশি তাই বুঝিয়ে দিচ্ছ? ছেলেমানুষ বলে এতক্ষণ তোমাকে কিছু বলিনি; তা বিলেতের ছেলে বলে কি তোমাকে ভয় করে চলতে হবে? অত ভীতু নই আমরা। তোমার চেয়ে আমাদের বাংলা দেশের ছেলেরা ঢের ঢের ভাল। তা জানো?'

গোবর্ধন দাদার সঙ্গে যোগ দেয়,—'হ্যাঁ, স্পষ্ট কথা। আমরা ভয় খাই না। নিশ্চয় ভাল, হাজার হাজারগুণ ভাল। অত বোকা পাও নি আমাদের যে যা খুশি তাই বুঝিয়ে দেবে। তিন হাজার

বছরের বাসি মড়া চালাতে চাও আমাদের কাছে? টাটকা মড়া থাকে তো নিয়ে এস—টাটকা চমৎকার খাসা একখানা লাশ। আমাদের আপত্তি নেই।'

তিনজনকে বাক্যহীন গুরুগম্ভীর মুখে ফিরতে দেখে পৃথ্বীশ রায় বিস্মিত হন। কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদের আগেই হর্ষবর্ধনের বিচলিত কণ্ঠ শোনা যায়, 'মশাই, চলুন। আর নয়, এ দেশে আর এক মুহূর্ত না। এই আপনার বিলেত? দূর দূর! সারা শহরটায় দেখবার মত কিচ্ছু নেই। কেবল একটা সাত হাজার বছরের বাসি মড়া! এর চেয়ে আমাদের কলকাতা ঢের ভাল। ঢের ঢের ভাল।

'হ্যাঁ দাদা! সেখানে অনেক জ্যান্ত মড়া দেখতে পাওয়া যায়। যাকে বলে জীবন্মৃত।' গোবর্ধনের জীবনদর্শন ব্যক্ত হয়।

হর্ষবর্ধনদের মনোপ্লেন ইটালির আকাশে পাখা মেলতেই পৃথ্বীশ রায় বললেন, 'এতদূরই যদি এলাম তখন একটু এদিকে ওদিকে ঘুরে গেলে হোতো না?'

'কোন দিকে?' জানতে চায় দুই ভাই।

'যেদিকে খুসি। দু চোখ যায় যেদিকে। আকাশে তো চারধারই খোলা। দিগ্বিদিকে যাওয়া যায়। বাধা কি?'

'খাস্ বিলেতের দিকে যাওয়া যায় না?'

'যাবে না কেন? স্পেনের ওপর দিয়ে যেতে হবে তাহলে।'

'ইস্পেন্?' আঁতকে ওঠেন হর্ষবর্ধন, 'সেখানে এখন লড়াই চলছে না দারুণ?'

'আপনি কি করে জানলেন?'

'র‍্যাটসাহেব বলছিল।'

'র‍্যাটসাহেবটা কে আবার ?'

'আমাদের আসামের ফরেস্ট অফিসার। আমাদের কাঠচেরাই কারবারের অদ্ধেক কাজ তো গাছ কাটা। জঙ্গলের গাছ কাটা। সেই কাজের সূত্রেই ঘনিষ্ঠতা।'

'তাই বুঝি ?'

'হ্যাঁ, র‍্যাটসাহেবের মোকাম ঐ ইস্পেনেই নাকি। ইস্পেনের কোনদিকে জিবরাল্টার বলে কী যেন একটা জায়গা আছে না ?'

'হ্যাঁ, আছে। তার ল্যাজের দিকটায়।'

'ল্যাজ নাকি ?' অবাক হয় গোবরা : 'আমরা ভেবেছিলাম ওটা বোধহয় ইস্পেনের জিব হবে।'

'তা জিবও বলা যায় বই কি! জায়গাটাকে মাথার দিক মনে করলে ওটা জিবের মতই লেলিহান আর তলার দিকে ধরতে গেলে ল্যাজের মতই লট্পট্ করছে।'

'তাহলে ল্যাজই হবে। কেননা, র‍্যাটসাহেব বলেছিল ওটা নাকি ইস্পেনের একটা বন্দর। বন্দর না বান্দর কী যেন বলেছিল মনে নেই। বান্দর হলে তো ল্যাজই হবার কথা।'

'তা, র‍্যাটসাহেবের সঙ্গে ঐ ল্যাজের সম্পর্কটা কী ?' জানতে চান পৃথ্বীশবাবু।

'র‍্যাট সাহেব ছুটি নিয়ে দেশে ফিরে যাচ্ছেন তো। বোম্বে থেকে জাহাজ চেপে সমুদ্র পথে তিনি রওনা হয়েছেন। জিবরালটারে ঐ বান্দরের কাছে নেমে সেখানে দিনকয়েক কাটিয়ে ইস্পেনের ম্যাড্রাসের দিকে পাড়ি দেবেন, বলেছিলেন তিনি আমাদের।'

'ইস্পেনে ম্যাডরাস ?' পৃথ্বীশ রায় হতবাক্ : 'ইস্পনেও আবার ম্যাড্রাস আছে নাকি ?'

'থাকবে না কেন ? পাগলরা নেই কোথায় ? দুনিয়ার সর্বত্রই

তো ছড়ানো।' হর্ষবর্ধন পরিষ্কার করেন—'আর পাগলদের রাসলীলা তো লেগেই রয়েছে সব জায়গায়।'

'পাগলদের রাসলীলা! আপনি পাগলটা পাচ্ছেন কোথায়?'

'ঐ ম্যাড্-এর মধ্যেই। ম্যাড মানেই পাগল নয়?' হর্ষবর্ধন বলেন—'তবে ভারতবর্ষের মাড্রাসে আমি কখনো যাইনি। সেখানে পাগলের ভিড় কি রকম তা আমি বলতে পারব না।'

'ও বুঝেচি। ম্যাড্রাস নয়, ম্যাড্রিড হবে বোধহয়। ম্যাড্রিড হচ্ছে স্পেনের রাজধানী। ম্যাডরিডের কথাই বলেছিলেন বোধ হচ্ছে ঐ র‍্যাটসাহেব।'

'তা হতে পারে। তা ঐ একই হোলো। দুটোর মধ্যে ম্যাড রয়েছে দেখছেন না? ম্যাডনেসের কোনো অভাব নেই কারোই।'

'তা বটে। ম্যাড্রিডের লোকেরা উন্মত্তই বটে এখন। এই মুহূর্তেই তো বটেই।' পৃথ্বীশ রায় সায় দেন তাঁর কথায়।

'তাই নাকি? তা, লোকগুলো এমন ক্ষেপে আছে কেন এখন।'

'তাদের দেশে লড়াই চলছে যে। ঘোরতর যুদ্ধু যাকে বলে। জেনারল ফ্রাঙ্কো বলে এক জাঁদরেল লোক হিটলারের সহায়তায় বিরাট এক ফ্যাসিস্ত বাহিনী নিয়ে ম্যাড্রিড আক্রমণ করেছে—শহরের দখল নেবার জন্যে।'

'বটে?'

'আর শহরের আবালবৃদ্ধবণিতা তাকে রুখতে মরীয়া হয়ে লড়ছে, তাদের নেতা কে জানেন? এক মেয়েছেলে।'

'জাঁদরেলের ওপর টেক্কামারা ডবোল জাঁদরেল? কী নাম জাঁদরেল্নীর?'

'লা পাসানোরিয়া।'

'পাসানোরিয়ার মানেটা কী, বুঝেচ দাদা?' গোবরা বাতলায়ঃ 'পাষাণ ওর হিয়া—মানে এক পাষাণ-হৃদয়া নারী।'

'পাষাণের মত কলজে না হলে কি লড়তে পারেরে? মেয়েটার নাম একেবারে অক্ষরে অক্ষরে সত্যি।' ঘাড় নাড়েন দাদা।

'বিলেত যেতে হলে স্পেনের উপর দিয়েই যেতে হয় বটে।' রায়মশায় জানান: 'কিন্তু তা আমি যেতে চাই না। লড়াই চলছে সেখানে। যদি কোনো পক্ষ থেকে কেউ আমাদের প্লেন লক্ষ্য করে গুলি গোলা ছোড়ে তাহলেই তো হয়েছে।'

'কেন, পারাচুট আছে না?' গোবর্ধন বলে: 'ওইটা জড়িয়ে ওড়না উড়িয়ে নেমে পড়ব আমরা। ভয়টা কিসের?'

'নামতে হবে তো যুদ্ধক্ষেত্রের ওপরই। তারপর?'

তারপর কী হতে পারে সেটা জানার জন্য দুই ভাইই উদ্‌গ্রীব।

পৃথ্বীশবাবু বলেন—'যে পক্ষের সামনেই পড়া যাক মৃত্যু নির্ঘাৎ! যুদ্ধের সময় কি কারো কাণ্ডজ্ঞান থাকে?'

'তাহলে? ঐ জিব্‌রালটার দিয়ে ঘুরে গেলে হয় না?'

'তা হয় বটে। একটুখানি ঘুর হয় যদিও।'

'তা হোক না! আমাদের ঐ জিবরালটারে নামিয়ে দিয়ে যাবেন—আমরা র‍্যাটসাহেবের সঙ্গে দেখা করব। বাড়ির ঠিকানা জানি তার। লোকটা আমাদের বহুৎ উপকার করেছে। ওর বাড়ি বয়ে গিয়ে একটু কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আসা উচিৎ।'

'ফিরবেন কি করে দেশে?'

'কেন, জাহাজে চেপে। আমাদের সঙ্গে হাজার দশেক টাকা আছে। সেই টাকায় কি জাহাজের ভাড়া মেটানো যাবে না?'

'খুব খুব। চলুন, তাহলে আপনাদের জিবরালটারের এয়ার-পোর্টে নামিয়ে দিয়ে যাই।'

প্লেনের মুখ ঘোরালেন পৃথ্বীশ রায়।

আসাম থেকে কলকাতায় আসার আগেই হর্ষবর্ধন জেনেছিলেন তাঁদের এতকালের সুপরিচিত ফরেস্ট অফিসার র‍্যাটসাহেব ছুটি নিয়ে বিলেত যাচ্ছেন।

খবর পেতেই তাঁরা দেখা করতে ছুটেছিলেন সাহেবের সঙ্গে।

এই হয়ত শেষ দেখা তাঁদের, ফিরে আর দেখা হবে কিনা কে জানে।

সেকালে গঙ্গাযাত্রা করলেই মানুষ ঘরে আর ফিরত না। এ তো আবার সমুদ্রযাত্রা!

'র‍্যাটসাহেব ফিরতে পারে দাদা।' বলেছিল অবশ্যি গোবর্ধন: 'হনুমান তো সমুদ্র লঙ্ঘন করে ফিরেছিল। মহাভারতে বলে।'

'মহাভারতে বলে? মহাভারত! মহাভারত!' আর্তনাদ করেছেন দাদা—'রামায়ণে আর মহাভারতে গুলিয়ে ফেলছিস তুই!'

'রামায়ণেই বলল না হয়। একই কথা। আমি বলছিলাম কি, যে র‍্যাটসাহেবও সমুদ্র ডিঙিয়ে ফিরে আসতে পারে। সাহেবরা হনুমানের জাত ভাই তো! তাই না?'

র‍্যাটসাহেব বলেছিলেন যে ছুটি নিয়ে গৌহাটি হয়ে ফিরবেন তিনি কলকাতায়। সেখানে থাকবেন দিনকতক। এক বন্ধুর বাড়িতে—খিদিরপুরের ডক এলাকায়। সেখানে জাহাজঘাটা আছে না? তারই কাছাকাছি।

হর্ষবর্ধন জানিয়েছিলেন যে, তাঁরাও যাচ্ছেন কলকাতায়। তাঁরা যাচ্ছেন টাকা ওড়াতে। কারবারে তো অনেক টাকা কামানো হোলো, এবার সেই টাকার কিছুটা কমিয়ে তাঁরা হালকা হতে চান।

'কারবারের পর এখন জেরবার হতে চাই আমরা, বুঝেচেন সার?' দাদার সার কথায় সায় দিয়ে বলেছিল গোবরা।

সাহেব তাদের খিদিরপুরে বন্ধুর বাসার ঠিকানাটা দিয়ে সনির্বন্ধ

অনুরোধ করেছিল কলকাতায় গিয়ে তারা যেন তাঁর সঙ্গে দেখা করে। অমুক তারিখ নাগাদ তিনি রওনা হবেন কলকাতায়।

তারপর তাঁরা কলকাতায় আসার কদিনের মধ্যেই সেই ইঁদুর-বেড়ালঘটিত কাণ্ডটা ঘটল।

গোবর্ধন শুধাল, 'বেড়ালের ইংরেজি তো ক্যাট, তাই না দাদা? আর ইঁদুরের ইংরেজি?'

'মাইস্। ইঁদুরগুলো ভারি বদ্ দেখলি না? এই জন্যেই বদ লোকদের ইঁদুরের সঙ্গে তুলনা করা হয়—বলে বদমাইস্।'

'ব্যাড মাইসও বলা যায় দাদা! তবে ইঁদুরের আরো একটা ইংরেজি ছিল যেন, যেটা নাকি ক্যাটের সঙ্গে মিল খায়।'

'র‍্যাট্।' হর্ষবর্ধনের মনে পড়ে যায়: 'সেটা ওরই ভেতর যারা একটু ইতরবিশেষ—সেই মন্দের ভালো ইঁদুরদের বেলাতেই বলা হয় বোধ হয়।'

বলতেই গোবর্ধনের মনে পড়ে যায়—মনের কথাটা উদাহরণ-স্বরূপ সে প্রকাশ করে তখন—'হ্যাঁ দাদা! যেমন আমাদের র‍্যাট সাহেব! লালমুখোগুলো সব তো ভারী পাজি, তার মধ্যে একটা কেমন ভাল লোক।'

র‍্যাটের কথায় র‍্যাটসাহেব এসে পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শেষ কথাটাও মনে পড়ে যায়।

'র‍্যাট সাহেব বলেছিল না আমাদের, কলকাতায় এলে তার সঙ্গে দেখা করতে?'

'বলেছিল তো। খিদিরপুরের জাহাজঘাটার কাছে কোথায় যেন আছে সে। কিন্তু এতদিন কি আর ঘাটে পড়ে আছে নাকি? জাহাজে উঠে পড়েছে কোন কালে।'

'জাহাজে উঠেই দেখা করে আসি না কেন? জাহাজ ছাড়ার আগে নেমে পড়লেই তো হবে। হবে না?' গোবরা বলে:

'যেমন কাউকে বিদায় দিতে ইষ্টিশনে গেলে গাড়ি ছাড়ার আগে নেমে এলেই হয়।'

'তাতো হয়। জাহাজঘাটাতেও প্ল্যাটফর্ম টিকিট পাওয়া যায় নিশ্চয়।...তবে যাই চল্। দেখা করে আসি সাহেবের সঙ্গে।'

বাস্তবিক্, এতদিনের সম্বন্ধসূত্রের পর এত কাছাকাছি এসে র‍্যাট্‌ক্লিফের সঙ্গে মোলাকাত না করাটা ভালো দেখায় না—বিশেষ এটাকে যখন শেষ দেখাই ধরা যেতে পারে, অন্তত বেশ কিছুদিনের মতো তো বটেই। বড়ো সাহেবের বিলেতপ্রাপ্তি এবং বাড়ীর বুড়ো কর্তার কাশীপ্রাপ্তি, অবশ্য দেহরক্ষা না করে—প্রায় এক জাতীয় ব্যাপার। খুব কমই তাঁরা সেখান থেকে ফেরৎ আসেন। সমুদ্রযাত্রা প্রায় গঙ্গাযাত্রার মতই। এসব যাত্রায় ফেরার কোনো কথাই নেই, বলতে গেলে প্রায় ফেরারী হবার কথাই।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে সামনে একটি ছেলে পেয়ে তাঁরা শুধিয়েছেন—'খিদিরপুর যাব আমরা। সেটা কোন দিকে ভাই?'

'কোনটা কোন দিকে?' ছেলেটার পালটা জিজ্ঞাসা।

'খিদিরপুর?' জানতে চেয়েছে গোবরা: 'কোন দিকে?'

'খিদিরপুরের দিকে।'

'সেটা কোন দিক তাইতো জানতে চাইছিলাম।'

'যেদিকটায় খিদিরপুর।' বলে যায় ছেলেটা। বলেই চলে যায়। দাঁড়ায় না আর।

'কিচ্ছু খবর রাখে না ছেলেটা। চাল মেরে চলে গেল কেমন!' বিরক্তি প্রকাশ করে গোবরা—'বালক নয়, কোন ভদ্রলোককে শুধাও দাদা!'

'কি করে খিদিরপুর যাওয়া যায় বলতে পারেন মশাই?'

'কেন, ট্রামে চেপে যাবেন।' জবাব দিয়েছেন ভদ্রলোক—'ট্রামে ট্রামেই যাওয়া যায় খিদিরপুর।'

'কদ্দুর হবে জায়গাটা ?'

'কদ্দুর আর ?' তিনি জানান—'নাক বাড়ালেই খিদিরপুর।'

তারপর নাক বাড়িয়ে সামনে যে ট্রাম পায় তাতেই চেপে বসে দুই ভাই। সটান চলে যায় বালিগঞ্জ। সেখান থেকে আরেক ট্রামে চেপে, পার্কসার্কাস ঘুরে, ওয়েলেস্‌লি ষ্ট্রীট্ হয়ে ধরমতলা ধরে এস্‌প্ল্যানেড ডালহৌসি পেরিয়ে ষ্ট্রাণ্ডরোড দিয়ে সোজা চলে যায় হাওড়া ষ্টেশন। সেখানে আবার ট্রাম বদলে ধরমতলা হয়ে সার্কুলার রোড ধরে শেয়ালদা ষ্টেশনকে ডানধারে ফেলে রাজাবাজারের পাশ কাটিয়ে শ্যামবাজারের পাঁচমাথা ঠুকে গালিফ স্ট্রীটে গিয়ে ঠেকেন। সেখান থেকে আরেক ট্রামে রওনা দিয়ে এস্‌প্ল্যানেডে এসে খিদিরপুরের গাড়ির পাত্তা পেয়ে সেই ট্রামে চেপে খিদিরপুরের ডক এলাকায় গিয়ে পৌঁছান।

'উঃ! কী ঘুরটাই না ঘোরালে দাদা। লোকটা বলল যে নাকের সোজা।'

'নাক সোজা হতে পারে ভাই! কিন্তু কলকাতার লোকরা তেমন সোজা নয়। তাদের নিজেদের যেমন ঠিকঠিকানা নেই, তাদের দেওয়া ঠিকানাও তেমনি ঠিক হয় না। নাকাল করে ছাড়ে সব।'

কিন্তু র‍্যাট্‌সাহেব যে কোন্ জাহাজে পাততাড়ি গুটোচ্ছেন, ওঁদের তা জানা নেই এবং জানা থাকলেও যে বিশেষ কিছু সুবিধে হতো, জাহাজঘাটার কিনারায় পৌঁছে তেমনটা তাঁদের মনে হয়না। কেননা, অসংখ্য জাহাজের ভেতর থেকে সেই বিশেষ জাহাজটিকে চিনে খুঁজে বার করা কোনো মতেই সহজ ছিলো না ওঁদের পক্ষে।

তবু হয়তো সেই জাহাজ, ভগবানের মতো, নিজগুণে দেখা দিয়ে নিজ রূপে প্রকট হতে পারে, সেই ভরসায় ওঁরা জাহাজঘাটায়

ইতস্তত: বিচরণ করতে থাকেন। জেটির ওই সামান্য প্রসারের মধ্যেই, কেবল পায়চারীর দ্বারা, যখন প্রায় মাইল পঞ্চাশ হাঁটা হয়ে গেছে, তখন সাদাসিধে পোষাকপরা পুলিশের এক গোয়েন্দার সন্দেহের উদ্রেক না হয়েই পারে না। সে এসে ওঁদের পাকড়ায়—'কৌন্ হ্যায় তুম্‌লোক? কাঁহাকা আদমী?'

'আসামী হ্যায়!' সগর্বে বলেন হর্ষবর্ধন।

ব্যস্, আর উচ্চবাচ্য নয়, অমনি সেই গোয়েন্দা—এতখানি বিনা পোষাকে যে তাকে পাহারোলা বলে সন্দেহ করবার ঘুণাক্ষরও নেই কোথাও—তাঁদের গ্রেপ্তার করে জেটি-দারোগার কাছে নিয়ে হাজির করে।

'দো আসামী, দোনো ডাকু, পাকড়্ গয়ি সাব!'

তারপরে অতিকষ্টে, তাঁরা আসামের লোক বলেই আসামী, স্বভাবতই আসামী কিন্তু স্বভাবত: আসামী নয়, মানে, জাতে আসামী হলেও আসামীজাতীয় নন্—জন্মগুণে আসামী, স্বভাবদোষ নন, এবম্বিধ নানান কৈফিয়ৎ দিয়ে, দারোগা সাহেবের কবল থেকে কোনো রকমে উদ্ধার পান এবং সেই অফিসারের কাছ থেকেই র‍্যাট্‌ক্লিফ সাহেবের হদিশ উদ্ধার করেন।

তারপর যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমুল্যের বিনিময়ে সেই সাদা-সিধে পাহারোলার সহায়তায় তাঁরা বহু সাহেববহুল সেই বিলেতগামী জাহাজটির ডেকেই সরাসরি গিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছেন।

র‍্যাট্‌সাহেব তো তাঁদের দেখতে পেয়েই পুলকে গ্যাট্-ম্যাট্ করে ওঠেন—'হ্যালো হাবাড়ডান, হ্যালো গাবাড়ডান! হাউ ডু ইউ ডু!'

হাবাড়ডান—গাবাড়ডান প্রত্যুত্তরে শুধু বলে—'হ্যালো, হ্যালো।' বহু দিবসের পরে, প্রিয়জন-মিলনে, আনন্দের আতিশয্যে ওঁদের সুবিধে মতো কথাই বেরোয় না মুখ দিয়ে।

এ-কথা সে-কথার পর সাহেব ওঁদের জানান যে, উনি সরাসরি

বিলেতে যাচ্ছেন না এখান থেকে সোজা স্পেনে যাবেন, জিবরালটার বন্দরে নামবেন, সেখানে কিছুদিন কাটিয়ে তারপরে স্পেন হয়ে তাঁর বিলেতপ্রাপ্তি ঘটবে।

হর্ষবর্ধন জিগ্যেস করেন—'ইসপেন? হোয়াই?'

'ফর রেস্ট!' সাহেব হেসে বলেন। বক্তব্য বিষয়টাকে আরো বিশদ করার জন্যে, হিন্দীর খিচুড়ী মিশিয়ে দেন বেশ করে—'আলবৎ, ফর হোয়াট এল্‌স্‌—আউর কেয়া মালুম করতা?'

গোবর্ধনও ইংরিজি কথায় দাদার প্রায় কাছাকাছিই যায়। সে বলে—'অফ কোর্স!' পিছ-পা হবার ছেলে সেও নয়।

'ফরেষ্ট অলসো ইন ইসপেন?' হর্ষবর্ধন প্রশ্ন করেন।

'হোয়াই নট্‌? এ ভেরী রেস্টফুল প্লেস, মোর সো ফর দি কজ্‌ অফ ওয়ার।' সাহেব হাস্য করেন।

গোবর্ধন আবারও বলে—'অফ কোর্স।'

সাহেবের সব কথাই সে অবিকল বুঝতে পারে, তার দাদার মতোই চমৎকার। তাই সব কথাতেই এক বাক্যে সায় দিতে সে কসুর করে না।

এবার হর্ষবর্ধনের 'অফ কোর্স' বলার পালা ছিলো, সুযোগটা গোবর্ধনের স্বার্থপরতায় নাহক এভাবে হাতছাড়া হওয়ায়, তিনি মনে মনে গোবরার ওপর ভারী চটে ওঠেন। বলেন—'দেন ইউ গো, গুডবাই সাহেব। টেক্‌ অ্যাজ মেনি ফরেষ্ট অ্যাজ ইউ ক্যান্‌—ইন ইসপেন।'

গোবধন বলে—'অফ কোর্স! ইন ইসপেন! অফ কোর্স!'

তারপর দুই ভাই বিদায় নেয় সাহেবের কাছে। বিদায় নিয়ে, নিজেদের ডেরায় ফিরে আসে।

পৃথ্বীশ রায় দুই ভাইকে জিব্রালটারের এয়ারপোর্টে নামিয়ে দিয়ে গেছেন। বলে গেছেন সেখান থেকে বেরিয়ে রাস্তায় পড়ে যে কোনো ট্যাক্সি ড্রাইভারকে বললেই সোজা ষ্টেশনে নিয়ে পৌঁছে দেবে। শহরের বড় ষ্টেশনে।

সেখানে ষ্টেশনে গিয়ে টিকিট কেটে ম্যাড্রিড্গামী যে কোনো ট্রেনে চেপে বসলেই হোলো। তারপর ম্যাড্রিডে পৌঁছে ষ্টেশনের বাইরে বেরিয়ে ফের কোনো ট্যাক্সি ধরে ড্রাইভারকে র্যাট সাহেবের বাড়ির ঠিকানা বাতলে দিলেই সে যথাস্থানে পৌঁছে দিয়ে আসবে।

যথাস্থানে দিয়ে এলেও জায়গাটা এখনও যথাযথ পাওয়া যাবে কি না সে বিষয়ে তিনি যথেষ্ট সন্দেহ প্রকাশ করে গেছেন।

'কেন, জায়গা কি আবার হারিয়ে যায় নাকি মশাই?' তাঁর কথায় অবাক হয়েছে গোবরা।

'জায়গা ফিন্ কাঁহা যায়গা?' রাষ্ট্রভাষায় টিপ্পনি কেটেছেন হর্ষবর্ধন।

'জায়গা ঠিক জায়গাতেই আছে। তবে তার ওপরকার ঘর দোর এখনো অটুট রয়েছে কি না সেই কথা। জেনারেল ফ্র্যাঙ্কোর বোমারু বিমানবহর যেমন ঘন ঘন হানা দিচ্ছে শহরে আর বোমা বর্ষণ করে যাচ্ছে, খবরের কাগজে যা পড়া গেছে, তেমনটা হয়ে থাকলে র্যাট সাহেবের বাড়ি এখন বিরাট গহ্বরে পরিণত হয়েছে। ঠিকানায় গিয়ে হয়ত দেখবেন যে একটা গভীর গর্ত।'

'গর্ত দেখব?'

'তাহলেও, তার মধ্যেই হয়ত আপনার র্যাট সাহেবের দেখা পেতে পারেন।' তিনি ঠাট্টা করেন: 'র্যাট্, মানে ইঁদুররা তো গর্তেই থাকে। সেই তাদের আসল আস্তনা।'

জিব্রালটার ছাড়িয়ে স্পেনের ভেতরে সেঁধিয়ে ট্রেনে কিছুদূর না এগুতেই পৃথ্বীশবাবুর কথার প্রমাণ মিলল।

আকাশ ছেয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে আসতে লাগল বোমারু বিমান, মাঝে মাঝেই হানা দিতে লাগল। আর চালাতে লাগল বুবুম্ বাম্!

এধারে ওধারে চারধারেই। এমন কি ট্রেনের আশে পাশেও পড়তে লাগল ধরাধ্ধর্!···বুম্ বাম্ ববম্ বম্। বাম্ বাম্ বুম।

জেনারেল ফ্রাঙ্কোর যা বোমার ধাক্কা! মাড্রিড এবং আশেপাশে খুব কম বাড়ী ঘরই আস্ত ছিলো। ঈশান কোণে মেঘের আবির্ভাব যেমন ঝড়ের পূর্বাভাস, তেমনি আকাশের যে কোনো কোণে এরোপ্লেনদর্শন মানেই বোমার অধঃপতন। হয় তারা সশব্দে পড়বে এসে মাথায় কিংবা দয়া করে নিতান্ত মাথায় না পড়লেও বাড়ীর হাতায় তো বটেই! অবশ্য, বোমার ছোঁয়াচ থেকে বাঁচা খুবই শক্ত, কিন্তু মাথা বাঁচিয়ে বাড়ীর ছাদে পড়লেই বা এমন কি বাঁচোয়া? বাড়ী-ঘর চাপা পড়লেই কি মানুষ বাঁচে?

এত ধূমধাড়াক্কা হর্ষবর্ধনের পছন্দ নয়। এতটা বাড়াবাড়ি গোবর্ধনেরও ভালো লাগছিলো না। তা ছাড়া মেঘেদের একটা দস্তুর আছে সাধারণত ঈশান কোণ থেকেই তারা দেখা দেয়, এই কারণে তাদের সম্বন্ধে সতর্ক হওয়া সহজ, হর্ষবর্ধনের ধারণা। এমন কি, ঈশান কোণ যে ঠিক কোন্ দিকটা আদৌ না জানলেও চলে যায়।

আকাশের যে কোণেই হোক, কি মাঝখানেই হোক, মেঘ দেখেছো কি আর নৌকো চেপো না! এইভাবেই তাঁরা আকাশের মেঘ আর জলের নৌকার—দুয়ে মিলে জলমগ্নতার হাত থেকে আত্মরক্ষা করে এসেছেন বরাবর।

কিন্তু এরোপ্লেনগুলোর কোনো দিগ্বিদিক জ্ঞান নেই—যে

কোনো কোণ থেকেই এসে পড়বে অকস্মাৎ। এসে পড়লেই হলো। তারপর সামলাও ঠ্যালা!

বাজ্‌ বাজ্‌ বাজ্‌ বাজ্‌ বাজ্‌ বাজ্‌ বাজ্‌ বাজ্‌ বাজ্‌ বাজ্‌ বাজ···
ঐ আসছে গগন বাজিয়ে বোমারু বিমান!

'র‍্যাট্‌সাহেব বোম্বাই হয়ে বিলেত ফিরবে বলছিল না দাদা?' শুধিয়েছে গোবরা।

'বলছিল বটে।'

'বোম্বাই যেতে বোমায় না গিয়ে থাকে।' গোবরার ভয় হয়।

হর্ষবর্ধন বলেন—'নারে, বোম্বাইযাত্রী সেই র‍্যাটসাহেবের কথায় কান দিয়ে ভালো করিনি আমরা!'

'কেন দাদা?'

'কেন আবার! জলেই এসে জল বাধে—দেখছিস না?'

গোবরার আধ্যাত্মিক দৃষ্টিশক্তি স্বভাবতঃই একটু ক্ষীণ। তাই সে কিছুই দেখতে পায়না!

'দেখছিস নে, বোমার ধূম? বোমাকে এরা বলে কী, শুনি? কী বলে ইংরিজিতে? বম্ব! আর বম্বকে একবার ডেকে দেখ না, তাহলেই তুই টের পাবি।'

গোবর্ধন টের পায় না। বম্বকে আবার ডাকবে কি? ও কি ডাকবার জিনিস? আর ও-তো না ডাকতেই দেখা দেয়—ছেলের হাতে খাবারের ঠোঙা থাকলে যা হয়, চিলেদের মতোই ওদের স্বভাব অনেকটা! ওকে আবার ডাকতে হয় নাকি আদর করে?

'আস্ত একটা হাঁদা তুই মোদ্দাৎ।' হর্ষবর্ধন বলেন এবার, 'বম্বকে ডাকা—এই সামান্য কাজটা পারছিস্‌ নে? আকাশের দিকে তাকাচ্ছিস কি হাঁ করে? বম্ব আয়—বম্ব আয়, বোমকে ডাকা তো এই? তাহলেই হলো বম্বায়! সন্ধি করেই হলো—স্বরসন্ধি।' মৃদু মধুর হাস্যে ভরে ওঠে ওঁর মুখ: 'আর বম্বায় যা, বোম্বাইও তা।'

দাদার বিচক্ষণতায় গোবর্ধন মুহ্যমান হয়ে পড়ে। ওর মুখে কথাই সরে না।

'না বোম্বাই এর নাম মুখে আনি, না এই বোমার পাল্লায় এসে পড়ি এখন।'

'সে কথা ঠিক দাদা।' গোবর্ধন সায় দেয় এতক্ষণে।

তারপর ওরা গুম হয়ে থাকে। বহুক্ষণ বাদে ফের গুমরে ওঠে গোবরা: 'র‍্যাট্ সাহেব বললে যে, ইসপেনের সবই ফরেষ্ট। তা ফরেষ্ট কই ইসপেনে? শহরই তো দেখছি নাগাড়ে।'

হর্ষবর্ধন হুমকি দেন—'এখন তুই কী দেখেছিস জঙ্গলের? জঙ্গলের কী হয়েছে এখন?'

'কেন? এত বড়ো ইসপেন, জঙ্গল থাকলে তা চোখে পড়বে না মানুষের? জঙ্গল তো আর জীবাণু নয় যে লুকিয়ে থাকবে? জীবাণুও না, ভগবানও নয়—তবে?' গোবর্ধন অবাক হয় দাদার কথায়।

'বাঃ, এই তো এখন শহরগুলো ভাঙছে সবে! এর মধ্যেই জঙ্গল? আগে শহরগুলো সেরে ফেলুক, মানুষগুলোকে সাবাড় করে দিক। তারপর আপনি জঙ্গল হবে, কারুকে দেখতে শুনতে হবে না। এতবড়ো ইসপেন, এখন কেবল লম্বায় আর চওড়াতেই বড়ো, তখন উচ্চতাতেও বড়ো হবে দেখিস। দেখে নিস।'

'তাহলে র‍্যাট্ সাহেবের বেশ দূর-দৃষ্টি আছে, কি বলো দাদা?'

'থাকবে না? কত বড়ো ফরেষ্ট অফিসার! লড়াই বেধেছে কি অমনি চলে এসেছে—ইসপেনে। জঙ্গল গজাবার আগেই জঙ্গল ইজারা নেবার মৎলব। আর বছর দুই যদি এমনি লড়াই চলে, সারা ইসপেন দেখবি বিলকুল ফাঁক। তার বছর পাঁচেক পরে বেদম জঙ্গল। গভীর অরণ্য একবারে।'

'রোদন করবার লোকটিও নেই কোথাও।' দীর্ঘশ্বাস গোবরার।

'আসল কথা কি জানিস? ওই র‍্যাট্ সাহেবই কি, আর ওই

ক্যাট্ সাহেবই কি, আর ইসপেনের এই লালমুখোগুলোই বা কি, আসলে এরা সবাই জংলী—এখনো ঠিক মতন সভ্য হয়ে ওঠেনি। এখনো ঘোরতর জংলী, তাই এরা জঙ্গল ভালোবাসে, যুদ্ধ বাধিয়ে জঙ্গল বানাতে চায়। আমাদের মতো সুসভ্য নয় রে! আমরা কোথায় আসামের জঙ্গল কেটে শহর বসাচ্ছি, আর এরা কোথায়, বসানো শহর ভেঙে গুঁড়িয়ে জঙ্গল বানাতে যাচ্ছে! এতেই বোঝ।'

গোবধন বুঝবার চেষ্টা করে, কিন্তু তার প্রাণপণ চেষ্টাই সার, কিছুতেই পেরে ওঠেনা। বোকার মতন মুখখানা করে রাখে।

ইতিমধ্যে অকস্মাৎ গগনপথে···

বাজ্ বাজ্ বাজ্ বাজ্ বাজ্ বাজ্ বাজ্ বাজ্ বাজ্—

এবং সঙ্গে সঙ্গে—ব্রাম্ ব্রাম্!

গোবর্ধন আর বিরক্তি চাপতে পারেনা, চেঁচিয়ে ওঠে—'পাজি-কোথাকার—উল্লুক কাঁহ্‌কা!'

হর্ষবর্ধন গুরুগম্ভীর হন: 'ছিঃ গোবরা, মুখ খারাপ করে না, মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মুখ খারাপ করতে নেই! এখন, কখন আছি কখন নেই, ভগবানের নাম করাই ভালো নয়কি? তবু শেষ মুহূর্তে ভগবানের নাম নিয়ে স্বর্গে যেতে পারবো। এই রকম স্থান কালে, এরকম অবস্থায় কি মন্দ কথা মুখে আনতে আছে? ছিঃ, তুমি যদি ভালো করে ভেবে দেখো তাহলেই বুঝতে পা—'

এমন সময়ে ট্রেনটার প্রায় ঘাড়ের ওপরেই একটা বোমা এসে পড়ে। উৎক্ষিপ্ত মাটির চাপড়া ছিটকে এসে ধাক্কা মারে দাদার নাকে।

হর্ষবর্ধন লাফিয়ে ওঠেন; 'ওরে বাবারে, গেছি রে! মাগো মা! গেল বুঝি চোখটা! পাজি, বলে পাজি! পাজির পা-ঝাড়া।'

চোখ কচলাতে কচলাতে যার-পর-নাই মন্দ কথা সব তিনি মুখে

আনতে থাকেন। যত খুশি—যেমন খুশি হয় তাঁর, যতক্ষণ না তাঁর আশ মেটে, তিনি ক্ষান্ত হন না।

গোবরা হাঁ করে শোনে।

বোমার সঙ্গে সমানে বর্ষিত হতে থাকে দাদার মুখখারাপ। এক একটা আওয়াজ হয় আর তাঁর গালিগালাজ ছুটতে থাকে—বুলেটের মতই। এবং তা বোমার থেকে অনেক দূর গড়ায়। ইস্পেন, ইস্পেনের লড়াই, ইস্পেনের মানুষ—কারুর তিনি বাকী রাখেন না, ইস্টুপিট নন্সেন্ রাসকেল যা মুখে আসে বলতে ছাড়েন না।

রাসকেল শুনেই গোবরার রাসলীলা মনে পড়ে যায়। সে বলে—'বলছিলে না দাদা? ম্যাডরাস ম্যাডরিড—দুটোর মধ্যেই ম্যাডনেস আছে। তা বলেছিলে ঠিক। নইলে অকারণ এইসব গুলিগোলা বুম বাম্—নেহাৎ পাগলামি ছাড়া কী?'

'বলেছিই তো! বলছিই তো!'

'কিন্তু এই পাগলামি ছেড়ে যাবে কোথায়? দুনিয়ার সব জায়গাতেই তো পাগলামি। পাগল লোকের ভিড়—তাই না দাদা?' এবার গোবরা দার্শনিকের মতন কথা কয়—দাদার কাছ থেকে শোনা সব বোধহয়।

'এই পৃথিবীতে বাস করতে হলে পাগলদের সঙ্গেই বাস করতে হবে, পাগলামি বাঁচিয়ে পা ফেলাই দায়।' গোবরা বলে। তার বক্তব্য, দুনিয়ার যেখানেই থাকো, পাগলদের পাগলামি বরদাস্ত করতে হবে, তখন নাহক রাগ করে লাভ কী? মুখ খারাপ করেই বা কী ফয়দা? —'পাগলের পাল্লায় পড়ে নিজেরাই না পাগল হয়ে যাই। তার চেয়ে বরং হাসিমুখে সয়ে যাওয়াই ভালো··· নিজের কাজও হাসিল করতে হবে সেই সঙ্গে।' গোবরা বলেছে।

'মুখখারাপ করছি কি সাধে? চোখটা গেল যে!'

'কোন্ চোখ?' শুধিয়েছে তখন সে।

'তাতো গেল, কিন্তু ইস্‌পেনের সম্বন্ধে যেসব কথা তুমি আওড়ালে, ভাগ্যিস্‌ আমাদের সহযাত্রীরা বাংলা বোঝে না তাই রক্ষে, নইলে তাদের দেশের গালমন্দ শুনে আমাদের আস্ত রাখত না, ওদের হাতেই সাবাড় হয়ে যেতাম এতক্ষণ! বোমায় মরবার ফুরসৎ মিলত না, বুঝলে দাদা···বুম বুমাৎ!'

দাদাকে বোঝাবার আগেই দারুণ এক বোমাৎকার। বিকট আওয়াজটা একখানা ট্রেনের ঘাড়েই এসে পড়েছে—দুখানা করে দিয়েছে ট্রেনটাকে।

একটা বোমা ট্রেনের ওপরেই পড়েছে এসে এবার।···

হর্ষবর্ধন আর গোবর্ধন নিষ্পলক নেত্রে দেখতে থাকেন। এমন অদ্ভুত দৃশ্য, ওঁরা এ জীবনে দেখেন নি—

হর্ষবর্ধনদের ঘাড়ে নয়, এই যা রক্ষা। আপাতঃ বিপদ-সঙ্কুল পথে ট্রেনটা স্বভাবতঃই দ্বিধাভরে অগ্রসর হচ্ছিলো, বোমার আঘাতে, এতক্ষণে সত্যিই দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ে একেবারে দু-আধখানা হয়ে যায়।

টিকটিকির ল্যাজ কাটা পড়লে সে যেমন মুহূর্তের জন্যেও দাঁড়ানো সমীচীন মনে করে না, এমন কি পেছনে ফিরে তাকায় না আর, নিজেকে নিয়েই সোজাসুজি ছুট মারে—তার পরিত্যক্ত অপভ্রংশের দিকে ভ্রূক্ষেপ করে না পর্যন্ত, রেলগাড়ীটাও তেমনি ইঞ্জিনের দিকের অর্ধাংশে নিয়ে বৃথা কালক্ষেপ না করে, সমস্ত দ্বিধা দ্বন্দ্ব এবং বিচ্ছিন্ন প্রত্যঙ্গকে ফেলে রেখেই চটপট চম্পট দেয়। সটান ম্যাড্রিডের দিকেই উধাও হওয়া পলাতক অর্ধাঙ্গে যারা ছিল তারা বেঁচে গেল এ যাত্রার মতন। এদিকে গাড়ির পেছনের দিকটায় ছিলেন হর্ষবর্ধন আর গোবর্ধন, তাঁরা সদলবলে ধরা পড়লেন জেনারেল ফ্রাঙ্কোর জার্মান-বাহিনীর খপ্পরে।

দুরদৃষ্ট আর বলে কাকে!

কিন্তু দূরদৃষ্টি থাকলে দুরদৃষ্টের হাত থেকে বাঁচা যায়। হর্ষবর্ধনের এই দূরদৃষ্টি ছিলো, ছেলেবেলা থেকেই ছিলো, স্বভাবতঃই ছিলো। জার্মান সেনানী যখন তাদের সবাইকে ঘেরাও করে, তাদের দলপতি এগিয়ে এসে, হাত তুলে নাৎসী সেলাম ঠুকে অভিনন্দন জানায়—'হেইল্ হিটলার!' তখন তারা ভাবে, তাদের কাকে সম্বোধন করছে কে জানে! তাদের উদ্দেশেই হাঁক পাড়ছে হয়ত বা, এইনা ভেবে···

হর্ষবর্ধনও ঠিক সেই কায়দাতেই হাত তুলে তেমনি বলেন, 'হেই হ্যাটলার'। হর্ষবর্ধন নির্ভীক, সঙ্কোচ কি কুণ্ঠা নেই, সহাস্যমুখ হর্ষবর্ধনের। আধগাড়ী সবাই, ভূতপূর্ব যাত্রী এবং সম্প্রতি বন্দী, যাবতীয় লোকের মধ্যে একমাত্র কেবল হর্ষবর্ধনেরই হাত ওঠে, একলা তাঁরই হর্ষধ্বনি শোনা যায়।

গোবরকে তিনি চাপা গলায় দাব্ড়ে দেন—'এই, করছিস কি? হাত তোল! চেঁচা! নইলে কোরবানি করে ফেলবে যে!'

গোবর্ধন হাতটা তোলে কেবল। অতি কষ্টে।

'চেঁচা! যে বিয়ের যে মন্ত্র, জানিসনে? বল—হেই হ্যাটলার।'

গোবর্ধন চেঁচায়—'হুই হুটলার।'

ফলে জার্মান দলপতি ওদের দু'ভাইকে দলভুক্ত করে নেন—নাজী পক্ষীয় ভেবে। বাকী সব পাজীদের—তাঁর মতেই অবশ্যি—বন্দী করে, কোর্টমার্শাল করা হয় অর্থাৎ বন্দুকের সামনে সারি সারি সাজিয়ে দুড়ুম্ ঠুকে দেওয়া হয়—পরের পর।

প্রত্যেক দুড়ুমে হর্ষবর্ধনের পিলে চমকায়, আর উনি বলতে থাকেন, 'ছি ছি! কী খারাপ জায়গাতেই না এসে পড়া গেছে। কিন্তু ঐ অব্যর্থ মন্ত্র···হায় হাটলার, কিছুতেই ভুলিসনে যেন গোব-গোবরা! ঐটা বললাম বলেই বেঁচে গেলাম এ-যাত্রা! ভালো করে মুখস্ত করে রাখ। তাহলেই এরাজ্যে টিঁকে থাকতে পারবি কোনো গতিকে।'

অতঃপর হর্ষবর্ধনরা ফ্রাঙ্কোর দলের সঙ্গে, ওদের সহযাত্রী হয়ে, দলীয়ান ও বলীয়ান হর্ষবর্ধন ম্যাড্রিডের দিকে অগ্রসর হতে থাকেন···ম্যাড্রিড-বিজয় করার দুরাকাঙ্ক্ষা নিয়ে।

কয়েকদিন ওদের সঙ্গে মিশেই অনেক কিছু শিখে ফেলেছেন উনি, এমনকি 'হেল হিটলারের' সম্যক অর্থও ওঁর মালুম হয়ে গেছে। ফ্রাঙ্কোর দলের মধ্যে স্পেনীয় ছিলো, ইতালীয় ছিলো কিন্তু ইংরিজি বিদ্যায় তারা সকলেই সমান পারদর্শী, হর্ষবর্ধনের সমকক্ষেই প্রায়, কাজেই ভাবের আদান প্রদানে ওদের কোনো পক্ষেই কোনো অসুবিধে হয়নি।

কেবল 'হেইল্ হিটলারের' সদর্থ জেনে হর্ষবর্ধন একটু অসন্তুষ্টই হন: 'আমি ভেবেছিলুম কোনো দেবতা-টেবতা, আরে ছাই, এ যে মানুষ রে! একটা মানুষের হিটলার। হাতী-ঘোড়াও না চারপেয়েও নয়, একেবারেই মানুষ।'

গোবরা বলেছে: 'কেন, মানুষ কী খারাপ? মানুষ যদি মানুষের মতো মানুষ হয়, যদি অবতার হয়—?'

'মানুষের মতো মানুষ না কচু! মানুষের মতো জন্তু বলতে পারিস বরং। মানুষ-মারা মানুষকে আর অবতার বলে না!'

পাছে কী অনর্থ বাধে, দৈবাৎ যদি বাংলা বুঝেই ফেলে ব্যাটারা, গোবর্ধন দাদার মুখে হাতচাপা দিয়েছে।

হাতের চাপকে অগ্রাহ্য করে তার ফাঁক দিয়েই হর্ষবর্ধনের বাক্যস্ফূর্তি হয়েছে—'হ্যাঁ হ্যাটলার যদি হয় তবে আমরাই বা কী কম অবতার রে? আমরাও তো গাছমারা মানুষ! কত গাছকেই তো কেটে ছেঁটে ধরাশায়ী করলাম! মানুষের মতোই অকাতরে কচুকাটা করে—'

গোবর্ধনকে মানতে হয়েছে—'হ্যাঁ, সত্যিই, আমরাও অবতার কম নই কিছু! অন্ততঃ গেছো-অবতার তো বটেই!' আত্মপ্রসাদে

হর্ষবর্ধ'র বুক কেঁপে উঠেছে: 'নেহাৎ পক্ষে হাফ অবতার তো নিশ্চয়ই হবো আমরা ?'

তারপরেই তিনি অন্তরের মৎলব ফাঁস করেছেন এবার দেশে ফিরেই, তাঁর লোক জন কর্মচারীদের দিয়ে নিজেকে 'হেই হর্ষবর্ধন!' বলে ডাকাবেন—সদাসর্বদাই ডাকাবেন—আখচারই ডাকাবেন! ও রকম শুনতে বেশ ভালোই লাগবে ওঁর। ইতিমধ্যে অবশ্য বাইরে চেঁচিয়ে ডাকার দুঃসাহস তাঁর হয়নি—তবে মনে মনে চেঁচিয়ে নিজেকে তিনি ডেকে নিয়েছেন, ভালো করেই দেখে নিয়েছেন। মন্দ শোনায়নি নিতান্ত! তবে ওটা একটু ইংরিজি করে আরো সংক্ষিপ্ত ও সহজ করে 'হেই হাবাড়ডন্' করে নিলে শোনায় আরো ভালো।

এ পর্যন্ত গোবর্ধনের সঙ্গে তাঁর মতদ্বৈধ হয়নি, কিন্তু এর পরেই বেধেছে গণ্ডগোল। হর্ষবর্ধনকে দাদা ছাড়া অন্য কোনো সম্বোধনে ডাকতে সে কিছুতেই প্রস্তুত নয়। অথচ হর্ষবর্ধনের ইচ্ছা যে সেও 'হেই হাবাড়ডনের' দলভুক্ত হয়। পরিশেষে এইভাবে রফা হয়েছে: দেশে ফিরে তবেই তো ডাকাডাকি ? আগে দেশেই ফেরা যাক। আদৌ ফেরা যাবে কিনা সেখানেই যে সন্দেহস্থল—দু'জনারই সমান সংশয় সেখানেই।

মাইলের পর মাইল হেঁটে—কত মাইল আন্দাজ করা কঠিন, অবশেষে ওরা এসে পৌঁচেছেন ম্যাড্রিডের সম্মুখে। ম্যাড্রিড অবরোধ করে বসে আছেন ওঁরা। ফাঁক পেলেই ওর ভেতরে, ওই অবরুদ্ধ শহরের ভেতরেই ঢুকতে হবে নাকি, আজ-কালের মধ্যেই সবেগে এবং সতেজেই ঢুকতে হবে—এই রকম আশঙ্কা হয় হর্ষবর্ধনের।

'ঢুকতে গেলেই কি ওরা সহজে ঢুকতে দেবে ? শহরের মধ্যে ওৎ পেতে আছে যারা?' গোবরা বলে, 'গুলি ছুঁড়তে পারে হয়তো।'

'পারেই তো!'

'তাহলে তো প্রাণ হারাবার ভয় আছে আমাদের ?' সংশয়টা আর প্রকাশ না করে পারে না গোবরা—'নেই কি দাদা ?'

'তাতো আছেই।' হর্ষবর্ধন বুক ফুলিয়ে বলেন : 'যুদ্ধ করা কি চারটিখানি নাকিরে ? ওতে প্রাণ বাঁচানোই দায়।'

গোবর্ধন বলে : 'প্রাণ দিতে হলে লোকে দেশের জন্যেই প্রাণ দেয়। বিদেশের জন্যে শেষটা বেঘোরে মারা যাবো দাদা ?'

'প্রাণ দেয়া নিয়ে কথা। প্রাণ দেয়াই হলো আসল।' হর্ষবর্ধন জবাব দিয়েছেন, অত্যন্ত উদাসীনের মতোই : 'মারা গেলে তখন দেশই বা কি—আর পরদেশই বা কি! কোন দেশের কার জন্যে প্রাণ দিলুম ভেবে মন খারাপ করে কোনো লাভ নেই।'

লাভালাভের কথাটাই কিন্তু খতিয়ে দেখছে গোবর্ধন। তখন থেকেই মনটা খচ্‌খচ্‌ করছে তার। কেবলই তার মনে হয়, বিদেশে এসে শেষটা বাজে খর্চা হয়ে যাবো, প্রাণটা দিয়ে ফেলবো অপর-দেশের জন্যে ? পরের দেশোদ্ধারে প্রাণপাত করায় কী পরমার্থ ? ফয়দাটাই বা কী ? কেন, স্বদেশ কি ছিলো না গোবরাদের—তার জন্যে অক্কা পাওয়া কী যেত না একেবারেই ? চেষ্টা চরিত্র করলে ?

ইত্যাকারে অগুনতি প্রশ্ন ওর মনে এসে উঁকি-ঝুঁকি মারে। অবশেষে বেফাঁস করেই ফেলে, 'না দাদা, এটা ভালো হচ্ছে না।'

'কী ভালো হচ্ছে না ?'

'এই বিদেশের জন্যে মরাটা।'

'তোর মতলবটা কী শুনি ?' হর্ষবর্ধন দারুণ গম্ভীর হয়ে যান : 'নিতান্তই বেঁচে থাকতে চাস নাকি অনন্তকাল ?'

'না, বাঁচতে আমি চাইনে।' গোবর্ধন ঘোরতর আপত্তি করে—'বেঁচে আবার থাকে মানুষ ? বেঁচে লাভ ? তবে আমি দেশে গিয়ে দেশের জন্যেই মরতে চাই। বিদেশের জন্যে মরাটা কোনো কাজের কথা নয়।'

'যুদ্ধ কোথায় তোর দেশে? যুদ্ধ?' হর্ষবর্ধন ভারী খাপ্পা হয়ে ওঠেন এবার: 'যুদ্ধ কি বাধে, না, বেধেছে—কখনো সেখানে?'

জবাব দিতে পারে না গোবরা। দাদার কথা মিথ্যে না। হর্ষবর্ধন আরো রাগ করেন: 'মরবার সুযোগই নেই স্বদেশে সেই এক হাসপাতাল ছাড়া। আর উনি মরতে চান স্বদেশে গিয়ে। ভারী ওঁর স্বদেশ!' হর্ষবর্ধন ঠোঁট বেঁকান।—'কী আবদার!'

স্বদেশের অপমান গোবরার প্রাণে লাগে। সে বলে, 'বিদেশে যুদ্ধে মরার চেয়ে স্বদেশে আত্মহত্যা করাও ভালো।'

'তবে যা, মরগে যা তুই স্বদেশে গিয়ে।' হর্ষবর্ধন শেষ জবাব দিয়ে দিয়েছেন।—'এখানে দাঁড়িয়ে আছিস কেন তবে? স্বদেশেই চলে যা। আমি চাই না তোকে। আমি কিন্তু এখানেই মরবো। এই ইসপেনেই—এই যুদ্ধেই, আলবৎ!' পুনশ্চ তিনি যোগ করছেন: 'এখানে গোলার মুখে মরতে কী মজা! আঃ!' আরামে ওঁর চোখ বুজে এসেছে: 'মরবোই তো! দেখি কে বাঁচায় আমায়—দেখি?'

এরপর গোবরা একেবারেই চুপ মেরে গেছে—আর কী বলবার আছে তার? এর পর চালাতে হলে, নিতান্তই তাকে পা চালাতে হয়, কথা আর চলে না। কিন্তু এই পাঁচ হাজার মাইল দূর থেকে পায়ে হেঁটে, স্বদেশে যাওয়ার চেয়ে, যমের বাড়ী যাওয়া—এমন কি এই বৈদেশিক বিভ্রাটে বিজড়িত হয়ে—হ্যাঁ, বোমার মুখে যাওয়াও ঢের সোজা। কাজেই দাদার সঙ্গে এক যাত্রায় মরণপথের পথিক হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হবার জন্যই সে প্রস্তুত হয়েছে।

ভালো করে ভেবে দেখলে, মারা যাবার পর কিছুই আর বাকী থাকে না—না কোনো সমস্যা, না কারোদুর্ভাবনা; প্রাণ গেলে আর রইলো কী? তখন আর মাথা ব্যথা করে লাভ? কি জন্যে মরলুম, কার জন্যে মরলুম, কোথায় বা মরলুম—মরলুমই বা কেন—আদৌ মরলুম কিনা তাও জানবার উপায় নেই তখন। অতএব মরা নিয়েই

হলো কথা—মারা গেলে কথাও চুকলো, কাজও খতম্। তাছাড়া দেখতে গেলে, নিজের দেশের জন্যে প্রাণ সবাই দেয়, গরু-বাছুরেও দিয়ে থাকে—তারাও কিছু বিদেশে গিয়ে দেহত্যাগ করে না—সে আর এমন বেশী কথা কি? কিন্তু বিদেশের জন্যে মরতে যায় কে? ক'টা যায়? এই কারণে, সমান মারাত্মক হয়েও, বিদেশের জন্য মরাটাই বেশী সার্থক—হর্ষবর্ধনের এই সার সিদ্ধান্ত, অনেক ভেবে-চিন্তে, সন্ধ্যা নাগাদ, নিঃসন্দেহে, পৌঁছে গেছে গোবরা।

যখন প্রাণ দেয়া নিয়ে মাথা ঘামাবার কিছুই রইলো না, তখন ওরা দু'ভাই, নিশ্চিন্ত মনে, যুদ্ধক্ষেত্রের ইতস্ততঃ এধারে-ওধারে সর্বত্রই নিরুদ্বেগেই চরে বেড়াতে শুরু করে দিলো। দু-একটা গোলা-গুলি ছিটকে এসে, হাওয়ার ঝটকা মেরে সাঁ করে চলে যায় নাক-কানের আশ-পাশ দিয়ে—গ্রাহ্যই করে না ওরা! মৃত্যুর সঙ্গে গায়ে পড়ে কোলাকুলি বাধাতেই যেন ব্যাকুল হয়ে বেরিয়ে পড়েছে।

'দূর, এমনি করে ঘাঁটি আগলে পড়ে থেকে লাভ কী?' হর্ষবর্ধন কন: 'বাজে সময় নষ্ট করা কেবল!'

গোবর্ধন অনুযোগ করে: 'ফ্রঙ্কোর লোকেরা গালে হাত দিয়ে ভাবছে সব বোধহয় যে, কী করা যায় এখন!'

'জেনারেল মশাই বোধহয় ভেবেছিলেন যে, উনি আসামাত্রই ম্যাড্রিডের লোকরা দরজা খুলে সমাদরে ওঁকে অভ্যর্থনা করবে।'

'ম্যাড্রিড দখল করা ওসব ফ্রাঙ্কো-ট্রাঙ্কোর কর্ম না।' গোবর্ধন বলে, 'ম্যাডরাসই নিতে পারতো কিনা কে জানে, তো ম্যাডরিড।'

'রাসলীলাটা দেখা হলো না জীবনে'—হর্ষবর্ধন দুঃখ করেন—'পাগলদের রাসলীলা!'

'ম্যাডরিডে ঢুকতে পেলে অনেক কাণ্ড দেখতে পাবো দাদা।' গোবর্ধন দাদাকে সান্ত্বনা দেয়—'রাসলীলার কম কিছু হবে না সে। ঢুকি তো আগে একবার!'

'হ্যাঁ, ঢুকতে পেলে তো!' হর্ষবর্ধনের ক্ষোভ যায় না।—'দু'দলে মিলে যা মৎলব এঁটেছে দেখছি, তাতে এরাও ঢুকছে না—ওরাও দিচ্ছে না ঢুকতে।'

'দু'দলের মধ্যে কোনো ষড়যন্ত্র হয়নি তো দাদা?'

'বিচিত্র নয়!' হর্ষবর্ধন মাথা চালেন: 'হলেই হলো। জংলীদের মধ্যে সবকিছু হওয়াই সম্ভব। আশ্চর্য কি?'

'এক কাজ করা যাক দাদা—' গোবরা বলে: 'এসো আমরা বরং কাজে লাগি। এদের ষড়যন্ত্র ভেঙে দিই না কেন?'

'কী করে শুনি?' হর্ষবর্ধন সামান্যই উদ্গ্রীব হন।

'আমরা দু'জনেই এগিয়ে গিয়ে আক্রমণ করি না কেন? আমরা দু'জনেই তো ম্যাডরিড জয় করে ফেলতে পারি।'

'কুল্লে এই দু'জনে? তুই আর আমি—এই দু'জনায়?' হর্ষবর্ধনের সংশয় হয়—'দু'জনে মিলেই ম্যাডরিড দখল করে নেবো, বলিস কি?'

'এমন কি অসম্ভব দাদা? হনুমান যে একা একাই লঙ্কা জয় করেছিলো! আমরা পারবো না? কী যে বলো তুমি? তুমি—তুমি তো একাই একশ'। তাই নয় কী?'

হর্ষবর্ধন খুশি হন, 'তা বটে। সে কথা বটে!' উনি যে একাই একশ'র সমকক্ষ, সে বিষয়ে কোনোদিনই ওঁর কিছুমাত্র সংশয় ছিল না।

'আর আমিও একশ'।' গোবরা বলে, 'দু'জনে মিলে আমরা দু'শ। হলাম কিনা, বলো?'

গোবরা—গোবরাজাতীয়দের একশ'র সমান হলেও হতে পারে—কিন্তু একজন হর্ষবর্ধনেরও সমকক্ষ হওয়া কিছুতেই ওর পক্ষে সম্ভব নয়,—এই রকমই কুসংস্কার বদ্ধমূল ছিলো হর্ষবর্ধনের। সেই সনাতন ধারণা থেকে তাঁকে টলানো যায় না—তিনি প্রতিবাদ করতে চান।

গোবরা বলে : 'বেশ, কত তবে, আমরা দু'জনে মিলে? তুমিই বলো—একশ' পঁচানব্বই ? না? একশ' আশী? তাও নয়? তবে কি একশ' পঞ্চাশ ? একশ' চৌত্রিশ? একশ' তের? এত কম হবো আমি?' গোবরার গলা ভারী হয়ে আসে।

'না না, তার বেশী—তারও বেশী।' ভাইয়ের মনে ব্যথা দিতে প্রাণে লাগে দাদার। ভাইকেও মনঃক্ষুণ্ণ করবেন না অথচ সত্য-বাদীতারও পরাকাষ্ঠা হবে—এক ঢিলে দু' পাখী মারার মৎলব তাঁর। 'আরো কিছু ওঠ।' তিনি বলেন।

গোবরা আরো কিছু ওঠ: 'একশ' বাহান্ন? আরো বেশী? একশ' বাষট্টি? আরো? পঁয়ষট্টি? য়্যাঁ—একশ' পঁয়ষট্টি? আরো বেশী বলছো? একশ' উনসত্তর?'

'একশ' বাহাত্তর হলেই ঠিক হবে।' চুলচেরা বিচার করে বলেন হর্ষবর্ধন।—'তুই আমার চেয়ে আটাশজন কম—সেই যথেষ্ট।'

সংখ্যার গোলমাল মিটলে আর কিছু থাকে না তারপর। প্রাণের শঙ্কা তো ছিলোই না ওঁদের—বিদেশের জন্যে জীবন দিতেই বেরিয়েছেন—তবে আর পিছপা হবেন কেন, কার জন্যেই বা?

সন্ধ্যার মুখেই সেই একশ' বাহাত্তরজন দু'টি মাত্র বন্দুক কাঁধে বেরিয়ে পড়ে ম্যাড্রিড আক্রমণে। বিজয় অভিযানে বীরবিক্রমে বেরিয়ে পড়ে—কারুর তোয়াক্কা করে না।

হর্ষবর্ধনরা প্রবল পদবিক্ষেপে যেদিক পানে অগ্রসর হন, সেদিকটার মোহড়া নিয়েছিলেন লা-পাসানোয়ীয়া। স্পেনীয় এই মেয়ে সেনাপতির নাম খবরের কাগজের দৌলতে তোমরা শুনেছো বোধ করি। সেদিনকার সংগ্রামের সেই সমারোহে মেয়েরাও যে যোগ দিয়েছিল এই সংবাদও তোমাদের অজানা নয় নিশ্চয়।

লা পাসানোরিয়া! এই নামে পাষাণেরও হিয়া বিক্ষুব্ধ হয়। অবশ্য হর্ষবর্ধনদের বিচলিত হবার ছিলো না কিছু। ও-নামের

লেশমাত্রই তাঁদের কানে প্রবেশ করেছিল কিন্তু উনি যে কী বস্তু তা তারা ধারণা করেনি কোনোদিন। জানা তো দূরের কথা।

জেনারেল ফ্রাঙ্কো পর্যন্ত যাঁর সম্মুখীন হতে সহজে রাজি হতেন কিনা সন্দেহ, অসমসাহসী ও অসহায়, সেই একশ' বাহাত্তরজন বীরপুরুষ, ওরফে ওরা দু' ভাই, একবারে সোজাসুজি, তাঁরই হুদ্দায় গিয়ে হাজির হয়।

'ছাখো দাদা ছাখো—!' গোবর্ধন দাদার দৃষ্টি আকর্ষণ করে— 'ঐ গর্তগুলোর ধারে ধারে—বস্তাগুলোর আড়ালে আড়ালে— কিনারে কিনারে—মেয়েরা নয় সব ?'

'দূর !' না দেখেই হেসে উড়িয়ে দিলেন হর্ষবর্ধন : 'মেয়েরা কেন মরতে আসবে যুদ্ধে ? পাগল হয়নি তো তারা !' কিন্তু দেখামাত্রই ওঁর চক্ষু ছানাবড়া হয়—'য়্যাঁ, তাইতো রে ! মেয়েরাই তো···সৈন্য সেজেছে সবাই দেখছি···তাজ্জব !···'

এবং দুর্দৈবক্রমে সঙ্গে সঙ্গে মেয়েরাও তাঁদের দেখতে পায়। এবং দেখতে না দেখতে ঘেরাও করে ফেলে।

চারদিকেই খাড়া-করা বন্দুক, প্রত্যেক মেয়ের হাতেই, এবং খুব সম্ভব এয়ার গান নয়—হর্ষবর্ধন লক্ষ্য করেন—সত্যিকার বন্দুক বলেই তাঁর সন্দেহ হয়। এবং যেটুকু সংশয়ও বা ছিলো, একজনের হাতে আচমকা একটা সঙীনের খোঁচা খেয়ে মুহূর্তেই তা উপে যায়।

হর্ষবর্ধন আর্তনাদ করে ওঠেন। জীবনে সঙীন ব্যাপারের সম্মুখীন তিনি এই প্রথম—এ-সব খাদ্যাখাদ্যের সঙ্গে তো তাঁর পরিচয় ছিলো না এর আগে, কল্পনাও করতে পারেন নি কখনো।

'খুব লেগেছে নাকি, দাদা ?' জিজ্ঞেস করে গোবরা।

'দূর, লাগবে কি ? লাগে নাকি কখনো ?' যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করে হর্ষবর্ধন বলেন : 'লাগার কী আছে ওতে ? আর যুদ্ধ করতে

গেলে অমন একটু আধটু লাগে। লেগেই যায়, না লেগে যায় না—তাতে কী হয়েছে?'

গোবর্ধন প্রবোধ মানে না, যে মেয়েটি দাদাকে খুঁচিয়েছিলো তার দিকে সে বন্দুক ওঁচায়।

ব্যস্ত হয়ে বাধা দেন হর্ষবর্ধন: 'আরে আরে, মেয়েছেলে যে!'

'মেয়েছেলে না হাতী!' গোবরা তখন ক্ষেপে গেছে, 'মেয়ে-মানুষের বাবা ওরা—পাপ নেই ওদের মারলে।'

'ছিঃ, গোবরা—আমরা তো এদের মতো অসভ্য হইনি, জঙ্গলের লোক হলেও জংলী নই, আমরা আর্যসন্তান, সনাতন কাল থেকেই সুসভ্য, মেয়েদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে নেই আমাদের। নইলে আমিই কি আর মারতে পারতুম না? আমার কি বন্দুক ছিল না? যুদ্ধ করতেই তো বেরিয়েছি!'

গোবর্ধন হাত নামায়—'আচ্ছা, গুলি না করি, শুধু বন্দুক দিয়ে যদি পিটি—দু' এক ঘা পিটে দিই কেবল—তাহলে?'

'তাহলেও দোষ। আমরা আর্যরা মেয়েদের সামনে একেবারে নিরস্ত্র।' এই বলে হর্ষবর্ধন নিজের বন্দুক ছুঁড়ে ফেলে দেন দূরে। 'ওরা যদি মেয়ে না হয়ে নিছক গরুও হতো, তাহলেও তাই করতাম। গরুদের সঙ্গেও আর্যরা লড়ে না যুদ্ধ করে না।'

'পেরে ওঠে না, তাই। গোবর্ধন গজরায়—'গুঁতিয়ে দেয় পাছে, সেই ভয়ে।'

'কেন, পড়িসনি রামায়ণে?' হর্ষবর্ধন স্মৃতিশক্তির রোমন্থনে পুরাতন পঙ্কোদ্ধার করেন:

'মকরাক্ষ এসেছিলো বুদ্ধি বড়ো সরু। রথে বেঁধে এনেছিলো তিন জোড়া গরু। ফল হলো কি, না, রামচন্দ্র বাণ ছুড়তেই পারলেন না।'

'সোজা পিটটান দিলেন?'

'কী করলেন মনে নেই। তবে গো-হত্যা করেন নি ঠিকই। তাহলে লিখতো রামায়ণে।' তারপর আন্দাজ পান: 'মনে হচ্ছে বায়ুবাণে উড়িয়ে দিয়েছিলেন গরু সমেত মকরাক্ষকে। নে, ফেলে দে তোর বন্দুক।'

অগত্যা গোবর্ধনকেও বন্দুক ফেলে দিতে হয়। তখন পাষাণ-হৃদয়া লা-পাসানোরিয়ার দলবল ওঁদের বন্দী করে নিয়ে যায়।

ভেতরে গিয়ে হর্ষবর্ধনরা দেখেন, তাঁদের দলের আরো কয়েক-জন ধৃত হয়ে হাজির সেখানে। জানা গেল, কতিপয় ইতালীয় ও জার্মান বন্দী সেই মেয়েদের হেফাজতেই রয়েছে।

জিজ্ঞাসাবাদে জানতে পারেন, কোর্ট মার্শালের প্রতীক্ষা করছে তারা। রাত আরো কিছু বাড়লে তাদের সবাইকার বিচার এক-সঙ্গেই শুরু হবে।

'কোর্ট মার্শাল কী, দাদা।' গোবর্ধন প্রশ্ন করে।

হর্ষবর্ধন তাঁর যৎসামান্য ইংরিজির সাহায্যেই বন্দীদের কাছ থেকে বার করে নিয়ে গোবরার কৌতূহল চরিতার্থ করেন, 'এরা বলছে যে, সরাসরি সামরিক বিচার, তার আইন নেই, কি ফাইন নেই—একেবারে সোজাসুজি নিকেশ করে দেওয়া। মানে কিনা, প্রাণদণ্ড।'

'য়্যাঁ, ঝুলিয়ে দেবে নাকি! বলো কি দাদা?'

'উঁহু। ফাঁসি নয়—ভয় নেই তোর—' হর্ষবর্ধন আশ্বাস দেন: 'এরা বলছে যে, গুলি করে মারবে।'

গোবর্ধন বিশেষ ভরসা পায় না।

হর্ষবর্ধন বলেন: 'বিশ্বাস হয়না আমার। মেয়েরা কখনো গুলি করতে পারে? ছুঁড়তে পারে বন্দুক? পাগল, ছুঁড়তে গেলেই উল্টে পড়ে যাবে না তক্ষুণি!'

'তবে—তবে কোর্ট মার্শাল বলছে যে!'

'সেকি পুরুষদের মতো সেই ধরনের হবে? এদের কোর্ট মার্শাল নিশ্চয় আলাদা রকমের।' হর্ষবর্ধন ব্যক্ত করেন: 'হয়তো কোর্টশিপের মতন কিছু হতে পারে। সেও তো মেয়েদের কাণ্ড!'

'কোর্টশিপ আর কোর্ট মার্শাল কি এক হলো, দাদা?'

'নয় কেন? তাতেও আদালত আছে, এতেও আদালত। কোর্ট মানেই তো আদালত? তবে ওতে হচ্ছে ছাগল নিয়ে টানাটানি।'

গোবরা ঘাড় নাড়ে—'উঁহু। শিপ মানে ভেড়া, ছাগল না।'

'বেশ ভেড়াই হলো, ও একই কথা।' হর্ষবর্ধন মেনে নেন। 'ভেড়া আর ছাগল কি আলাদা? দু'জনেই সমান সুখাদ্য—।'

'তা বটে। পায়ের সংখ্যা, শিং আর আওয়াজ প্রায় সমান।' গোবরা বলে—'কেবল এক চুলের তফাৎ যা। দুজনের গায়ের চুল দুরকম।'

'কোর্টশিপে হলো গে ভেড়া নিয়ে টানাটানি, আর এটাতে, এটাতে—প্রাণ নিয়েই টানাটানি কিনা, কে জানে।'

কোর্ট মার্শাল শুরু হয়ে যায় ততক্ষণে। মুহূর্তের মধ্যে একজন জার্মানের প্রাণদণ্ডের হুকুম জারি হয়।

তারপর সে বেচারীকে তো নিয়ে গিয়ে দাঁড় করানো হয় দু'জন বন্দুক-ধারিণীর সামনে। সে কি দাঁড়াতে চায় সহজে? মেয়েছেলের সামনে দাঁড়াতে তার লজ্জা করে, তাদের হাতে মারা যেতে কেমন যেন সঙ্কোচ হয়। বার বার তাকে খাড়া করা হয়, সে বসে পড়ে।

তখন কোর্ট মার্শালের দ্বিতীয় হুকুম জারি হয়: 'আচ্ছা, আয়েস করেই মরতে দাও ওকে। বসে বসেই মারা যাক!'

প্রহরিণীদের দু'জনেই বন্দুক ছোঁড়ে, প্রথমে আলাদা আলাদা, তারপর যুগপৎ, তারপরে যদৃচ্ছাক্রমে—কিন্তু ত্রিশ-বত্রিশবার গুলি

বৃষ্টির পরেও, লোকটা ঠায় বসেই থাকে। শুয়ে পড়ে না। একটাও গুলির ছোঁয়াচ লাগে না তার গায়।

প্রথমে বেচারীর চোখ কপালে উঠে গেছলো। এখন ক্রমশঃ ওর মুখে হাসির আভাস দেখা যায়—সলজ্জ হাসি। সে এবার হাত-পা ছড়িয়ে ভালো হয়েই বসে—তোফা আরাম করেই। বিনা পয়সায় ম্যাজিক দেখছে যেন।

হর্ষবর্ধন এতক্ষণে রুদ্ধ নিশ্বাস পরিত্যাগ করেন। গোবর্ধনও হাঁপ ছাড়ে।—'ওঃ, এই এদের কোর্ট মার্শাল!'

'তখনই বলেছি আমি, বন্দুকের কর্ম না মেয়েদের।' হর্ষবর্ধন বলেন, 'অস্ত্র ওদের ধর্তব্যেই নয়। হাতা কি খুন্তি হলে ভয় ছিলো বরং। মেরে ফেলতো এতক্ষণে! খুঁচিয়েই মেরে ফেলতো।'

বন্দুকধারিণীদের এবার অবসর দেওয়া হয়। যণ্ডা-গোছের দুটি মেয়ে এগিয়ে আসে অতঃপর। মৃত্যুদণ্ডিত মৃদুহাস্যপরায়ণকে পাকড়াও করে' কাছাকাছি একটা বাড়ীর গাত্রসংলগ্ন স্পাইরাল সিঁড়ি বেয়ে টেনে নিয়ে চলে—সেই বাড়ীরই তিন তলায়।

ওরা দু-ভাই অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে—এ আবার কী রহস্য! কোর্ট মার্শালের পালা শেষ হয়ে কোর্টশিপের পালা শুরু হলো নাকি এবার? হর্ষবর্ধন মাথা ঘামান।

সেই বাড়ীটাই সেখানে কাছাকাছি এবং একমাত্র বাড়ী। যে স্থলে মারাত্মক আদালতটা বসেছিলো, সেটা শহরের প্রান্তসীমায়। প্রায় মিলিটারী ঘাঁটির আওতায়। তার চারধারের বাড়ীঘর বোমার কুদ্রতে খুব কমই আস্ত ছিলো। এই বাড়ীটিই কেবল বিধ্বস্ত হতে হতে বেঁচে গেছে কোনক্রমে। লা-পাসানোরিয়ার ঘাঁটিওয়ালিদের আস্তানা হয়েছিলো তাই এখানেই।

বাড়ীটার পাশে ট্রেঞ্চের মধ্যে দিয়ে, সামরিক উদ্দেশ্যে খাল কাটা হয়েছিলো—দুর্দমনীয় স্রোত সেই খালে।

গোবর্ধন সেইদিকে ভ্রূক্ষেপ করে : 'হাত-পা বেঁধে ওই খালে ফেলে দিলেই পারে ব্যাটাকে। এক্ষুণি ল্যাটা চুকে যায়।'

হর্ষবর্ধন ভাইয়ের মুখ চাপা দেন : 'ওদের আর বুদ্ধি বাৎলাসনি, গোবরা।' জলে ডুবে মরতে ভারি ভয় হর্ষবর্ধনের। মারা যাবার যাবতীয় প্রণালীর মধ্যে ওতেই ওঁর সব চেয়ে বেশী অরুচি।

'হ্যাঁ, ওরা আবার বুঝবে ?' গোবরা বলে।—'বাংলা বোঝে নাকি ওরা ?'

'বুঝতে কতক্ষণ ? ওদের যদি আমার ইংরিজি বোঝাতে পারি—ওদের ইংরিজি বুঝতে পারি—' স্পেনীয়দের ইংরিজি হর্ষবর্ধনের কাছে, উড়েদের কাছে বাঙালীর হিন্দি বাৎচিতের মতোই জলবৎ-তরলং।—'আর ওরা বুঝবে না আমাদের বোলচাল ? কী যে বলিস তুই !'

ততক্ষণে জার্মানটাকে নিয়ে ওরা দাঁড় করিয়েছে তেতলার খোলা বারান্দায়। বারান্দার একটা দিক যেন ঠেলে বেরিয়ে এসেছিল বাড়ীর থেকে—যেমন অদ্ভুত বাড়ী, তেমনি তার সিঁড়িটা।

দুই ভাই ঊর্ধ্বমুখে, উৎসুক চোখে তাকিয়ে দেখেন—জার্মানটাকে ওরা বারান্দার কিনারায় টেনে এনে ধাক্কিয়ে দেয় একদম তলার দিকে। নীচের অন্ধকার আবছায়ার মধ্যে। অধঃ-পতনের মুখে ঠেলে দেয় এক ধাক্কায়।

চরম মুহূর্তে এসে জার্মানটা জানতে পারে যে তার চূড়ান্ত মুহূর্ত সন্নিকট। কিন্তু এক মুহূর্তেই সে প্রস্তুত হয়ে নেয়। এতক্ষণে সে আপনমনেই মুচকি হাসছিলো, কিন্তু হাসিটা আপততঃ স্থগিত রাখে। ওপর থেকে পড়তে পড়তেই বলে—'হেইল হিটলার !' হাত সটান করে শূন্যমার্গেই বলে। বলতে বলতেই পড়ে। আর যেমনি তার ভূমিসাৎ হওয়া অমনি ছাতু। তৎক্ষণাৎ।

এইভাবে আরও ক'জন জার্মান ও ইতালীয়কে কোতল করা

হয়, পরবর্তীরা কিন্তু সহজে আত্মসমর্পণ করে না। সহাস্যমুখে তো নয়ই। বীরপুরুষের মতোই দারুণ ধ্বস্তাধ্বস্তি বাধিয়ে দেয়। তখন আরো বেশী মেয়ে এসে লাগে, একাধিক ক্ষুদে পিঁপড়ে একটা বিপুল দেহ পিঁপড়েকে যেভাবে বিদেহ করে—অবিকল সেই সিসটেমে—কেউ হাত, কেউ পা, কেউ ঘাড়, কেউ নাক কেউ, বা কান ধরে—অর্থাৎ সকলে মিলে যে যেখানে পারে ধরাধরি করে টেনে হিঁচড়ে প্রত্যেক বন্দীবরকে বধ্যভূমিতে উত্তোলিত করে। আর, প্রায় চ্যাংদোলায় তুলিয়েই ছুঁড়ে দেয় ত্রিশূণ্যে। হেইল্ হিটলার হাঁকবারও ফুরসুৎ পায় না অনেকে।

এগুলো ঠিক যেন কোর্টশিপের নিয়মসঙ্গত হচ্ছে না, হর্ষবর্ধনের মনে হয়।

কিন্তু বেশীক্ষণ মাথা ঘামানোর অবকাশ তিনি পান না। তাঁরও তলব এসে পড়ে। চারজন ষণ্ডা গোছের মেয়ে এসে পাকড়াও করে তাঁকে, হর্ষবর্ধন টের পেলেন যে, তাঁরও আশু উন্নতি আসন্ন—এবং তারপরেই নিদারুণ অবনতি—একেবারে গতাসু হবার ধাক্কাই বলতে পারা যায়।

হর্ষবর্ধন আর্যসন্তান, মৃত্যুর সামনে সহজে ভীত হবার পাত্র নন। প্রথম জার্মানটার মতো অতখানি হাসি তাঁর পায় না অবশ্যি। তবু ঈষৎ হাসবার তিনি প্রয়াস পান। তাঁকে পাঁজাকোলা করবার উপক্রম করতেই তিনি হাত নেড়ে বাধা দেন: 'উঁহু! আমরা আর্যসন্তান, এমনিই আমি যাবো। না সাধতেই। আমাদের পুনর্জন্ম আছে, আবার জন্মাবো আমি, সেইজন্যেই ভয় খাইনে আমরা।' হর্ষবর্ধন উঠে পড়েন, 'চললাম ভাই গোবরা।'

'পিছনেই আছি, দাদা।' গোবরা বলে। 'আমিও যাচ্ছি সঙ্গে।' তাকে কেউ ডাকে না—এখনো প্রাণদণ্ড হয়নি তার—তবু সে দাদার অনুসরণ করে বিনা-আমন্ত্রণেই।

গীতার শ্লোক আওড়াতে আওড়াতে দাদা অগ্রসর হন : 'যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারতঃ। অভ্যুৎ—অভ্যুৎ'—উত্থানের কাছাকাছি এসে আটকে যায় হর্ষবর্ধনের। বারম্বার আটকে যেতে থাকে। কবে সেই বাবাকে আওড়াতে শুনেছেন!

'মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ।'—গোবরা বলে। তারও আবার সেই বাবারই পুনরুক্তি।

'উঁহু-উঁহু।' ঘাড় নাড়েন হর্ষবর্ধন।

'শরীরমাদ্যম্ খলুধর্মসাধনম্?' গোবরার তৃতীয় প্রয়াস।

'উঁহু-উঁহু।' হর্ষবর্ধন ভারী বিরক্ত হন এবার—'খলু ধর্মও না, কলু ধর্মও না, আসল ভগবানের বাণী—চারটিখানি নাকি?' পুনরায় তিনি দুশ্চেষ্টা করেন : 'গ্লানির্ভবতি ভারত :—অভ্যুৎ—অভ্যুৎ—'

'ভগবানের কথার মধ্যে আবার ভূত আসে কেন, দাদা? ভূত কি ভগবানের চেয়ে বড়ো'···গোবরা নিজেই নিজের প্রশ্নের সদুত্তর দেয় তক্ষুনি : 'তা হবে হয়তো। ভগবানের চেয়ে ভূতেরই তো ভয় বেশী।'

'হয়েছে—হয়েছে।' থাতিয়ে ওঠেন হর্ষবর্ধন, ভূতের আলোচনায় তাঁর মনে পড়ে যায় হঠাৎ।—'যদা যদাহি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারতঃ। আত্মবৎ সর্বভূতেষু তদাত্মানম্ সৃজাম্যহম্।

'হ্যাঁ, এবার ঠিক হয়েছে।' গোবরাও উৎসাহ পায়—'সমস্কৃত সমস্কৃত শোনাচ্ছে ঠিক।'

'আমি আবার নিজেকে সৃষ্টি করবো—কিছুতেই মারা পড়ে থাকবো না—বুঝেছিস গোবরা।' হর্ষবর্ধন গুরুতর কণ্ঠে ঘোষণা করেন : 'শাস্তরের কথা! ঐ শোলোকেই বলে দিয়েছে। এতখানি অনাসৃষ্টি বর্দাস্ত করতে পারবো না আমি। কিছুতেই না। হুম্!'

'তাই কোরো, দাদা।' করুণ কণ্ঠে বলে গোবরা—'তবে সৃষ্টির সময়ে আমাকেও যেন বাদ দিয়ো না, মনে রেখো! তোমাকে ছেড়ে

থাকতে পারবো না আমি।' গোবরার গলা ভার ভার।—'ভুলে যেয়ো না যেন আমায়!'

আগে-পিছে মেয়ে বডিগার্ড—সব পেছনে গোবর্ধন—সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে হর্ষবর্ধনের মনে হতে থাকে, আহা, কেউ যদি, ঐ ঝুল বারান্দার নীচেই একটা লম্বা বোম্বাই চাদর এনে টেনে ধরে রাখতো—তাহলে তিনি অনায়াসে লাফাতে পারতেন হাড়গোড়ের মায়া না রেখেই, প্রাণদণ্ডের থোড়াই কেয়ার করে, হাত-পা ছেড়ে দিয়েই লাফাতেন, অকাতরে, অসঙ্কোচে, এমনকি, দারুণ উৎসাহের সঙ্গেই তিনি লাফাতেন—যতবার বলতো ততবারই। কিন্তু হায়, হর্ষবর্ধনের দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে, কোথায় এখন বোম্বাই চাদর, আর কেই বা তা টেনে ধরছে। আর, পতনোন্মুখ হর্ষবর্ধনকে সামলানো একা গোবর্ধনের কর্ম না। তবে হ্যাঁ, তাঁর না হয়ে যদি গোবরার লম্ফ-দণ্ড হতো, তাহলে তিনি কেবল উর্ধ্ববাহু হয়েই, গোবর্ধনকে ধারণ করতে পারতেন চাদরের প্রয়োজনই ছিলো না, রসগোল্লার মতোই লুফে নিতেন ওকে!

হর্ষবর্ধন বারান্দার কিনারায় গিয়ে দাঁড়ান, তাকান নীচের দিকে একবার—মনে মনে তার নীচতার মাপ নেন বুঝি। না, এখান থেকে আছাড় খেলে নিতান্তই দাদৃহারা হতে হবে গোবরাকে। একান্তই পুনর্জন্মের ধাক্কা। নির্ঘাৎ।

উনি প্রস্তুত হন। শেষ চীৎকার ছাড়েন, সেই প্রথম জার্মানটার মতই—মরতে হলে বীরের মতো মরাই বাঞ্ছনীয়।

'হেই—হেই—হেই·········'

চূড়ান্ত মুহূর্তে চরম বাক্যটা তাঁর মনে পড়েনা আর। 'ঐ যাঃ, ভুলে গেছি—কী লোকটার নাম রে? ঐ যা বলে চ্যাঁচায় সবাই!'

গোবরাও ভুলে মেরেছে। আশ্চর্য নয়, এরকম অবস্থায় বাপের

নামই ভুলে যায় মানুষ। নিজের নামই কষ্ট করে মনে রাখতে পারে না।

'তখনই বললাম তোকে মুখস্ত করে রাখতে।'

'আর মুখস্ত করে কী হবে দাদা? এরা তো ও নাম মানবে না, এরা যে তার উলটো দল—'

'তা হোক! মুখ বুজে বেড়ালের মতো মরবো, সেটা কি ভালো দেখায়? বীরের মতো মরছি যে, সেটা এদের জানান দিতে হবে না?'

গোবর্ধন মাথা চুলকোয় দাদার পিছনে দাঁড়িয়ে।

হর্ষবর্ধন এতক্ষণের পর যেন একটু আলো দেখেন—'হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে। কথাটার শেষের আধখানা হচ্ছে 'লার্'—এখন আগের আধখানা হলেই সব ঠিক হয়ে যায়। ঐ যে, ওরা সব মাথায় পরে রে—সাহেব-মেমরা সবাই পরে। বল্ নারে গোবরা।' হর্ষবর্ধন হ্যাট কথাটাকেই মনের মধ্যে হাতড়ান।

'মাথায় পড়ে?' গোবরা মাথা ঘামায়।—'মাথায় আবার কী পড়ে? বাজ? বৃষ্টি? বোমা? তা নয়?—তবে কি কেবল কাকের গু নাকি? তাও না? কম্ফর্টার? পাগড়ী? সে তো মাথায় সবাই বাঁধে। পড়ে বলছো? তাহলে কি ইঁট?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, এইবার হয়েছে—হে-হে-হেল্ ইটলার।' হর্ষবর্ধন লাফাবার জন্যে লাফিয়ে ওঠেন। 'হেইল্—'

গোবর্ধনের খটকা লাগে: 'দাদা, মরবার সময়ে আর বিলিতি দেবতার নাম কেন? আমাদের দিশী দেবতা কি ছিল না?'

'এ তো কোনো দেবতা নয়—অবতার কেবল।'

'আমাদের দিশী অবতার কি ছিলনা—কেন, মহাত্মা গান্ধী?'

কথাটা দাদার মনে লাগে, সত্যিই তো, আর্যসন্তান তিনি, অনার্য অবতারের নাম তাঁর মুখে কেন? মরতে হয়তো বলবো গান্ধীজী কি জয়। মহাত্মা গান্ধী—!

গোবরা ফোঁপাতে শুরু করে : 'দাদা ! দাদা গো—'

'ছি, গোবরা ! কাঁদে না, ছি !'

'ডাকবো তোমায় তাই বলে ?—যা বলেছিলে তুমি ?' দাদার শেষ বাসনাটাই বা কেন অপূর্ণ থাকে ? গোবরা কাঁদতে কাঁদতেই চেঁচায়—'হেই হাবাড়ডান !'

হর্ষবর্ধনও কেঁদে ফেলেন, তাঁর গলা ফেটে আর্তনাদের সুর বেরয় : 'গান্ধীজী—কি জয় !' এবং প্রায় লাফিয়ে পড়েন তিনি।

'জয় মহাত্মা গান্ধীজি কি জয় !'

এমন সময়ে বডিগার্ডরা পিছন থেকে এসে চেপে ধরে তাঁকে—'ষ্টপ ষ্টপ। আর ইউ ইণ্ডিয়ান ? নট নিগ্রো ?'

বাধা পেয়ে ভড়কে যান হর্ষবর্ধন।

'আর ইউ গান্ধীষ্ট ? আর ইউ হিণ্ডুজ ?'

গোবর্ধন বলে—'অফ কোর্স !'

'দেন্ ডোণ্ট জাম্প ! গো অ্যাওয়ে ! ফ্রি ইউ আর !'

দু' ভাইকে ওরা বহিষ্কৃত করে দেয়—নগরের বাইরে। সেই রাত্রেই। চারিদিকে খানা-খন্দ, ট্রেঞ্চ, আর কাটা খাল—অন্ধকারে কোথায় পা বাড়াবেন ? অগত্যা, গোবর্ধন চাপে একগাছে, আর এক গাছে হর্ষবর্ধন তাঁর দেহভার রক্ষা করেন। রাতটা কাটাতে হবে এই ভাবেই।

হর্ষবর্ধনের গাছটায় হেলান দেবার সুবিধা ছিলো। ওরই ফাঁকের মধ্যে কাৎ হয়ে, কাক-নিদ্রার সুযোগে, মাঝে মাঝে দুঃস্বপ্ন দেখছিলেন তিনি। একবার দেখলেন, তিনি খুব বুড়িয়ে গেছেন, যেন বৃদ্ধ প্রপিতামহ আর কি ! আর গোবরা গেছে নেহাৎ বাচ্চা বনে—সেই বাল্যকালের সেকেলে গোবরাটি যেন !

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সম-পিতা হয়ে গোবর্ধনকে তিনি সম্বোধন করছেন : 'বৎস, গোবরা ! যুদ্ধ-বিগ্রহে কাজ নেই, ফিরে যা

তুই! তোর কথাই ঠিক! মরবার পক্ষে স্বদেশই ভালো। এমন কি, বাঁচবার পক্ষেও নেহাত মন্দ জায়গা না।'

আর একবার দেখলেন, গোবরার বৌদিকে। তিনি যেন সিংহাসনে বসে রাণী সেজে কোর্ট মার্শাল করছেন, লা-পাসানোরিয়ার মতোই—আর তাঁর ঠিক পেছনেই দাঁড়িয়ে পাগড়ী-বাঁধা কে ঐ লোকটা? জেনারেল ফ্রাঙ্কোই যেন স্বয়ং না? কী সর্বনাশ!

এবার হর্ষবর্ধনের এমন চমক লাগে যে, গাছ থেকে প্রায় পড়ে যান আর কি। ঘুম ভেঙেই তিনি চোখ কচলে তাকান চারদিকে। নাঃ, দুঃস্বপ্নই। তবু রক্ষা। আরামের নিশ্বাস পড়ে ওঁর। কিন্তু ওটা কি তাঁর সামনে—ঐ মাটিতে পড়ে রয়েছে যেটা? বেশ চোখ কট্‌মটিয়ে তাকিয়ে রয়েছে তাঁর দিকে—ফিকে চাঁদের আলোয়?

কোনো বোমা-টোমা নয় তো? এখানে এবং এখুনি ফাটে যদি, তা'হলেই তো সাবাড় করেছে; তিনি এবং তস্য ভ্রাতা—দু'জনেই একেবারে কাবার তাহলে।

হর্ষবর্ধন আস্তে আস্তে গাছ থেকে নামেন। ওটাকে নিরাপদ ব্যবধানে ছুঁড়ে ফেলাই ভালো। অমন করে চোখ পাকিয়ে অত কাছাকাছি ওটা থাকাতে ওঁর স্বস্তি নেই।

হর্ষবর্ধন নেমে ওটাকে ধরে যতখানি কব্‌জির জোর ছিলো সব দিয়ে যত সুদূরে সম্ভব ওটাকে বিদূরিত করে আবার গাছের ডালে এসে বসেন। নিরাপদে।

এদিকে জেনারেল ফ্রাঙ্কো সেই রাত্রেই ম্যাড্রিড দখলের মৎলব করছিলেন। তিনি গুটি-সুটি মেরে অগ্রসর হচ্ছিলেন সদলবলে—আচমকা ম্যাড্রিডের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বেন, এই দুরভিসন্ধি। হর্ষবর্ধন যখন গাছ থেকে নেমে হাতের জোর ফলাচ্ছিলো, সেই মুহূর্তে তারা তাঁর একশ' হাতের মধ্যে তাঁর হাতের কসরতের কাছাকাছি এসে পৌঁছেচেন।

এবং হর্ষবর্ধন যাকে বোমা মনে করে বিতাড়িত করলেন, সেটা আর কিছু না, আসলে প্রকাণ্ড এক বোলতার চাক—

চাক-ভাঙা বোলতার দল ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়লো গিয়ে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর দলে। আর, তার পরেই বাধলো বিভ্রাট।

উদ্বাস্তু হয়ে ভীষণ ক্ষেপে গেল বোলতারা, কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান লোপ পেলো তাদের, যাকে তাকে কামড়াতে শুরু করে দিলো তারা। যাকে সামনে পেলো তাকেই হুল দিয়ে বিঁধতে লাগলো অকাতরে। আগাপাশতলা বাদ না দিয়ে।

জেনারেল ফ্রাঙ্কো সসৈন্যে বিচলিত হয়ে পড়লেন বিলকুল। মুহূর্তের মধ্যেই সঙ্গীন ব্যাপার—এগুবেন না পেছুবেন ঠাহর পাচ্ছেন না। চোখে দেখা যায় না, গুলি করে ঠেকানোতো যায়ই না—অথচ সঙ্গীন দিয়ে বিঁধছে—এসব কোন্ শত্রু রে? আর কী ভীষণ জ্বলুনি তাদের কামড়ে!

সৈন্যরা সব লাফাতে শুরু করলো। বন্দুক-টন্দুক ফেলেই না! এমন কি, জেনারেল বলে ফ্রাঙ্কোকেও রেয়াৎ করলো না বোলতারা। প্রায় গোটা সত্তর সেঁধিয়ে পড়লো তাঁর প্যাণ্টের ভেতর। তাঁকেই পালের গোদা বলে কি করে যেন জেনেছিলো তারা! ফ্রাঙ্কো চেঁচাতে শুরু করলেন, ফ্র্যাঙ্কলিই তিনি বললেন—'ডেভিলদের সঙ্গে লড়াই করা তাঁর সাধ্য না। তিনি মানুষের সঙ্গেই লড়তে পারেন। ম্যাড্রিড মাথায় থাক, আমি আর এর ত্রিসীমানাতেই নেই।'

প্রথম চোটেই জেনারেল ফ্রাঙ্কোর সেই পলায়ণের বার্তা তার পরদিনই জানল মাদ্রিদের লোকরা।

লা-পাসানোরিয়া তাঁর গুপ্তচরেরা মুখেই খবরটা পেলেন।

পরদিন সকালে তিনি রনাঙ্গন পর্যবেক্ষণে বেরুলেন।

শত্রুপক্ষের একজন লোকেরও চিহ্ন নেই, কিন্তু তাদের সব

চিহ্ন তারা রেখে গেছে—এধারে ওধারে ছড়িয়ে। টহল দিয়ে দিয়ে দেখলেন তিনি।

কামান বন্দুক ট্যাংক ফ্যাংক সব ফেলে তারা পালিয়েছে। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে আছে সেগুলো। বিস্তর বুট, হেলমেট ছড়ানো, এমনকি অনেকের পরণের মিলিটারি শার্ট প্যাণ্ট অব্দি ছড়াছড়ি গড়াগড়ি যাচ্ছে—বোলতার হুল থেকে বাঁচবার (অনেকগুলো করে জামা প্যাণ্টের ভেতরে গিয়ে সেঁধিয়েছিল বোধ হয়) তাগিদে বিলকুল তারা ফেলে পালিয়েছে।

সৈন্যদের রসদ, খানা, আরো নানানখানা চারধারে ছড়ানো।

ব্যাপার কী?

এধারে ওধারে তাকাতে গিয়ে দুই গাছের ডালে দেখতে পেলেন তিনি ভাইদুটিকে। পাসানোরিয়াকে দেখে গাছের থেকে নেমে এলেন হর্ষবর্ধন।

'দ্যাট্ ইন্ডিয়ান। ও বোধহয় ব্যাপারটা জানে। রহস্যটা কী, ওর কাছেই জানা যাবে।' বললেন পাসানোরিয়া।

হর্ষবর্ধন জানালেন, এক দল লোক গুড়ি মেরে মেরে আসছিল গাছের ডালে বসে তিনি দেখতে পান, তারা একটা বোমাও ছুঁড়েছিল কখন তিনি টের পাননি—বোমাটাকে তিনি গাছের গোড়ায় পড়ে থাকতে দেখলেন, ভাগ্যিস্ ফাটেনিকো! তাহলে আর গাছের থেকে তাঁকে নামতে হত না, তার ডালের থেকেই উড়ে যেতেন নির্ঘাৎ।—'পাছে ওটা কখন ফাটে সেই ভয়ে গাছের থেকে নেমে এসে বোমাটা কুড়িয়ে নিয়ে না, যাদের জিনিস তাদের ফেরৎ দিয়েছি। সেই গুটি গুটি আসা লোকগুলোর দিকে তাক করে ছুঁড়ে দিয়েছি তাদের দিকে। তারপর কী হল আমি বলতে পারিনা।'

গোবর্ধন বলল, 'আমি বলতে পারি। গাছের মগডালে বসে স্বচক্ষে সব দেখলাম। বোমাটা কিন্তু ফাটেনি—তাহলে আওয়াজ

পেতাম, কিন্তু ওটা ওদের ভেতর গিয়ে পড়তেই কী হল কে জানে। লোকগুলো সব নাচতে শুরু করে দিল, তারপর নাচতে নাচতে তারা নিজেদের জামা প্যাণ্ট সব খুলে ফেলল, তারপর লাফাতে লাফাতে দৌড় মারল—কোন দিকে তা আমি বলতে পারব না। কিন্তু ন্যাংটো হয়ে যেরকম তীরবেগে ওরা ছুটেছে তাতে মনে হয় এতক্ষণে বিশ পঁচিশ মাইল পার হয়ে গেছে তারা।'

'বটে?' পাসানোরিয়া সরজমিন তদন্তে এগুলেন। হর্ষবর্ধনের গাছের গোড়ার থেকেই শুরু হোলো তদন্ত।

দেখলেন গুঁড়ির কাছটায় একটা ভাঙা ডাল পড়ে আছে—কি করে ভেঙে পড়েছে বলা যায় না। ডালের গায় চাকা চাকা দাগ—বোলতারা চাক বাঁধলে যেমনটা হয়ে থাকে। ডালটা আছে কিন্তু তার চাকটা গেল কোথায়? বোলতারাও কেউ নেইকো।

উনি বুঝতে পারলেন যে ইণ্ডিয়ানটি ঐ বোলতার চাকটাই ছুঁড়ে দিয়েছিল ওদের দিকে। আর চাকভাঙা বোলতারা জেনারল ফ্রাঙ্কোর সৈন্যবাহিনীর মধ্যে ছত্রাকারে ছড়িয়ে পড়ে ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছে। বোলতার কামড়ে তিষ্ঠোতে না পেরে সব কিছু ফেলে পালিয়েছে তারা। আর বোলতারাও তাদের তাড়িয়ে নিয়ে গেছে—যদ্দূর যেতে পারে।

এযাত্রা হর্ষবর্ধনরাই ওদের বাঁচিয়ে দিয়েছে বুঝতে পারলেন লা-পাসানোরিয়া। দুই ভাইকে নিয়ে মহাসমারোহে সৈন্যবাহিনীর এক শোভাযাত্রা চলল তখন শহরে—মিলিটারি ব্যাণ্ড বাজিয়ে।

সসম্মানে দুই ভাইকে নিয়ে যাওয়া হোলো মেয়রের আপিসে। মেয়র ওদের সমাদরে অভ্যর্থনা করলেন।

তারপর ওদের নিয়ে যাওয়া হোলো শহরের মাঝখানে—সব চেয়ে বড় চত্বরে। সারা সহরের সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়ল সেখানে—মাদ্রিদের রক্ষাকর্তাদের দেখতে।

মেয়র একটা ছোট্ট বক্তৃতা দিলেন—স্প্যানিস ভাষায়। মেয়রের কথার বিন্দুবিসর্গ না বুঝেও সকলের হাত পা নাড়া দেখেই তাঁরা টের পেলেন যে রাজধানীর সবাই মিলে তাদের দুভাইকে খুব বাহবা দিচ্ছে।

মেয়র একটা বিরাটকায় সোনার চাবি ওদের হাতে তুলে দিলেন—মাদ্রিদবাসীর উপহার।

'এটা তো চাবি দেখছি। এটা দিয়ে কী করব আমরা?' শুধালেন হর্ষবর্ধন।—'গলায় ঝোলাবো নাকি মাদুলির মতন?'

'কী অব ম্যাড্রিড। আমাদের শ্রেষ্ঠ সম্মান আপনাকে দেওয়া হোলো।'

'এইটে দিয়ে শহরের দরজা খোলা যায় বুঝি? যুদ্ধের সময় ছাড়া অন্যসময় আসতে হলে এই দিয়ে দরজা খুলে আসতে হবে বোধহয়?'

'না না।' বললেন লা-পাসানোরিয়া। 'আমাদের দেশের দরজা সব সময়ই তোমাদের জন্য খোলা। যখন খুশি তোমরা এস।'

'শুধু মাদ্রিদ শহর নয়, সারা মাদ্রিদবাসীর হৃদয়ে তোমাদের জন্য জায়গা রইল। অবশ্যি, তোদের নেতা মহাত্মা গান্ধী অনেক দিন আগেই আমাদের হৃদয় দখল করে আছেন। হি ইজ এ গ্রেট ম্যান্ অ্যান্ড এ গ্রেট লীডর—নট ওনলি ফর ইউ হিণ্ডুজ—বাট ফর অল্ দ্য ওয়ার্লড। তাঁর স্বাধীনতা সংগ্রামে সবাই আমরা অনুপ্রাণিত। —বুঝেচ?' বললেন মেয়র ভাঙাভাঙা ইংরেজিতে।

হর্ষবর্ধন বললেন—'ইয়েস্। উনি কাউকে এমনকি শত্রু হলেও কখনো আঘাত করতে চান না। হি ইজ এ গ্রেট সেভার অব লাইফ। আমাদের প্রাণ ত উনিই বাঁচালেন কালকে—ওঁর জয় দিয়েই ত বেঁচে গেলাম। অবশ্যি বোলতাদেরও ধন্যবাদ দিতে হয়।'

'অফকোর্স্।' গোবর্ধন সায় দিল দাদার কথায়।

'তোমরা যখন খুশি আমাদের শহরে আসবে। এসে থাকবে যদ্দিন ইচ্ছে। তোমাদের জন্য আমাদের সব সময় অভ্যর্থনা, চিরদিনের আতিথ্য মজুদ। যখন মর্জি তোমরা এসো।'

'কিন্তু এখন তো আমরা আসতে পারছি না। মর্জি আমাদের ছিল, কিন্তু মার্জনা করবেন। আমরা একটু ব্যস্ত আছি এখন। দেশে ফেরার দরকার এখন আমাদের। আমরা বাড়ি যেতে চাই।'

গোবর্ধন বলল, 'দেশের জন্য মন কেমন করছে আমাদের।'

তখন ওদের দুভাইকে হংকংগামী একটা প্লেনে চাপিয়ে দেয়া হোলো। যাবার পথে কলকাতায় ওদের নামিয়ে দিয়ে যাবার অনুরোধ করা হোলো পাইলটকে।

দমদম এয়ারপোর্টে নামতেই কাস্টম্ কর্মচারীদের সম্মুখীন হতে হোলো দুই ভাইকে।

একজন অফিসার প্রশ্ন করলেন—'কোথ্থেকে আসছেন?'

হর্ষবর্ধন বললেন—কলকাতার থেকে।

'কলকাতার থেকে! কলকাতা তো এই জায়গা। জানতে চাইছি কোন দেশ থেকে রওনা হয়েছিলেন?'

'কেন, এই কলকাতার থেকেই ত।'

'ফ্রম্ ক্যালকাটা টু ক্যালকাটা।' গোবর্ধন বিশদ করে দেয়।

'VIA?' প্রশ্ন হয় পুনরায়।

'Via গোবর্ধন।' জবাব দেন দাদা।

'সেটা আবার কোন দেশ?' জানতে চান অফিসার।—'ঐ Via?'

'এই যে আমার ভায়া। ভায়া গোবর্ধন—আপনার সামনেই।'

'ভায়া গোবর্ধন।' হতবাক অফিসার।

তারপর ওঁদের পকেট টকেট তল্লাসী করা হোলো। ব্যাগ-ট্যাগ কিচ্ছু নেই সঙ্গে—সেই বিরাট চাবিটি ছাড়া—কাজেই তল্লাসী করে কোনো নিষিদ্ধ জিনিস না পেয়ে ছেড়ে দেওয়া হলো ওঁদের।

'এমন করে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন, আপনারা কে ? জানতে পারি কি ?' হর্ষবর্ধনের এই জিজ্ঞাসার জবাবে একজন জানিয়েছেন যে তাঁরা হচ্ছেন—'কাস্টম্। কাস্টম্ অফিসার তাঁরা।'

বাড়ি ফিরে বিছানায় হাত পা ছড়িয়ে হর্ষবর্ধন বললেন ভাইকে—'ছাখ্ গোবরা, পাঠশালার পণ্ডিতমশাই বলতেন না? শুষ্কম্ কাস্টম্ তিষ্ঠত্যগ্রে, আমাদের দেখিয়ে দেখিয়েই ত বলতেন।'

'হ্যাঁ, বলতেন ত! মনে আছে বেশ। মানে কী দাদা কথাটার?'

'আমি বাবার কাছে জেনেছিলাম। ওর মানে, সামনে ছুটো শুকনো কাঠ পড়ে আছে। মানে, আমরা হুভাই আর কি!'

'শুক্নো হতে যাবো কেন? আমি হলেও তুমি তো কখনই শুকনো নও। ছেলেবেলাতেও এমনি ছিলে, তখন থেকেই তো বেশ মোটা মোটা।'

'তার মানে, আকাঠ আর কি! খুব মুখ্যু ছিলাম ত। তাই।'

'তাই সমস্কৃত করে গাল পাড়ছিল পণ্ডিত আমাদের?' গোবরার রাগ হয়।

'যাই বল্ গোবরা, কথাট বলেছিল কিন্তু খাঁটি, কাঠ আমাদের কক্ষনো ছাড়বে না। সব সময় আমাদের সামনে থাকবে। আগে আগে যাবে। দেখলিনা এক কাস্টম্ অফিসারের খবর নিতে গিয়ে মাদ্রিদে কীসব ম্যাড লোকদের পাল্লাতেই না পড়া গেল... ভেবে ছাখ।'

'কাস্টম্ অফিসারের খোঁজে গেছলাম আমরা? র‍্যাট সাহেবের খবর নিতেই ত!' গোবরার প্রশ্ন।

'ওই হোলো। কাস্টম্ মানে তো কাঠ—তা শুকনোই হোক আর ভিজেই হোক। আর সাহেব হোলো গে সেই কাঠেরই কর্তা —বনজঙ্গলের মালিক—ফরেস্ট অফিসার।'

'তা বটে।'

'তারপর সেখান থেকে কলকাতায় ফিরে এসে ছাখ্—আবার আমাদের সামনে সেই কাষ্ঠম্! এই কাষ্ঠম্ অফিসার।'

'দাদা তুমি অদ্ভুত! যা বলেছ।' দাদার প্রতিভার বালাই নিয়ে মরতে ইচ্ছে করে ভাইয়ের।

'কাঠ আমাদের এ জীবনে ছাড়বে নারে। সব সময় সঙ্গে সঙ্গে থাকবে। কাঠের ব্যাপারী আমরা—ওরই কারবার আমাদের—সব সময় আমাদের আগে আগে কাষ্ঠম্, দেখছিস ত! জীবন ভোরই এই কাঠ নিয়ে ভুগতে হবে আমাদের বুঝেচিস?'

'হ্যাঁ, দাদা, মরবার সময়ও এই কাঠ আমাদের ছাড়বে না দেখো। জ্বালাবে আমাদের আবার।'

সকালবেলায় খবরের কাগজের খানিকটা পড়েই বিচলিত হয়ে পড়েছে গোবর্ধন। তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে—'ভারি মুস্কিল তো!'

'কেন, কী হলো আবার?' সামান্যমাত্র কৌতূহল হর্ষবর্ধনের। ওঁর ভাইয়ের বিবেচনায় যা-মুস্কিল তাকে মুস্কিলের মধ্যেই তিনি গণ্য করেন না, বাতুলের প্রলাপের মতোই অকাতরে বাতিল করে দেন।

গোবর্ধন কিন্তু নিজের সমস্যাকে নগণ্য জ্ঞান করতে পারেনা, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে—'নাঃ, টেঁকা দায় হলো কলকাতায়! যা মুস্কিল দেখছি—'

আবার সেই এক কথা—সেই বারম্বার বলার বাহুল্য! বিনা বাক্যব্যয়ে গোবরাকে একটা কিল বসিয়ে দেবার প্রেরণা হয় হর্ষবর্ধনের। তিনি আত্মসম্বরণ করে নেন—'কিসের মুস্কিলটা, শুনি?'

'যা দেখছি খবর আজকের—' গোবর্ধন নিজের মুখখানাকে হাঁড়িপানা বানায়। দাদার অটলতাকে আমলই দেয় না সে।

'আরে, খবর তো আমিও দেখছি!' হর্ষবর্ধন তাঁর মনের বিকার

মুখের কথায় এবং মাংসপেশীতে পরিস্ফুট করেন—'দেখছি নাকি ? কিন্তু কোন খবরটা ? মুস্কিলটা বাধলো কোথায় ?'

বাস্তবিক, খবরের কাগজ তো তিনিও পড়ছেন, অনেক খবরই পড়ে ফেলেছেন এতোক্ষণে—কিন্তু মুস্কিলজনক কোনো দুঃসংবাদের কিছুই তো খুঁজে পান নি এপর্যন্ত। কোনো কুবার্তার বার্তাকুই না।

প্রাতঃকালে আনন্দবাজারের প্রাদুর্ভাব হতেই, প্রথমেই হুমড়ি খেয়ে পড়েন হর্ষবর্ধন, কাগজের প্রধান প্রধান প্রত্যঙ্গগুলি তিনিই হাতিয়ে নেন আগের থেকে। আসল সার খবর যতো এবং জ্ঞাতব্য যা-কিছু সবই রাখেন নিজের দখলে, শুধু খবরের ছিবড়েগুলো যাতে থাকে সেই জবড়জং পাতাগুলো ফেলে দেন গোবরাকে।

গোড়ার থেকে সোজা ডগায় চলে যাওয়া, যেমন করে লোক গাছে চড়ে, হর্ষবর্ধনের কাগজ পড়ার সেই নিয়ম। কাগজ পেড়ে ফেলে, তার আগাপাশতলা তিনি পড়ে ফেলেন, দরকার হলে তার ওপরে শুয়ে পড়েও—হ্যাঁ—এবং—কোথ্থাও তার বাদ রাখেন না।

প্রথম পাতার প্রথম লাইন—অতিকায় অক্ষরের 'আনন্দবাজার পত্রিকা' থেকে তাঁর পাঠ শুরু হয়—তারপর, দৈনিক নীট বিক্রয় সংখ্যা এক লাখ ছিয়াত্তর হাজার, এই অভ্রভেদী তথ্যকে গোগ্রাসে গিলে, দক্ষিণ মাথায় ভট্টাচার্য মহাশয়ের চা-পানের সনির্বন্ধ অনুরোধ এবং বামের একমাত্র গিনি স্বর্ণের অলঙ্কার-নির্মাতার বিনামূল্যে ক্যাটালগ গ্রহণের আবেদন অগ্রাহ্য করে, এম্পায়ার অব ইণ্ডিয়া এবং ক্যালকাটা ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক লিঃ প্রভৃতি অবলীলায় পেরিয়ে, একেবারে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়-প্রশংসিত গৌরমার্কা খাঁটি সরিষার তৈলে এসে পড়েন। তারপর সেখান থেকে, স্বভাবতই, তিনি পিছলে পিছলে চলে যান সংবাদের বিভিন্ন প্রদেশে—শ্রীরামপুরের বঙ্গেশ্বরী কটন্ মিল, কুমিল্লার ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশন, নাথ ব্যাঙ্ক, বেঙ্গল কেমিকেলের লাইমজুস্ এ্যাণ্ড গ্লিসারিন কিছুই

তাঁর বাদ যায় না। কোনো মূল্যবান খবরেরই ফসকাবার উপায় নেই তাঁর খপ্পর থেকে, সর্বত্রই সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি, এমন কি কর্মখালির খুটিনাটিতে পর্যন্ত তাঁর সমান খর নজর।

কোন কোন ব্যাঙ্কে স্থায়ী আমানতে কি কি সুবিধা, কোন বীমা কোম্পানির মেয়াদী বীমায় জেয়াদা লাভ, কোথায় নামমাত্র প্রিমিয়ম দিয়ে একবার মরতে পারলেই হাতে-নাতে স্বর্গ, তারপর জীবন-ধারণ না করলেও চলে, এমনকি কষ্টেস্ষ্টে বেঁচে থাকাটাই অবাঞ্ছনীয়—কোনখানে জীবনবীমা করে কোনো প্রকারে গতাসু হলেই আশু বড়োলোক! সেই সব কাহিনী একে একে তিনি পড়েন। গল্পচ্ছলেই পড়েন এবং অকপটে বিশ্বাস করেন। এবং এক এক সময়ে দুর্দমনীয় লোভ হতে থাকে তাঁর—য়্যাঁ, একটা প্রিমিয়ম দিয়ে দেখলে হয় না? তারপরে যদি কোনো গতিকে—?

হ্যাঁ, অতিকষ্টেই মারা পড়বার প্রলোভন সম্বরণ করতে হয়েছে তাঁকে কতোবার যে!

তারপর তাঁর 'পাত্র চাই, পাত্রী চাই' প্রভৃতি গলাধঃকরণের পালা। এইসব রোমাঞ্চকর ঘটনা—কিম্বা দুর্ঘটনা, যাই বলো, সব আগে উদরস্থ করার তাঁর সাধ, রোজ রোজই—দুর্বার বাসনাই জাগে বলতে গেলে, কিন্তু প্রাণপণ-বলেই নিজেকে তিনি চেপে রাখেন। নিখুঁত রকমের নিরপেক্ষ লোক তিনি, সব খবরের প্রতিই তাঁর সম আগ্রহ—সমান অনাসক্তি! কোনো বিশেষ ইত্যাদির দিকেই ইতর বিশেষ হয়ে পড়বার লোক তিনি নন। খবরের কাগজ পড়েন, যেমন পড়ার দস্তুর, একের পর এক, ওপর থেকে নিচ-বরাবর, ডাইনে-বাঁয়ে না তাকিয়ে, লাইনের পর লাইন—বদ্ধপরিকর হয়ে। লাইনে লাইনে ছুটে চলেন। ডিরেল্‌ড হবার পাত্র তিনি নন।

আসল আসল খবরগুলো দাদাই সব সারেন, বাধ্য হয়ে গোবরাকে বাজে খবর নিয়েই পড়ে থাকতে হয়। বড়ো বড়ো,

মেজো মেজো, ছোটো ছোটো হরফে যতো বিলিতি ব্যাপার—কিছুই জানবার কথা নেই তার মধ্যে, আর জানলেই—বুঝবার যো কী? একটা কাণ্ডও যদি তার বোঝা যায়! অষ্ট্রেলিয়ায় ক্রিকেট খেলা—তাতে তোমারই বা কি আর আমারই বা কি, কষ্ট করে কে তা পড়ে? গোবরার তো অষ্ট রম্ভা! তারপর মিশরে ভীষণ সোরগোল, জার্মানিতে ইহুদিদের প্রতি অত্যাচার, প্যালেষ্টাইনে আরবদের তাণ্ডবলীলা—এসবের মাথামুণ্ডুও যদি কিছু বোঝা যায়। এর ওপরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গুরুতর পরিস্থিতি—পরিস্থিতি আবার কি রে বাবা? এবার একেবারেই পিলে চমকে যায় গোবরার।

এই সব খবরই পড়তে হয় গোবরাকে, বাধ্য হয়ে, বিরক্তির সঙ্গেই। দাদার হাস্য-বিকশিত বদন ছাখে, আর কাগজের যে সব পাতা দাদার বেহাতে, সেদিকে লোলুপ দৃক্পাত করতে থাকে। কিন্তু নাঃ, এতোক্ষণে—এবং এতোদিনে—একটা চমৎকার খবর পেয়েছে সে। স্বহস্তেই পেয়েছে। পড়বার মতো খবর—জবর খবরই বটে—পড়লেই বোঝা যায়, আর বুঝলেই বুক কাঁপতে থাকে গুড় গুড় করে।

হর্ষবর্ধন সবেমাত্র বায়স্কোপের পাতায় এসে পৌঁছেচেন, ছবির বিজ্ঞাপন দেখেই তাঁর সিনেমা দেখার কাজ সারা হয়—দেখতে গিয়ে একবার সেই যা বাইশজনের কোপে পড়েছিলেন, সেই ঢের, আর বাইশকোপের শখ তাঁর নেই। এই সচিত্র সংবাদগুলো খুব সযত্নেই তিনি পড়েন। পড়ছেন, আর এমন সময়ে কোনো রকমে হৃৎকম্প স্থগিত রেখে দুঃসংবাদটি দুম্ করে বলে বসেছে গোবর্ধন।

'ভারি ভাবনার কথা বাস্তবিক।' ভাবলেও ঘাবড়ায় না গোবরা।

'হ্যাঁ, আমিও ভেবেছি—' হর্ষবর্ধন হঠাৎ বুঝতে পারেন যেন—"অনেকদিনই ভেবেছি। কিন্তু এতোবড়ো কলকাতা শহর, তাতে আর আশ্চর্য কী আছে!'

'বাঃ, কলকাতা বলে কি এমনটাই হবে?' গোবরার আশ্চর্যই লাগে—'এতোটাই হবে?' উঠে পড়ে পায়চারি করতে শুরু করে দেয় সে, নিদারুণ উত্তেজনায়।

'হবে না কেন? বাড়ি ঘর কি কিছু কম আছে নাকি কলকাতায়? আবার রোজই বাড়ছে কতো না? বেড়েই তো যাচ্ছে আকচার। রোজ রোজই।'

'বাড়ি-ঘর বেশি বলে কি ছেলেদেরও বাড়তি হয়েছে নাকি?'

গোবর্ধন বিস্ময়ে বিচলিত।—'আঁটছে না নাকি বাড়িতে—তুমি বলতে চাও দাদা?'

'তা লাগে বই কি এতো ইঁট। এক লাখ ছিয়াত্তর হাজার আর বেশি কি এমন?'

'ইঁট?'—গোবর্ধন মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে, অতো হাজার ইঁটের একখানা যেন ছিটকে এসে লাগে তার মাথায়—'ইঁট কোথায় পাচ্ছো তুমি?'

'কেন, এই তো! ছেপেই দিয়েছে তো!' প্রথম পৃষ্ঠার প্রথমতম সংবাদের পৃষ্ঠে অঙ্গুলিনির্দেশ করেন।—'কেন, এই তো এখানে—লিখেছে নীট বিক্রয় সংখ্যা এক লাখ ছিয়াত্তর হাজার। আর, আর—' পুনশ্চ তিনি প্রাঞ্জল করেন—'আর নীটও যা ইঁটও তাই!'

বিস্ময়ের ধাক্কায় গোবরা বোবা মেরে যায়। বলৎশক্তি লোপ পায় বেচারার।

'তা লাগবে না! বাড়িঘর তৈরি হচ্ছে কম কি? রোজই তো তৈরি হচ্ছে।' হর্ষবর্ধন নিজেই প্রকাশ করেন। —'ছোটখাট একখানা বাড়িতেই তো লেগে যায় কতো হাজার! কাঠই লাগে কতো না!'

'নীটের কথা কে বলছে?' ধীরে ধীরে বাক্যস্ফূর্তি হতে থাকে গোবরার।

'আহা নীট কেন—ইট।' হর্ষবর্ধন নিজেই প্রুফ সংশোধন করেন—'নীট আবার কী? তা কি বিক্রি হয় নাকি? কেউ কি নীটের নাম শুনেছে? না, চোখে দেখেছে? ওটা হবে গিয়ে ইঁট। কলকাতার লোকের দশাই ঐ! ওরা আমকে বলে আঁব আর শিয়ালদহকে বলে শেয়াল-দা! ওদের উচ্চারণই ঐ রকম! দাদা বলে ডাকে ইষ্টিশনকে! হা-হা!'

'আমি কি ইঁটের কথা ভাবছি নাকি।' গোবরা দ্বিরুক্তি করে।

'কাঠের কথাই তো? হ্যাঁ, ভেবেছি আমিও। কিন্তু দৈনিক কাঠ বিক্রয়ের সংখ্যা কি ছাপবে ওরা? তা হলে তো আমাদের কাঠের ব্যবসা আরো কতো ফলাও হতে পারে। কাঠও কিছু অদরকারী বস্তু নয়, বিক্রিও কম হয় না, অন্ততঃ, ইঁটের চেয়ে কম নয় নেহাৎ, কিন্তু বলে কে!'

'ধুত্তের কাঠ!'

গোবর্ধন আর চুপ থাকতে পারে না, 'কাঠ না তোমার মাথা!'

এবার রাগ হয় হর্ষবর্ধনের। ইঁটে না হবি না হ, কিন্তু তাই বলে কাঠের কথাতেও দ্রবীভূত হয় না এমন অনুভূতিহীন ব্যক্তির হৃদয়-দ্বারে—উঁহু, একেবারেই তা নিরর্থক, হয়তো অস্তিত্বই নেই হৃদয়ের, না, তার দরাজ পিঠের দিকের চৌকাঠে কিম্বা কানের দোর-গোড়ায় প্রচণ্ড একটা করাঘাতের প্রবল বাসনা তাঁর অভ্যন্তরে নিদারুণভাবে জাগতে থাকে। অন্তর্গত ইচ্ছাটাকে প্রায় হস্তগত করে এনেছেন—বলতে যাচ্ছেন: যে কাঠ থেকে আমাদের ভাত কাপড় তাকেই তোর এই অছেদ্দা? এতই তুই আকাঠ? এমন সময়ে বাধা আসে গোবর্ধনের তরফ থেকে—'আমি বলছি অন্য খবর। ভারি উপদ্রব যে এখন কলকাতায়!'

'উপদ্রব! কিসের উপদ্রব?' হর্ষবর্ধন হক্‌চকান—'ভূতের উপদ্রব নাকি?' অল্প বিস্তর ভয়ই হতে থাকে তাঁর, হবেই তো; হওয়া

স্বাভাবিক। উপদ্রব মানেই ভৌতিক, তা ছাড়া আর উৎপাত করবে কে ? কার খেয়ে দেয়ে কাজ নেই ? অতো দুষ্টবুদ্ধি আছেই বা কার মাথায় ? তাঁর ধারণায়, ভূত আর উপদ্রব ওতোপ্রোতভাবে জড়িত।

'ভূত নয় তো ? হ্যাঁরে, নীট ছুঁড়চে নাকি ?'

নীটপাটকেল ওরফে ইঁট-পাটকেল, ভূতেরাই ছুঁড়ে থাকে কেবল। হর্ষবর্ধনের মতে (এবং অনেকের সাক্ষ্য আছে তাঁর সপক্ষে) নীট ছোঁড়া কর্ম হচ্ছে ভূতদের এবং কখনো সখনো রাজমিস্ত্রির। কিরকম যেন বদভ্যাস ওদের। তা বাদে, পাগলরাও অবশ্য যোগ দেয় সেই সঙ্গে—কিন্তু সে ভয়ানক কদাচ।

'কোথায় বেধেছে হাঙ্গাম ?' ভয়ে-ভয়েই তিনি জিগ্যেস করেন। 'আশেপাশেই নয়তো রে ?' এখন থেকেই তাঁর বুকের গুড়গুড়ুনি শুরু হয়ে যায়।

'উঁহু, ভূত নয়। ছেলেধরার উপদ্রব !' গোবর্ধন বেফাঁস করে।

'ছেলেধরার—তাই বল !' হালে পানি পান হর্ষবর্ধন। 'ছেলে-ধরার উপদ্রব তো কী হয়েছে ! ভয়ের কী আছে তাতে ?' হেসেই ফেলেন তিনি। অম্লানবদনে হাসেন।

'একদল বিদঘুটে লোক এসেছে কলকাতায়, ছেলেদের ধরে ধরে নিয়ে গিয়ে গুম্ করে রাখছে, তারপরে বিস্তর টাকা আদায় করে ছেড়ে দিচ্ছে তাদের। বহুত ছেলে ধরে নিয়ে গেছে এই ক-দিনে।' গোবর্ধন ব্যক্ত করে।

'ছেলে ধরছে তো আমাদের কি !' হর্ষবর্ধনের ইচ্ছে করে এক্ষুনি গোবরাকে ধরে তিনি গুম্ করে দেন—সশব্দে তার অপর পৃষ্ঠে—অবারিত পৃষ্ঠদেশে—তার বোকামির পরাকাষ্ঠায়।—'আমাদের কি তাতে ? আমরা কি ছেলে নাকি ?'

'কেন, আমাদের কি ধরতে নেই ? যার কাছে টাকা পাবে, তাকেই ধরছে যে। তোমারও টাকা আছে, তোমাকেও—'

'আমি কি ছেলে, শুনি আগে?' অন্যায় দোষারোপে তাঁর গা-জ্বালা করে, তপ্ত কণ্ঠেই তিনি শুধান—ছেলে না কি আমি?'

'তবে কি—তবে কি—' আমতা আমতা করে গোবরা, 'তবে কি, তুমি মেয়ে তাহলে?'

'মেয়ে আমি? পাগল!' গোবরার অমূলক সন্দেহ তাঁকে বিচলিত করতে পারে না, নিজের পরিপুষ্ট গোঁফের দুই প্রান্তে তিনি হস্তক্ষেপ করেন, 'দেখেছিস গোঁফ আমার? মেয়েদের কি গোঁফ থাকে এমন? তুই মেয়ে। তোর গোঁফ কই? আমি যদি মেয়ে হই তুই মেয়ের অধম—মেয়েরও নিচে। তুই তবে নাতনি!'

'কিন্তু ছেলেও না, মেয়েও না, তুমি তবে কী?' গোবর্ধন তাকে কোণ-ঠাসা করে ফেলে।

হর্ষবর্ধন ভাবিত হন, কিন্তু নিজের ব্যক্তিত্ব তিনি ব্যক্ত করতে পারেন না; ভাবনায় যদি বা কূল পান, ভাষায় কুলিয়ে উঠতে পারেন না—তিনি যে কী, যদি বা নিজে কোনো রকমে জানা যায়, জানানো যায় না তা কিছুতেই। প্রকাশের অক্ষমতায়, অগত্যা, বিশ্বস্রষ্টার মতোই নিজেই সম্বন্ধে তাঁকে মৌন থেকে যেতে হয় শেষ পর্যন্ত।

কিন্তু মৌনতা আর কতোক্ষণ? অসম্মতির ক্ষেত্রে কাঁহাতক আর মৌনতা বজায় রাখা যায়? ক্রমশঃই তাঁর মাথা ঘুরতে থাকে।

গোঁফকে পরিত্যাগ করে গালে হাত দেন হর্ষবর্ধন। এ যে তাঁর আমূল অস্তিত্ব নিয়েই টানাটানি! ভাবনার কথা বই কি! বেশ দুর্ভাবনার কথাই। দাড়ি চুলকোতে চুলকোতে কন—'মেয়ে আমি নই—কিছুতেই না। তোর কি মনে হয় যে আমি—আমি একটা মেয়েছেলে! য়্যাঁ?'

'আমি তো তা ধারণাই করতে পারি না।' গোবর্ধন ব্যক্ত করে।

'নিশ্চয়ই না। সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।' জোরের সঙ্গেই তিনি জাহির করেন। 'আমার অটল বিশ্বাস যে আমি মেয়ে নই। তবে এও ঠিক যে ছেলেও আমি নই। অ্যাঁ, এতোখানি বয়স হয়ে গেলো, এখনও কি আমি ছেলেই রয়েছি? আশ্চর্য!'

বিস্ময়-প্রকাশের জন্যে এর বেশি বাক্য তাঁর বের হয় না।

'আমি কি বলেছি যে তুমি কচি ছেলে?' গোবরার পাল্টা প্রশ্ন।

'ছেলেই নই তো, তার কচিই কি আর কাঁচাই কি? তবে হ্যাঁ, ছেলের দাদা বলতে পারিস বটে।' এবার তিনি অকুতোভয়েই গোঁফকে হস্তগত করে অবলীলাক্রমে পাক দিতে থাকেন।

'ছেলের দাদা—তার মানে?' অর্থ খুঁজে পায় না গোবরা।

'তার মানে, বাইশ বছর বয়স হয়ে গেলো, এখনো গোঁফ বেরুলো না তোর? কতো ছেলেরই বেরিয়ে যায় এর চেয়ে ঢের ছোটোতেই! হ্যাঁ! তুই একটা ছেলেরও অধম! তোকে মেয়ের মধ্যেও গণ্য করা যায় না।' গোবরাকে একটা নাতনির মতোই তাঁর জ্ঞান হতে থাকে। যদিও তা ধারণা করা যায় না।

'নিজে কী, তাই ঠিক করতে পারছেন না—হুঁঃ—!' গোবরা গজরায়, 'ভারি আমার ছেলের দাদা এসেছেন! ভারি!'

'ভালো করে গোঁফ কামা দু'বেলা—' হর্ষবর্ধন সদুপদেশ দেন—'যদি ঐ ছেলেধরাদের হাত থেকে বাঁচতে চাস্। তবেই যদি পদবাচ্য হতে পারিস। এখনো তুই নিতান্তই বালক। আস্ত একটা দুগ্ধপোষ্য।' হাসি ধরে না হর্ষবর্ধনের।

'আমি—আমি—আমি বালক?' গোবরার রাগ হতে থাকে।

'আহা, বালক যদি নাই হতে চাস, নাবালক তো বটেই? তাতে তো আর ভুল নেই?' দাদৃ-সুলভ সান্ত্বনার স্বর তাঁর গলায়।

'তুমি তাহলে, তুমি তাহলে—' দাদার উপযুক্ত যথোচিত একটা

বিশেষণ—তাতে অর্থই হোক বা অনর্থই হোক—খুঁজে বার করার চেষ্টা করে গোবরা—'তুমি তাহলে আস্ত একটা মূঢ়মতি!'

ঠিক এমনি সময়ে দরজা ঠেলে অপরিচিত একজন প্রবেশ করে, যার বালকত্ব সম্বন্ধে দু'ভাইয়ের মতদ্বৈধ হবার সম্ভাবনা ছিল না।

'কাকে চাও হে ছোকরা?' হর্ষবর্ধনের তলব হয়।

ঘরে ঢুকেই থতমত খেয়ে যায় ছেলেটা, থমকে যায় যেন—'আপনাদেরই। আপনাদেরকেই বোধহয়।' থেমে থেমে বলে।

'আমাদের?' হর্ষবর্ধন অবাক —'আমরা তো চিনি না তোমাকে?'

'চিনবেন। ক্রমশঃ চিনতে পারবেন।'

'নাম কি তোমার?' গোবরার জেরা।

'বিটকেলদের বাঁটকুল!' সহজ সুরেই তার জবাব আসে।

গোবরাকে ধাক্কা মারে যেন! —'বাব্বাঃ, কী বিদ্‌ঘুটে নাম!'

'কী মতলবে আসা, জানতে পারি কি?' হর্ষবর্ধন জিগ্যেস করেন।

'আলাপ করতে এলাম।' ছেলেটি বলে—'আসতে কি নেই?'

'না, না, তা কেন?' হর্ষবর্ধন ঈষৎ অপ্রস্তুত হন —'আসবে বই কি। হাজার বার আসবে। তা—তোমরা বুঝি পাশের বাড়ির?'

'প্রায় পাশাপাশি বই কি! আপনারাই কি আসাম থেকে এসেছেন? আসামের জঙ্গল থেকে?'

'হ্যাঁ, সেখানে আমাদের কাঠের ব্যবসা।' ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে জানান।

গোবর্ধনেরও হৃদয়ে আঘাত লাগে—'জঙ্গল থেকে বটে, তবে জংলি নই। কলকাতার মানুষের চেয়ে কোনো অংশে ন্যূন নই আমরা।'

'তাই তো শুনেছি। কিন্তু হঠাৎ ঢুকে হকচকিয়ে গেছলাম।' ছেলেটি প্রকাশ করে—'দেখে তো বড়লোক বলে মনে হয় না আপনাদের। বড়োমানুষির কিছু নেই তো!'

'বড়লোক নিয়ে তো কথা হচ্ছিলো না, কথা হচ্ছিলো বড়ো বালক নিয়ে—' হর্ষবর্ধন প্রাঞ্জল করতে যান—এই গোবরাটা আমাদের ভারি নাবালক এখনো।'

'তুমি থামো দাদা!' ফোঁস করে ওঠে গোবর্ধন। আসল বালকের সম্মুখে নাবালক বিবেচিত হয়ে নিজেকে ভেজাল প্রমাণিত করতে সে নারাজ।

ওঁদের ব্যক্তিগত সমস্যায় বাঁটকুল কর্ণপাত করে না। বলে, 'আপনাদের কি খুব টাকা? শুনেছি কিনা, জিগ্যেস করছি তাই।'

'তা টাকা আমাদের অগাধ।' হর্ষবর্ধন বলেন অবহেলার সঙ্গে।

'অঢেল—অঢেল!' কথাবার্তার মোড় ঘোরাতে খুশিই হয় গোবরা—'টাকা আমরা ঢেলার মতোই মনে করি।'

বাঁটকুলের দু' চোখ টোপা কুলের মতো হয়—'অ্যাতো টা—কা?'

'তা হবে না? জায়গাটা যে আসাম।' হর্ষবর্ধনের জিজ্ঞাস্য হয় তখন—'আর টাকাকে ইংরেজিতে কী বলে শুনি? কী বলে হে?'

আকস্মিকভাবে প্রশ্নপত্রের সম্মুখীন হয়ে ভড়কে যায় বাঁটকুল। ভয়ে ভয়ে বলে, 'মণি? মণিই তো বলে জানি?'

'মণি? মণি কেন? একি সাপের মাথার, যে মণি? মানুষের মাথা খেলিয়ে তবে আসে টাকা। টাকার ইংরাজি জানো না? সাম্ অব রুপিজ—। কতো রসিদই সই করে দিলাম ওই বলে। রিসিভড্ দি সাম অব রুপিজ—'

'সাম অব রুপিজ, তো কী হয়েছে?' গোবরাও ঠিক বুঝতে পারে না দাদার বক্তব্য। একটা বাচ্চার সঙ্গে অনর্থক এই অর্থনৈতিক আলোচনা একান্তই বিড়ম্বনা বলে তার বোধ হয়।

'এ সাম অব রুপিজ থেকে এলো আসাম অফ রুপিজ।' হর্ষবর্ধন

ব্যাখ্যা করে দেন—'আসাম হলো গে টাকার জায়গা। অর্থাৎ কিনা—! তার চারধারেই টাকা।'

'আপনারা বহুৎ টাকা জমিয়েছেন তাহলে?' বাঁটকুল বলে।

'আমরা কি আর জমিয়েছি! এমনিতেই জমে গেছে। জায়গাটাই ভারি জমাটি।' হর্ষবর্ধন জানান।

'ওখানকার মাটির দোষ!' গোবরার বদনে বিরক্তির ব্যঞ্জনা।

'জল যেমন জমে যায়, আপনার থেকেই; তেমনি টাকা জমে আসামে।' হর্ষবর্ধন দুঃখ করেন—'না জমিয়ে নিস্তার নেই ভাই।'

'জমাতেই হবে, উপায় নেই! মহা মুস্কিল!' হাল ছেড়ে দিয়ে গোবরাও হতাশ।

'আপনা-আপনিই জমে যায় টাকা!' ভাবতে গিয়ে বাঁটকুলও নাজেহাল হয়ে পড়ে।

'এই ধরো, এই রকমে' জমনীয়তার রহস্যকে ধীরে ধীরে উদ্‌ঘাটিত করেন তিনি—'জলে এসে জল বাধে, তার ওপরে ঠাণ্ডা পড়ে, অমনি জল জমে বরফ! কেমন কিনা? তেমনি টাকায় এসে টাকা বাধে, তার ওপরে ছাতা পড়ে, অমনি টাকা জমে—টাকা জমে—?' উপযোগী শব্দের জন্য তিনি উপযুক্ত ভ্রাতার মুখের দিকে তাকান। —'টাকা জমে জমে··· ?'

'টাকা জমে পাহাড়!' কথা যোগাতে দেরি হয় না গোবরার!

'পা—হা—ড়! ম্যা—তো—টা—কা!' বিস্ময়ে হাঁ বুজতে চায় না বাঁটকুলের!

'তা পাহাড় বই কি! পাহারা দিতে হয় না—কেউ নিয়ে পালাবে, সে ভয় নেই। পাহাড়ই বলতে হবে—ছোটোখাটো পাহাড় বিশেষ কিম্বা পাহাড়ের অপভ্রংশ।'

'খরচ হবার যো কি!' গোবরা বলে—'খরচ করা সহজ নয় ভাই!'

'একটা চোর ছ্যাঁচোড় নেই সেখানে, যে নিয়ে পালাবে।' হর্ষবর্ধন বেজায় ক্ষুব্ধ।

'গরীব ভিখিরি নেই যে দিয়ে পালাবো!' গোবরাও ভারি বেজার।

'তা হলে ঠিক জায়গাতেই পৌঁচেছি।' বলে বাঁটকুল, 'প্রথমে ভেবেছিলাম যে ভুল ঠিকানা! ভালো কথা, আপনাদের কাছে রিভলভার আছে?'

'রিভলভার! সে আবার কী?'

'এই পিস্তল বলে যাকে?'

'নাঃ, নেই!' হর্ষবর্ধনের দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে—'কি হবে তা দিয়ে?'

'বন্দুক—টন্দুক?'

'বন্দুক কেন থাকবে?' বিস্মিত হন তিনি—'ও কি কাছে রাখবার জিনিস? ওর থেকে গুলি বেরিয়ে যায় যে! জানো না?'

'আমরা তো আর গুলিখোর নই?' গোবরা বলে, 'যে রাখতে যাবো ও-সব।'

'ছোরা-টোরা? তাও নেই নাকি?'

এবার গোবরার যেন কেমনতর ঠেকে—সন্দেহের ছায়াপাত হয় তার মনের কোণে।—'এমন কি লাট হে তুমি, যে এতো কৈফিয়ৎ দিতে যাবো তোমায়?'

'লাট নই সত্যি, তবে অনেককে লাট বানিয়ে দিই বটে!' মুচকি হেসে বলে বাঁটকুল।

'তোমরা লাট বানাও? বটে?' গোবরা মুখ বেঁকায়—'একদম বাজে কথা। আমি একেবারে বিশ্বেস করিনা।'

'বললেই হলো! বিলেত থেকে আমদানি হয় লাট!' হর্ষবর্ধন সায় দেন—'হ্যাঁ, লাট বেলাট আর কারুকে বানাতে হয় না এখানে।'

'লাট কি চারটিখানি নাকি?' গোবরা পুনশ্চ যোগ করে—'বানিয়ে দিলেই হলো!'

'বলুন না কেন, আপনাকেই বানিয়ে দেবো এক্ষুনি।' বাঁটকুলেরও জোরদার জবাব—'আক্‌চারই বানাচ্ছি কতো!'

'আক্‌চারই বানাচ্ছো। বটে!'

হর্ষবর্ধনের হয়তো একটুখানি বিশ্বাসই হয়, ঈষৎ প্রলুব্ধই তিনি হন—'লাট করা তো সোজা নয় হে—কী করে করবে শুনি?'

'মেরেই লাট করে দেবো।' ছেলেটি বলে—'হতে চান আপনি? বলুন তা হলে।'

হর্ষবর্ধনের উৎসাহ হয় না। হাত-পা ভেঙে অপদস্থ হয়ে উচ্চপদ লাভের দুরাকাঙ্খা তাঁর নেই, অন্ততঃ ততোটা তীব্রভাবে নেই। তিনি অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন। গোবরাও ঘাড় নাড়ে। চাকরি পাবার আগেই সে রিজাইন দিয়ে দেয়।

'তবে যা যা জিগ্যেস করি, ভালো ছেলের মতো জবাব দিন তা হলে। বুঝলেন? হ্যাঁ। আচ্ছা, টেলিফোন আছে এই বাড়িতে? নেই, ভালো কথা। বেশ, তবে এই চিঠিটা নিন আপনাদের।'

বাঁটকুল একটা চিঠি বাড়িয়ে দেয়।

এবার গোবরার সন্দেহ হর্ষবর্ধনের অন্তরেও সঞ্চারিত হয়—একই সংক্রামক আশঙ্কা দু'জনের মনেই ঘনীভূত হতে থাকে। লাট হবার বা ঐ জাতীয় ভয়াবহ কিছু হবার আমন্ত্রণপত্র নয় তো! কম্পিত হস্তে তিনি খাম খোলেন।

চিঠির মর্ম কিন্তু মর্মন্তুদ—পড়ে মর্ম ভেদ করে মুখ শুকিয়ে যায় হর্ষবর্ধনের। কয়েকটি আঁচড়ে জানানো হয়েছে—

"পত্রপাঠমাত্র পত্রবাহকের হাতে নগদ দশ হাজার টাকা গুণে

দেবেন। নতুবা আপনাকে পাকড়ে এনে আমাদের আটক-ঘরে আটকে রেখে দেবো ধরে, যদ্দিন না আদায় হবে টাকাটা। ইতি—

শ্রীবিটকেল সম্রাট।"

নাঃ, লাট করবার ষড়যন্ত্র নয় বটে, কিন্তু তার চেয়েও কিছু কম মারাত্মক নয়। গোবরার হাতে তিনি এগিয়ে দেন সম্রাটের চিঠিটা। গোবর্ধন পড়ে গম্ভীর হয়ে হায়—'তখন যা বলছিলাম দাদা!'

আজকের আনন্দবাজারের—সেই নিরানন্দকর সংবাদের সঙ্গে যে এর ঘোরতর সংস্রব আছে বলবার আগেই তা টের পেয়েছেন হর্ষবর্ধন। তিনি শুধু বলেন, 'টাকা দিয়ে পাপ চুকিয়ে দাও। কাজ নেই হাঙ্গামে।'

কিন্তু ছেলেটা গেলো কোথা? এঘর-ওঘর, ওপর-নিচ, চারধার খোঁজা হলো, পাত্তাই নেই। দলবল ডেকে আনতে গেলো নাকি?

হর্ষবর্ধনের বুক দুর দুর করে—'ছেলেধরারা এসে পৌঁছোবার আগেই, বুঝেছিস গোবরা—বিদূরিত হবার বাসনা জাগতে থাকে তাঁর মনে—'পালাই চ' এখান থেকে।'

'এক্ষুনি চলো দাদা।' গোবরাও নিজেকে দূরীভূত করতে চায়—'সুদূরে কোথাও পালিয়ে যাই।'

একবস্ত্রে দু'ভাই বেরিয়ে আসে বাড়ির থেকে। কাঁপতে কাঁপতে কোনোরকমে তালা আঁটে সদর দরজায়। তারপর ফুটপাথে পা বাড়ায়।

কয়েক পা এগোতেই দেখা যায়, প্রকাণ্ড একটা ধূসর রঙের মোটর দাঁড়িয়ে রয়েছে। গোবরা সেইদিকে দাদার দৃষ্টি আকর্ষণ করে—'হেঁটে হেঁটে আর কতোটা পালানো যাবে? তার চেয়ে চলো ওইটা ভাড়া করে ওই মোটরে চড়ে কেটে পড়ি।'

হর্ষবর্ধন একখানা একশো টাকার নোট গুঁজে দেন ড্রাইভারের

হাতে—'এখান থেকে পালিয়ে চলো। নিয়ে চলো আমাদের যেখানে ইচ্ছে, যেদেশে ইচ্ছে, যতোদূরে ইচ্ছে—এই নাও তোমার ভাড়া—এই একশো টাকা। একশো মাইল গিয়ে তবে থামবে। বুঝেছো ?'

'বাবাঃ! নাঃ, এ-ছেলে-ধরার দেশে আর না!' গোবরা বলে, 'কলকাতায় আবার মানুষ থাকে ? ছ্যা! এখানে আসতে আছে কখনো ? ছি! ছি!'

স্টার্ট দিয়ে গাড়িটাকে চালু করেই ড্রাইভারের প্রশ্ন হয়—'কোন্ দিকে যাবো, মশাই ?'

'যেদিকে খুশি!' বৈরাগ্য-বিমুখ জবাব বড়ো দাদার—'যেদিকে তোমার মোটর যায়!'

'চালাও দিগ্বিদিকে।' বিবাগী ছোটো ভাইয়েরও হাল ছেড়ে দেবার বিলাসিতা! বলে, 'কলকাতা ছেড়ে যেদিকে দিল্ চায় তোমার।'

'ইটালির দিকে যাবো কি ?' ড্রাইভারের পুনশ্চ জিজ্ঞাস্য।

'ইটালি!' আকাশ থেকে পড়েন হর্ষবর্ধন—'মোটরে চড়েও যাওয়া যায় না কি সেখানে ? য়্যাঁ ? এ বলে কি রে গোবরা ?'

কিন্তু ড্রাইভারের মুখে পরিহাসের কোনো লক্ষণ না দেখে তিনি নিজেকে সামলে নেন—'হবেও বা! আমরা কিন্তু উড়োজাহাজ চেপেই গেছলুম যেন কিছুদিন আগে! সে তো এখানে নয়, বাপু! অনেক দূরে যে—প্রায় বিলেতের কাছাকাছিই বলতে গেলে!'

'আবার সেখানে যাবে নাকি, দাদা ?'

'আবার ? পাগল হয়েছিস ? ছ্যাঃ! আবার সেখানে যায় মানুষ ? সেই ইটালিতে ? দু'বার এক জায়গায় ? রামোঃ!'

দু'বার যাওয়া গোবরারও মনঃপুত নয়—যদি এক জায়গার মধ্যেই বারম্বার ঘুরবে তাহলে ভগবান খেয়ে না খেয়ে মরতে এতো

জায়গা সৃষ্টি করতে গেলেন কেন? এই সুবিস্তৃত ভৌগোলিক কাণ্ড —এই লীলায়িত বিলাসিতা—কতো দেশ আর শহর, পাহাড় আর পাড়াগাঁ, অরণ্য আর লোকারণ্য, এসব তৈরি করতে তাঁকে তো কম বেগ পেতে হয়নি, কষ্টও বেশ করতে হয়েছে, দস্তুর মতোই। কেন না, গোবরার ধারণা (এমন কি তার গবেষণাও বলতে পারো) যে লোনা সমুদ্রগুলো অনেক সৃষ্টি এবং অনাসৃষ্টির মেহনতে হয়রান পরমেশ্বরের দেদার অশ্রুপাত ছাড়া আর কিছু না।

'ইটালি ছাড়া আর কোথাও কি যেতে পারো না তুমি? ইটালি আর ইস্‌পেন্‌ বাদ দিয়ে—এই ধরো গিয়ে—' কিয়ৎক্ষণ মাথা ঘামাতেই ভূগোলের গোলমাল পরিষ্কার হয়ে আসে; গোবরার মনে পড়ে যায়—'ডেনমার্ক' ?

'পদ্মপুকুরেও যেতে পারি।' গম্ভীর মুখে জবাব দেয় ড্রাইভার— 'কিম্বা বলেন তো বালিগঞ্জে, কি আরেকটু এগিয়ে আলিপুরে—'

ঈষৎ একটু বিশদ বাঁকা হাসিই যেন দেখা যায় তার মুখে।

—'তবে সেখানে গেলে আপনাদের ছাড়ে কিনা, রেখেই দেয় কিনা কে জানে।'

'আহা, চালিয়ে চলোনা তুমি! দেখাই যাক না কদ্দুর যাওয়া যায়।' হর্ষবর্ধন গন্তব্যসমস্যার চূড়ান্ত সমাধান করে দেন এক কথায়।

'হ্যাঁ, দেখাই যাক না কোথায় যাই!' গোবরাও উৎসাহ দেখায়—'বিলেতেই যাই কি খালেতেই যাই। একশো মাইলের ভাড়া তো দেওয়াই রয়েছে তোমায়! ভয় কি?'

'হ্যাঁ, অন্ততঃ পঞ্চাশ মাইল তো যাবেই তুমি—যদি তোমার ফেরার ভাড়া পঞ্চাশ টাকা ধরো। তবে কিনা ঐ লক্কড় ইটালিটা বাদ দিয়ো বাপু। নেহাৎ না পারো ওটার পাশ কাটিয়ে যেও বরং। এবং—হর্ষবর্ধন ঘাড় নাড়েন—এবং তোমার ঐ আলিপুরটাও

আমার খুব ভালো ঠেকছে না হে। নাম শুনেই সন্দেহ হচ্ছে কেমন! জেলখানা না চিড়িয়াখানা কী যেন আছে সেখানে ?'

গাড়ি চলতে থাকে। এ রাস্তা ঘুরে ও রাস্তায় বেঁকে সে রাস্তার ভেতর দিয়ে শর্টকাট করে, কখনো ক্ষিপ্র, কখনো বা ধীর-মন্থর গমনে, বহুৎ য়্যাকসিডেণ্ট থেকে বেঁচে এবং দেদার ধাক্কা বাঁচিয়ে চলতে থাকে গাড়ি। এনতার ঠোকাঠুকির মুখোমুখি এগিয়ে, এমন কি অনিবার্য সামনে এসে কি করে যে সামলে নেয়; নিজে চুরমার না হয়ে এবং কাউকে বিচূর্ণিত না করে কি করে যে বেমালুম বেরিয়ে যায়—সেই এক রহস্য! ড্রাইভারের ওস্তাদি দেখে বাহবা দিতেই ইচ্ছে করে ওঁদের। এবং নিজেদের জোর বরাতকেও তারিফ করতে হয়। রুদ্ধ নিশ্বাসেই করতে হয়।

অবশেষে এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে যায় গাড়ি। ট্রাম ট্যাক্সি গরুর গাড়ি রিকশ লরি—সব সেখানে দাঁড়ানো। রাস্তা জাম। এতো ভিড় কেন রে বাপু এ রাস্তায় ? এতো পথ পেরিয়ে এলেন—মোটরে চেপেও এতোখানি সবুর করতে হবে এমন কথা তো ছিলো না কোথাও!

রাস্তাটার নাম কি হে, ড্রাইভার ?

স্ট্র্যাণ্ড রোড।

তখনি বুঝেছি আমি। হর্ষবর্ধন বলেন সহর্ষে—ইসট্যাণ্ডো—মানে জানিস তো গোবরা ? ইসট্যাণ্ডো মানে দাঁড়ানো। না, ভুলে মেরে দিয়েছিস একেবারে ?

জানি জানি ? ভুলবো কেন ? ইসট্যাণ্ড আপন দি বেঞ্চ। গোবরা যে ভুলে মেরে দেয়নি জোরালো গলা জাহির করে এবং আনুষঙ্গিক উদাহরণ যুগিয়ে সঙ্গে সঙ্গে সপ্রমাণ করে। বাস্তবিক, ভোলবার কথা তো নয়। পড়াশুনায় যতোই কাঁচা হোক, ইসট্যাণ্ডোর কথা যে ভোলা যায় না কিছুতেই। বরং কাঁচা হবার

জন্যেই, আরো বেশি করেই স্মরণে আছে বিশেষ করে ঐটাই। কেবলমাত্র বইয়ের পড়া বলেই নয় ইতিহাসের বিষয়ও যে বটে ওটা—কতোবারই না উক্ত ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয়েছে তাঁদের বাল্যজীবনে। তার স্মৃতি কি ভোলবার? ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং স্বয়ং দৃষ্টান্তস্থল হয়ে যা শেখা যায় তা কি হজম করবার জিনিস?

সেইজন্যেই গাড়ি-ঘোড়া সব দাঁড়িয়ে? ইসট্যাণ্ডো রোড যে। হর্ষবর্ধনের অভিযোগ—এখানে দাঁড়াতেই হবে কি না! ইসট্যাণ্ডো রোড বলেছে কেন? অনির্বচনীয় তাঁর হাসি।

আর ঐ যে দূরে, দেখছো দাদা!—আন্দাজ করেই বলে গোবরা—ঐটে হচ্ছে হাওড়ার পুল! নিশ্চয়ই তাই, তা ছাড়া আর কি হবে? তাছাড়া আর কি পুল আছে কলকাতায়? বইয়েও পড়া গেছে আর সনাতন খুড়োও বলেছিলো! হাওড়ার পুল জলে ভাসে, জানো তো দাদা?

গোবর্ধন যেন দাদার আবিষ্কৃত উক্ত দণ্ডায়মান রাস্তার চেয়েও বৃহত্তর পরমাশ্চর্যকে বহিষ্কার করে।

হর্ষবর্ধন গুম হয়ে যান। আপ্যায়িত হওয়া তার পোষায় না। ইতিহাসেরই কি আর ভূগোলেরই কি, দাদার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বিদ্যা প্রকাশের বাহাদুরি, এইভাবে সব তাতেই দাদার ওপর টেক্কা দেওয়ার দুশ্চেষ্টাকে তিনি কিছুতেই ক্ষমা করতে পারেন না। খুড়ো নয়, জ্যাঠা নয়, পিসে নয়, শ্বশুরও না, সামান্যমাত্র একটা ভাই হয়ে অগ্রজকে এককাঠি ছাড়িয়ে যাবার জন্যে সব সময়েই এই যে ওৎ পেতে থাকা—এটা তাঁর অত্যন্ত অশোভন মনে হয়। ভাইয়ের এমন জ্যাঠামো বরদাস্ত করা কঠিন হয় তাঁর পক্ষে। বেজায় রকম তিনি বেজার হন; হাজার কৌতূহল থাকলেও, পুলের প্রতি ভুলেও দৃকপাত করেন না, ভ্রূক্ষেপই করেন না সেদিকে বলতে গেলে।

গাড়িও অচিরে মোড় ঘুরেছে এবং তিনিও, হাঁসের ওপর

টেকামারা ভাসমান সেই দুর্লভ দৃশ্য দেখবার দুরভিসন্ধি অতিকষ্টে দমন করে ফেলেছেন ততোক্ষণে। গোবরার কথায় কান না দিয়ে ড্রাইভারকে তিনি জিগ্যেস করেন—এ-রাস্তাটার নাম ?

হ্যারিসন রোড।

হ্যারিসন ? সে আবার কি ? এরকম অদ্ভুত নাম কেন ? হর্ষবর্ধনের মাথা ঘুরে যায়। আমাদের বাড়ি রসা রোডে। রসা রোডের ওপরে নয় ঠিক, তবে সেই এলাকায়। তাহলেও একটা মানে হয় তার। অর্থাৎ কিনা রসায়ন রোড, সংক্ষেপে রসা। অর্থাৎ কিনা যতো রসিক লোকের বসবাস সেখানে। কিন্তু এ-রাস্তার নাম এরকম হ্যারিসন হতে গেলো কেন ?

বড়োবাজার কিনা এখানে। ড্রাইভারের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা।

উঁহু তা নয়। হর্ষবর্ধন স্বয়ং টিকা করেন—এটা হরি সেন রোড। হরি সেন হলো গিয়ে গৌরী সেনের ভায়রা ভাই। নামজাদা সেই গৌরী সেন, সেই যে উড়িয়ে ফতুর লোকটা, সবাইকে টাকা নেবার জন্যে সাধাসাধি করে বেড়াতো গো!

লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন, কথাতেই বলেছে! গোবর্ধন ভাষ্য করে—আমাদের সেই গৌরী সেন হে। ব্যাখ্যার ব্যাখ্যানায় বিলক্ষণ ওস্তাদ—সর্বদা তৎপর গোবর্ধন।

গৌরী সেন কোথায় থাকতো, কে জানে। কিন্তু পাছে টাকা নিতে হয়, ভায়রা ভাইটা এসে জবরদস্তি করে সজোরে গছিয়ে দিয়ে যায়, সেই ভয়ে হরি সেন বেচারিকে য়্যাদ্দূরে পালিয়ে এসে থাকতে হয়েছিলো।

হর্ষবর্ধনের দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে। ভয়াবহ টাকার জন্যে—তার ছোঁয়াচ বাঁচাতে, আত্মরক্ষার উপলক্ষে, কী না করে মানুষ ?

ততোক্ষণে গাড়ি আরো খানিক এগিয়ে আরেকটা বাঁক নিয়েছে।

এটা কি রাস্তা ?

আজ্ঞে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট।

সেরেফ গোঁজামিল দিচ্ছো কেবল ? য়্যাদ্দিন ধরে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছো, রাস্তাঘাটের নামগুলোও ভাল করে জানো না বাপু। আওয়াজ শুনলেই তো টের পাওয়া যায়। বেশ বোঝা যায় যে এটা কর্ণওয়ালিশ নয়, কর্ণ-বালিশ। মহাভারতের কর্ণের বালিশ থাকতো এখানে।

কান-বালিশও তো হতে পারে দাদা। গোবর্ধনও নিশ্চেষ্ট থাকবার পাত্র না।

হ্যাঁ, তাও পারে। তাও হতে পারে বটে। তাহলে কিন্তু পাশ-বালিশও থাকবে। থাকতেই হবে। পাশবালিশের রাস্তাটা কোন ধারে তবে ? ড্রাইভারের কাছেই তাঁর পথের দাবী।

বেচারি কিছুক্ষণ ভুরু কুঁচকে ভাবে, তারপর হতাশভাবে ঘাড় নাড়ে। ওই নামের কোনো রাস্তা চোখে পড়া দূরে থাক, তার কানের সীমান্তেও কখনো এসেছে কিনা সন্দেহ হয়।

আমরা যাচ্ছি কোনদিকে ? গোবর্ধন জিগ্যেস করে। সামনের দিকটাতেই পাশ-বালিশের অস্তিত্বের সম্ভাবনা রয়েছে তার আশঙ্কা !

শ্যামবাজারের দিকে।

তাহলে ঠিকই হয়েছে। কানবালিশ নয় কর্ণবালিশই তবে হবে এটা। হর্ষবর্ধন উল্লসিত হন। এখানেই কর্ণ এবং সামনেই শ্যাম-চাঁদ—তারপর আরো খানিক এগোলেই যুধিষ্ঠির রোড ছাড়িয়ে কুরুক্ষেত্র পাবো নিশ্চয়ই। হর্ষবর্ধনের হর্ষ আরো বর্ধিত হয়।

আর এরই আশেপাশে—বুঝলে কিনা দাদা ? প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় গোবরাই কি পেছোবার ছেলে ? এরই আশেপাশে এধারে ওধারে আছে দুর্যোধন, দ্রোণাচার্য, ধনঞ্জয়, নল, নীল আর গয়-গবাক্ষ। একেবারে জলজ্যান্ত মহাভারতে এসে পড়া গেছে দাদা !

নল তো চারধারেই। রাস্তার তলাতেও আবার। ড্রাইভার সায় না দিয়ে পারে না; এই যে বাড়ি-বাড়ি জলের কল, এসব জল আসছে কোত্থেকে বলুন তো! ঐ নল থেকেই সব। রাস্তার তলা দিয়ে নল। কিন্তু ফাটলে কি আর রক্ষে আছে? একবার নল ফেটে কী জলটাই না জমেছিলো রাস্তায়। এই রাস্তাতেই।—আজ্ঞে!

বটে বটে? হর্ষবর্ধন একটু সন্ত্রস্ত হন। তা হলে গাড়ি ঘুরিয়ে নাও তুমি। কুরুক্ষেত্রের কিসকিন্ধ্যা কাণ্ডে গিয়ে আর তবে কাজ নেই। আমাদের লঙ্কাকাণ্ডই ভালো।

গাড়ি দিক পরিবর্তন করে। খানিক পরে ড্রাইভার নিজে থেকেই জানায়—এটা কলেজ ষ্টীট।

হর্ষবর্ধন চমকে ওঠেন—কেন? লেজ কেন?

বলতে পারবো না মশাই! বলেই পরক্ষণেই তার টনক নড়ে। রামায়ণের হনুমানের সঙ্গে এই লেজের অঙ্গীভূত কোনো অচ্ছেদ্য যোগাযোগ আছে কিনা, হর্ষবর্ধন সাগ্রহে এই প্রশ্ন করতে যাচ্ছেন, এমন সময়ে ড্রাইভারের মনে পড়ে যায়, বিশ্ববিদ্যালয় আছে কিনা এই পাড়ায়! সেখান থেকে লেজ বিতরণ করে, বোধহয় সেইজন্যই!

ইনফ্যাণ্ট ক্লাসে ভর্তি হওয়া থেকে শুরু করে ফিফ্‌থ ক্লাস অবধি পাঁচবার, ফোর্থক্লাসে তিনবার, থার্ডক্লাসে চারবার, সেকেণ্ড ক্লাসে সাতবার এবং ফার্ষ্টক্লাসে আঠারোবার—সবসুদ্ধ, আদি থেকে ইতি পর্যন্ত ইত্যাদি জড়িয়ে, সাঁইত্রিশবার মোটমাট ফেল গিয়ে, শেষটায় নিজের দ্বিতীয় পক্ষের ছেলে অন্যায় রকমে ঘন ঘন প্রোমোশন পেয়ে প্রায় ধরে ফেলে দেখে, অবশেষে, গোঁফে পাক ধরবার সঙ্গে, স্কুলে ইস্তফা এবং ম্যাট্রিক পাশের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে, ষ্টিয়ারিং হুইলের পাশে এসেছে। কাজেই ডিগ্রিধারীদের উপর খুব স্বাভাবিক এবং ন্যায়সঙ্গতই বিরাগ ছিলো ড্রাইভারের। এমন কি, বিজাতীয় ক্রোধই বলা যেতে পারে তাকে। পাশকরাদের আদৌ মানুষের মধ্যেই

তার মনে হত না, একেবারেই ধর্তব্যের বাইরে, নগণ্য এবং জঘন্য সে সব লোক, বাস্তবিক! আন্তরিক উষ্মা সে আর উহ্য রাখতে পারে না—মনের কথা ব্যক্ত করেই বসে।

বিশ্ববিদ্যালয় আবার কী বস্তু, তার সম্যক রহস্য অবগত হতে যাবেন, এমন সময়ে বেমক্কা আওয়াজে মোটরের একটা টায়ার ফেটে গাড়ি থেমে যায় হঠাৎ। আচমকা এই লেজসঙ্কুল পথে।

বোমা ফাটলো যেন! ভারি ঘাবড়ে যান হর্ষবর্ধন, কে ছুঁড়লো বোমা? ছেলেধরারা নাকি রে?

বেঁচে আছি তো দাদা? গোবরা নিজেকে চিম্‌টি কেটে দেখে। নিজেকে কাটতে গিয়ে দাদাকে চিম্‌টি কেটে বসে।

উঃ কী করছিস! হর্ষবর্ধন উহু করে ওঠেন। চিম্‌টি কাটছিস যে?

চিমটে দিয়ে টিকে ধরে না? টিকে আছি কি না দেখছি তাই। জানায় গোবরা। বোমা ফেটেছে বোধহয়।

বোমা না। পটকাও না! কিন্তু অনেক হাঙ্গামা! এই বলে মুখখানা মেঘাচ্ছন্ন করে ড্রাইভার গাড়ি থেকে নামে।

টায়ার বদলানো বেশ কিছুক্ষণের ধাক্কা জেনে নিয়ে হর্ষবর্ধনও গাড়িকে তালাক দেন। গোবরাও নেমে পড়ে। অনেকক্ষণ ধরে বাবু হয়ে বসে থেকে গা জড়িয়ে এসেছিলো, কাবু হবার দাখিলই প্রায়—হাত পা এই অবসরে একটু খেলিয়ে নেওয়া দরকার।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে করে অরুচি ধরে যায় হর্ষবর্ধনের—হঠাৎ তিনি প্রস্তাব করে বসেন, জীবে দয়া করলে কেমন হয় রে? তাই করা যাক। আয়!

জীবে দয়া—তার মানে?

জীবে দয়া অর্থাৎ রসগোল্লা, সন্দেশ, মেঠাই, মণ্ডা, মতিচুর?

তা তো বুঝেছি। কিন্তু জীব কোথায়? গোবর্ধন চারিধার তাকিয়ে, সূচীভেদ্যভাবে দৃষ্টি চালিয়েও জীব-পদবাচ্য এবং দয়ার

পাত্র, একটা কাঙাল কি ভিখারি, সাধু কি সন্ন্যাসী, এমন কি লালায়িত একটা ছাগল কি গরু পর্যন্ত আবিষ্কার করতে পারে না। একটা পরিশ্রান্ত পথভ্রান্ত নেড়ি কুত্তাও চোখে পড়ে না।

দয়া যে করবে, তা জীব কই তোমার ?

কেন, এই ত জীব! এইখানেই রয়েছে। মৃদুহাস্য করে বলেন হর্ষবর্ধন, যাবতীয় জীব এই আমার মুখের মধ্যেই আছে।

হর্ষবর্ধন বদন ব্যাদান করে তার ভেতর থেকে বিচলিত জীবকে বহিষ্কৃত করেন,—এটা কি জীব নয় ? কী তবে এটা শুনি ?

দ্বাপরে কুরুক্ষেত্রে শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীমান সব্যসাচীকে, স্বয়ং হাঁ করে যে প্রদর্শনী দেখিয়েছিলেন—সেই যুগের ওয়ার্লড এগজিবিশন আর কি! এবং অর্জুনকেও হাঁ করিয়ে, এমন কি তাকে একেবারে 'থ' করে দিয়েছিলেন বলতে গেলে—তারই পুনরভিনয় বা তেমনি রোমাঞ্চকর কোনো দৈবী-লীলা দেখতে পাবে, হয়তো এহেন প্রত্যাশা গোবরার ছিলো—কিন্তু যাবতীয় জীবের বদলে একমাত্র এবং কিম্ভূত কিমাকার ঐ বস্তু—এই দুর্ঘটনা দেখে কেবল ক্ষুণ্ণই নয় বিরক্তও হয় সে—ওঃ, এই জীব!

দাদার লেলিহান বাবা-কালী মূর্তিও তার ভালো লাগে না।

কিন্তু প্রস্তাবের কাছাকাছিই জীবে দয়ার ব্যবস্থা দেখলে কার না উৎসাহ হয় ? লোভের সামনে ক্ষোভ আর কতোক্ষণ থাকে ? মোটর বেগড়ানোর সামনেটাতেই জমকালো একটা সন্দেশের দোকান তাদের চোখে পড়ে।

এমন উপাদেয় জিনিস তারা কোথাও খায়নি—না নিজের দেশে, না কলকাতায়। জীবে দয়ার উপযুক্তই বটে! উল্লাসের আতিশয্যে গোবরা উন্মুখর হয়ে ওঠে, বাঃ বা! তোফা জিনিস তো! কেবল দয়া কেন, জীবে ভালোবাসাও বলতে পারা যায়, কি বলো দাদা ?

হবে না ? বলেন কি মশাই ? ভীম নাগের যে ! দোকানী জানাতে দ্বিধা করে না।

য়ঁ্যা, ভীম—কী বললে ? হর্ষবর্ধন তো লাফিয়ে উঠেছেন।

ঐ দেখুন না, সাইনবোর্ডেই দেখতে পাবেন। এটা হচ্ছে আসল ভীমের দোকান। আর পাশেই ঐ—তস্য ভ্রাতার।

তাইতো, সত্যিই তো। দু'ভায়ের তাক লেগে গেছে, চোখ উঠে গেছে কপালে। বহুক্ষণ বাদে হর্ষবর্ধন আগে সবাক হয়েছেন—দেখেছিস ! ভীমার্জুন তো কবে মরে ভূত হয়ে গেছে কিন্তু তাদের দোকান রয়েছে এখনো। মহাভারতকে মিথ্যে বলবি আর ? চোখের সামনেই জাজ্বল্যমান দেখ ! পুনরপি বলছেন তিনি—তা ছাড়া এমন চমৎকার মেঠাই আর কার হবে বল ? স্বয়ং ভীমের বের-করা, আলবৎ ! ভীম ছাড়া আর কারো কম্ম না, আমি হলফ করে বলতে পারি। বৃকোদর একটু পেটুক ছিলো, কে না জানে !

যেমন পেটুক ছিলো, দাদা, তেমনি খেতেও পারতো খুব। হজমও করতো বেশ ! তা পেটুক হওয়া এমন কি দোষের ? ছিলো বলেই তো বের করতে পেরেছিলো এসব ! স্বর্গত ঔদরিকের প্রতি গোবর্ধন নিজের কৃতজ্ঞতা নিবেদন করে—পেটুক হওয়া ভালোই তো ! তাতে ক্ষতিই বা কি ? খেতে আর খাওয়াতে মজবুত লোকরা মন্দ কি এমন ?

তৎক্ষণে মোটরটাকে দুরস্ত করে এনেছে ড্রাইভার। তার মাথাও অনেক সাফ হয়ে এসেছে। আরোহীদের এ-তাবৎ আলাপ-সালাপ অনুসরণ করে, বিশেষ করে অযাচিতভাবে জীব দয়া-সমিতির অন্তর্ভুক্ত হয়ে অভাবিত ভাবে ভীম নাগ উদরস্থ করার ফলে দিব্যজ্ঞান লাভ হয়েছে তার। তার আধ্যাত্মিক দৃষ্টির সামনে, কুরুক্ষেত্র আর কলকাতা, রামায়ণ-মহাভারত এবং আনন্দবাজার-বসুমতী একাকার হয়ে দেখা দিয়েছে।

মোটর চলতে থাকে এবং সে বলতে থাকে—নিজের থেকেই বলে যায়—ভীমার্জুন-পাড়া ছাড়িয়ে এলাম তো। আর এই হচ্ছে আপনার ধর্মতলা। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের আস্তানা ছিলো এখানে, বুঝেছেন? আর এখানটা চাঁদনি, অর্থাৎ কিনা চন্দ্রলোক, আজ্ঞে হ্যাঁ, আর এ জায়গাটা এস্‌প্ল্যানেড, বোধহয় ইন্দ্রপ্রস্থ ছিলো এখানে। ...আর এটা হলো গে' ডালহৌসি স্কোয়ার, ভারি কটমট নাম, কী ছিলো এখানে বোঝা যাচ্ছে না ঠিক। হয়তো দণ্ডকারণ্যের ডালপালাই হবে। এবার চললুম ক্লাইভ ষ্ট্রীট দিয়ে—ক্লাইভ কে ছিলো?

ড্রাইভারের প্রশ্নবাণে আহত হয়ে গোবরা দাদার দিকে তাকায়—কে ছিলো দাদা? ক্লাইভ কি তোমার জটায়ু পক্ষী?

উঁহু। ডালহৌসি আর ক্লাইভ এ দুটো বোধহয় মহাভারতের সেই দুটো বিচ্ছিরি লোক। হর্ষবর্ধনের ঈষৎ হাস্যই বেরোয়—আর কেউ না—হিড়িম্বা আর ঘটোৎকচ।

তাই হবে। বলে গোবরা—তাই হবে বুঝলে হে ড্রাইভার। কিন্তু বাপু, তোমাকে বললুম আমরা, কলকাতা থেকে আমাদের বার করে নিয়ে যেতে—একশো টাকা আগাম দিলুম নগদ—থোক, আর তুমি কিনা—কলকাতার মধ্যেই ঘুরপাক খাচ্ছো তখন থেকে। কেমন লোক হে তুমি? পঞ্চাশ মাইল তো এইখানেই কাটিয়ে দিলে। কুরুক্ষেত্রই বাধাবে দেখছি শেষটায়।

এই যে যাই মশাই। দেখতে পাচ্ছেন না সামনেই সেতুবন্ধ রামেশ্বর! এইটা পেরোলেই তো কলকাতার বার।

অপরিচিত হয়েও সুপরিচিত, পুরাতন অথচ চিরনূতন, আদিম এবং অকৃত্রিম, অদ্বিতীয় সেই হাওড়ার পুলকেই সেতুবন্ধ বলে ভেজাল চালানোর চেষ্টায় হর্ষবর্ধনের রাগ হয়ে যায়—এই সেতুবন্ধ? কিচ্ছু জানো না তুমি। কলকাতায় সেতুবন্ধ! দূর দূর!

বোকা পেয়েছো আমাদের? গোবরাও খাপ্পা হয়ে ওঠে—জানি না কিচ্ছু আমরা? বটে?

কেন, থাকতে কি নেই কলকাতায়? ড্রাইভারের আত্মরক্ষার প্রয়াস—এতো জিনিস আছে যখন!

তোমার মুণ্ডু আছে। সেতুবন্ধ জলে ভাসতো, তা জানো?

এও তো তাই মশাই! ড্রাইভার এবার স্বপক্ষে একটা পয়েণ্ট পায়। এও ভাসছে যে! তাকিয়ে দেখুন না নিচে!

ভাসতে পারে, কিন্তু সে সেতু বানিয়েছিলো বাঁদরে—গোবরা বলে, তুমি কি বলতে চাও যে, এও বাঁদরের তৈরি?

বাঁদর ছাড়া কি আর! এর পেছনেও সব লেজওলা লোক ছিলো মশাই, আমি বলে দিতে পারি। ড্রাইভারের জোরালো কবুলতি—দিব্যি গেলেই বলতে পারি। হুঁ।

ড্রাইভার একসঙ্গে দুটো পয়েণ্ট জেতে এবার—একটা নিজের পক্ষে, আরেকটা যারা তাকে বারম্বার ফেল করিয়েছিল, অদূরদর্শী সেই সব অবিবেচকদের বিপক্ষে।

হর্ষবর্ধন গম্ভীর হয়ে যান, একটা কথাও বলেন না আর। নেহাৎ ছেলেধরাদের ভয়, নইলে এক্ষুনি তিনি এই অর্বাচীনের গাড়ি থেকে সুড়ুৎ করে নেমে পড়তেন। আগাম দেওয়া ভাড়ার টাকাও তাঁর মুখে লাগাম দিয়ে রাখতে পারতো না। এমন নিরক্ষরের মোটরেও আবার মানুষ চাপে?

তাঁর আফশোষ হয়—ছ্যা! বলীরাজা একশো মুখ্যুকে সঙ্গে নিয়ে স্বর্গেও পা বাড়াতে সাহস করেন নি, বরঞ্চ জাহান্নামেই গেছলেন একলা—একটি টুঁ শব্দও না করে। আর তাঁকে কিনা, সেই জাতীয় একটা আকাটের সঙ্গে এক গাড়িতে চেপে কলকাতার বাইরে পাড়ি দিতে হচ্ছে! দুর্দৈব আর বলে কাকে?

গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে নিঃশব্দে চলে মোটর—কারো মুখেই রা

নেই আর। মৌলিক গবেষণায় ধাক্কা খেয়ে ড্রাইভারও দমে গেছে বেজায়! অবশেষে বালি ব্রিজ এসে পড়ে। আপনা আপনিই আসে।

ড্রাইভারের আমতা আমতা আরম্ভ হয়—আপনারা তো তখন উড়িয়ে দিলেন আমায়। বললেন ওটা সেতুবন্ধ হতে পারে না কখ্‌খনো? তাহলে এটা কী? এটা বালি ব্রিজ হলো তবে কি করে?

হর্ষবর্ধনের অটল গাম্ভীর্যকে নড়ানো যায়না, তবে তাঁর ভাইয়ের কৌতূহল উদ্রিক্ত হয় বটে—তুমিই বলো না বাপু।

ওইখেনে রামচন্দ্র সেতুবন্ধ করে এসে এইখানে বালিবধ সেরেছিলেন! তাছাড়া আর কী হতে পারে?

উত্তরটা হর্ষবর্ধনের সমীচীন বলেই মনে হয়, পৌরাণিক তথ্যের সঙ্গেও খাপ খায় যেন। এমন কি সেতুবন্ধের বিষয়টাও ড্রাইভারের দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে, পুনর্বিবেচনার যোগ্য বলে তাঁর সন্দেহ হতে থাকে। হতে পারে, আগে ওটা আসলে রামের কীর্তিই ছিলো, অবশেষে সুচতুর ইংরেজ পরে এসে সুযোগ বুঝে, কাউকে কিছু না বুঝতে দিয়ে চুপচাপ নিজের কৃতিত্ব বলে বেমালুম চালিয়ে দিয়েছে! কিন্তু মনের সংশয় মনেই তিনি চেপে রাখেন, উচ্চবাচ্য করবার তাঁর উৎসাহ হয়না আর। বিশেষতঃ একটা অজ্ঞ—এমন কি বিশেষজ্ঞই বলা যেতে পারে অনায়াসে,—এহেন একটা লোকের সঙ্গে বাৎচিৎ করা কি তাঁর শোভা পায়?

বালিবধ না কচু! সব বাজে কথা। গোবরা মুখ বেঁকায়। আর বিরিজের ওপারে কী তোমার, শুনি? দণ্ডকারণ্য?

ও-পারে? আজ্ঞে, দক্ষিণেশ্বর। তারপরে অর্ধ-স্বগতস্বরে নিজেকেই যেন সে জানায়। তোমাদের যমের বাড়ি আর কি!

অনুচ্চ অনুযোগটা কানে আসে গোবরার। অ্যাঁ, কি? যমের কথাটা কি বললে?

আজ্ঞে, যমলোক সটান দক্ষিণেই কিনা। শাস্তরেই বলে দিয়েছে।

সে তো সবার জন্যেই দক্ষিণে—চিরকাল ধরেই ডানহাতি। তোমাদের আমাদের কি আলাদা যমালয় নাকি? তোমার কি তাহলে সেটা উত্তরে হবে, শুনি? গোবরা চটে যায় বেজায়।

ড্রাইভার আর কথা বাড়ায় না, ভীম ততোক্ষণে হজম হয়ে, ভয়ানক রাগ জমেছে তার। বরাহনগর দিয়ে যাবার পথে, এটা যে দশ-অবতারের অন্যতমের, অখাদ্যতমের, পীঠস্থান সে সংবাদটাও জানবার কোনো প্রেরণা পায় না সে। টালা পেরিয়ে, খালকে ডান ধারে রেখে, বেলগেছের হাসপাতালকে বাঁয়ে ফেলে, সেটা যে হংসলোক, হয়তো হংসবাহন খোদ্ ব্রহ্মারই বাসস্থান সেকথা ঘুণাক্ষরেও না জানিয়েই, মৌনব্রতী হয়ে সে এগিয়ে চলে। অবশেষে একটা বাগান বাড়ির কাছাকাছি এসে ভস্ করে থেমে যায় গাড়িটা।

পেট্রল ফুরিয়েছে মশাই। আর এক পাও চলবে না মোটর!

তা হলে নেমে পড়া যাক, কি আর করা যাবে? হর্ষবর্ধন বলেন—এটা কোন জায়গা? খাণ্ডববন নয় তো? সঠিক বলো বাপু! খাণ্ডব-দাহনে আবার মারা পড়তে পারবো না আমরা!

আজ্ঞে না, বেলগেছে। বিনীত উত্তর আসে।

তাই ভালো! সামনে একটা বাড়িও আছে দেখছি! বেশ, এই বেলগাছেই আমরা আশ্রয় নেবো। নিরাপদ স্থান—কি বলিস গোবরা?

সেই ভালো দাদা! ঐ গাছপালাওলা বাড়িটাই ভাড়া করে ফেলা যাক্। কলকাতা থেকে অনেক দূরেও আসা গেছে—নয় কি? তা কম্‌সেকম্ একশো মাইল হবে প্রায়! গোবরা আন্দাজ পায়।

বাগানবাড়ির মধ্যে তাঁরা আস্তে আস্তে আগুয়ান হন। জনমানবের চিহ্নও নেই কোথ্‌থাও! পোড়ো-বাড়ি নাকি?

হর্ষবর্ধনের হৃদয় কম্পিত হয়, গোবরারও গা ছমছম করে। কিন্তু নাঃ, একটা জানলার ফাঁকে জনৈক বালকের মাথাই দেখা যায় যেন। যথেষ্টই ভরসা মেলে তারপর।

আরেকটু এগোতে, সেই ছেলেটি বেরিয়ে এসে তাঁদের অভ্যর্থনা করে নেয়—এই যে, এসে পড়েছেন দেখছি। অনেকক্ষণ থেকেই অপেক্ষা করছি আপনাদের জন্যে। এতো দেরি হলো কেন?

দেখেই দু'ভায়ের একেবারে চক্ষুস্থির—আর কেউ না, তাঁদেরই সদ্য-পরিচিত অন্ধকার-আলাপী শ্রীমান বাঁটকুল!

আকাশকে কেউ ধর্তব্যের মধ্যে জ্ঞান করে? হর্ষবর্ধন তাই করে বসলেন। বসলেন বললে ঠিক বলা হয় না, বরং সেই ধারণাব বশবর্তী হয়ে একেবারে তিনি ধরাশায়ী হলেন।

বাঁটকুলকে অকস্মাৎ মাটি ফুঁড়ে উঠতে দেখে তাঁর মাথা ঘুরে গেলো। পড়ে যাবার মুখে তিনি আকাশকে ধরতে গেলেন, ধরে আত্মসম্বরণ করতে গেলেন, কিন্তু পেরে উঠলেন না, গোবর্ধনের ঘাড়ে গিয়ে পড়লেন।

দাদার এই কাণ্ডে গোবরাও বাত্যাতাড়িত কদলীকাণ্ডের ন্যায় তৎক্ষণাৎ ধূলিসাৎ হয়ে গেলো। বাঁটকুল এগিয়ে এসে সান্ত্বনা জানালো—আহা-হা! বড্ড লাগলো নাকি?

হর্ষবর্ধন উঠে বসেছেন ততোক্ষণে, বাঁটকুলের অনুসন্ধিৎসার জবাবে তাঁর মুখ থেকে একমাত্র এবং একমাত্রা যে ধ্বনি বেরিয়েছে, তাকে ঠিক হর্ষধ্বনি বলা যায় না। তিনি শুধু বলেছেন—নাঃ!

গোবরাও উঠেছে, গায়ের ধুলো ঝেড়েছে, কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে হয়েছে এ বৃথা আড়ম্বর কেন? মৃত্যুর মুখে পা বাড়িয়ে কি কেউ জুতো বুরুশ করে? এই বিটকেলরা যেরকম ভয়ঙ্কর লোক, তাতে এক্ষুনি হয়তো আস্ত গায়ের চামড়াই খুলে নেবে, আর এই চামড়াই যদি গা থেকে ছেড়ে গেলো, তখন সেই চামড়ার ধুলো ঝেড়ে লাভ?

বাঁটকুল বলে, কি মশাই, পৃথিবীটা গোলাকার, কি বলেন ?

ভূগোল বিদ্যায় গোবরার ব্যুৎপত্তিই বেশি, সে-ই উত্তর যোগায় —হ্যাঁ, বেজায় গোল এই পৃথিবীতে !

ভেবেছিলেন পালিয়ে আমাদের হাত এড়াতে পারবেন, কিন্তু দেখলেন তো ! বাঁট্‌কুলের শব্দভেদী বাণ-প্রয়োগ ।

এ পর্যন্ত যা তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়েছে তাতেই রক্ষে নেই, তার ফলেই মাথা গুলিয়ে যাবার যোগাড়, কিন্তু তার চেয়েও বেশি তাঁকে বিচলিত করছে, এর পরেও আরো না জানি কী দেখতে হয়। এতাবৎ যা দেখেছেন তাতেই তাঁকে বোকা বানিয়ে দিয়েছে, কলকাতায় তাঁদের বাসায় একটু আগে যে বাঁট্‌কুল, কলকাতা ছাড়িয়ে একশো মাইল দূরে এসেও সেই বাঁট্‌কুল ! এই একটিমাত্র দৃশ্যেই তো তাঁরা 'থ' হয়ে গেছেন—কিন্তু এর পরে বাঁট্‌কুলেশ্বর বিটকেল-সম্রাট এসে তাদের আবার হাড়গোড় ভাঙা 'দ' না করে দেয় ! সেই অ-দৃষ্টের, অ-দেখা অদৃষ্টের কিম্বা আগামী দ্রষ্টব্যের ভাবনা ভেবেই হর্ষবর্ধন বেশি কাহিল হন ।

গোবরার দূরদৃষ্টি স্বভাবতঃই একটু কম, কাজেই আসন্ন দুরদৃষ্ট তাকে ততো ভাবিত করেনি, তখন পর্যন্ত কৌতূহলের ভারেই সে মুহ্যমান হয়ে ছিলো। তাছাড়া দাদা থাকতে তার ভাবনা কী ? বড়ো বড়ো যা কিছু চোট দাদার ওপর দিয়েই যাবে, তার যা কিছু ভাবনা কেবল দাদাকে নিয়ে।

তুমি ভেল্‌কি জানো না কি হে ছোকরা ? গোবরা আর জিগ্যেস না করে পারে না শেষ পর্যন্ত।

জানি বইকি। জানতে হয় বইকি। বাঁট্‌কুল চোখ মটকে বলে—সব কিছুই জানতে হয় আমাদের।

তুমি নিশ্চয় অন্তর্যামী ! নইলে আমরা এখানে আসবো, তুমি জানলে কি করে ? তাছাড়া এতোদূর এসে আমাদের মোটরের

কল বিগড়োবে তাই বা টের পেলে কি করে ? তুমি সহজ পাত্র নও বাপু! বারম্বার ঘাড় নাড়ে গোবরা।

নই-ই-তো! বাঁটকুলও নিজের সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ।

তুমি নিশ্চয় ডাইনি-বিদ্যে জানো? হর্ষবর্ধন কথা বলেন এতোক্ষণে—তা নইলে আমাদের আগে এখানে এসে পৌঁছোলে কি করে? মোটরে চেপে আসোনি তো! নিশ্চয় তুমি উড়ে এসেছো! নিশ্চয়, আমি বলতে পারি হলপ করে।

আকাশে ওড়ার কায়দাটা শিখিয়ে দেবে আমায়? গোবরা বায়না ধরে বসে।

সে আর এমন শক্ত কি! বাঁটকুল হাত পা নেড়ে গুপ্ত বিদ্যাটা ব্যক্ত করে—তেতলা বাড়ির ছাদে উঠতে হয়। আরো উঁচু হলে আরো ভালো। তারপর কার্ণিশ থেকে মারো এক লাফ!

হ্যাঁ, তাহলেই হয়েছে আর কি! গোবরার একদম্ বিশ্বাস হয় না। —হ্যাঁ, তাহলে আর দেখতে শুনতে হবে না!

আমি মাটিতে লাফ মারতে বলছি কি? আকাশে লাফ মারুন। তারপর যেমন করে লোকে জলে সাঁতার কাটে, তেমনি করে বাতাসের মধ্যে সাঁতার কেটে সোঁ সোঁ করে বেরিয়ে যান।

সাঁতার কাটতে কাটতে? তবু যেন সন্দেহ থাকে গোবরার।

পাখিদের মতোই—হুবহু। তবে আর বলছি কি!

আর মন্তর? মন্তর টন্তর কিচ্ছু নেই?

মন্তর একটা আছে বই কি! এক সময়ে বলে দেবো'খন।

গোবরা উল্লসিত হয়ে ওঠে—চলো চলো তবে, ছাদে যাওয়া যাক! এক্ষুনি চলো।

সবুর সইতে রাজি নয় গোবরা।

হর্ষবর্ধন সন্দিগ্ধ চক্ষে তাকান—পারবি কি উড়তে? তা তুই হাল্কা পল্কা আসিছ, পারতেও পারিস। আমার দ্বারা কিন্তু

লাফ ঝাঁপ পোষাবে না বাপু। বলে, জলেই সাঁতার কাটতে পারি না আমি।

চলো না দাদা, পরীক্ষা করেই দেখা যাক। তর সয়না তার—এমন আর শক্তটা কি! আকাশে ওড়া বইতো নয়।

উঁহু। আমি পারবো না বাপু। হর্ষবর্ধন ততোটা উদ্ব্যস্ত নন।

ছিঃ! পারবোনা বলতে আছে কি! নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাস না থাকলে জীবনে বড়ো হবে কি করে, বলো দেখি দাদা? গোবরা উপদেশ দেয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে।

খুব পারবেন! চেষ্টা করে দেখুন না। বাঁটুকুলও উৎসাহদাতা।

পড়োনি পদ্যপাঠে? মনে নেইকো তোমার? সনাতন পদ্যপাঠ থেকে গোবরা সদ্য সদ্য পঙ্কোদ্ধার করে!

> পারিবো না এ কথাটি বলিয়ো না আর।
> কেন পারিবেনা তাহা ভাবো একবার॥
> সকলে পেরেছে যাহা তুমিও পারিবে তাহা—

তাহাতে গিয়ে গোবরার একেবারে আটকে যায়, তারপর?

তারপর কী?

হর্ষবর্ধন মাথা চুলকান—লেখাপড়া করে যেই, গাড়ি চাপা পড়ে সেই—? তাঁরও দম আটকায়।

উঁহু, উঁহু। ওতো কথামালা, ওকি তোমার পদ্যপাঠ?

পিতা-মাতা গুরুজনে ভালোবাসো প্রাণপণে? এবার, ধারাপাত কি ব্যাকরণ কোত্থেকে বলা যায় না, হর্ষবর্ধন আরেক দফা বহুৎ টানাটানি করে বার করে আনেন।

নাঃ, তোমাকে স্মৃতিরত্ন উপাধি কিছুতেই দেওয়া যায় না দাদা! তুমি আবার বলো যে আমার মেমারি নেই! তোমার মনে আছে বাঁটুকুল?

মনে নেই, তবে মিলিয়ে দিতে পারি—সকলে পেরেছে যাহা, তুমিও পারিবে তাহা, না করিয়া উহু আহা এধার ওধার।

তোমার মাথা! তুমি তো পদ্যপাঠ আনতে গিয়ে ঠাকুরমার ঝুলি এনে ফেললে একেবারে। তোমাদের কর্ম নয় হে বাপু। বলে আমারই গিয়ে মনে নেই তো তোমরা। যাকগে, অতো মনে করে কি হবে আর? উড়ে দেখলেই ল্যাঠা চুকে যায়। ওড়া নিয়ে কথা।

আমার দ্বারা হবে না। সত্যি কথা বলতে কি, এ দেহে অসম্ভব। হর্ষবর্ধন নিজের বিষয়ে একেবারে নাস্তিক।

তোমার সেই এক গোঁ! কেবল পারবোনা আর পারবোনা! কেন পারবেনা শুনি? রাগ হবার কথাই, গোবর্ধনের রাগ হয়।

হাতিকে কখনো উড়তে দেখেছিস? হর্ষবর্ধন সলজ্জভাবে বলেন। কিন্তু বলে ফেলেই তাঁর লজ্জা হয়—নিজের সম্বন্ধে নিজের উক্ত সমালোচনা তাঁর ঠিক সমীচীন বোধ হয় না, তিনি কথাটা ঘুরিয়ে নেন। —আরশোলারাই ওড়ে। ফড়িংদেরও উড়তে দেখেছি। তারাই পারে, তাদের পক্ষেই সম্ভব।

বেশ, তাতে আর কী হয়েছে। আমি একাই উড়বো। আরশোলাই হই, আর তেলাপোকাই হই, আমার কিছু যায় আসে না। চলো তো হে বাঁটুকুল। মন্তরটা বলবে আমায়।

গোবরা বাড়ির ছাদে রওনা হবার জন্য পা বাড়ায়, অনন্ত-আকাশে উধাও হবার তার অদম্য সঙ্কল্প।

আগে চলে বাঁটুকুল, তারপরে গোবরা, পরিশেষে হর্ষবর্ধন।

যেতে যেতে দাদা বলেন। যাচ্ছিস যখন, তখন আসামের দিকেই যাস। বিটকেলদের বেহাতে পড়েছি, তোর বৌদিকে খবরটা দিস গিয়ে। আমি এখানেই থাকলাম, আমার দ্বারা আর উদ্ধার হওয়া হলো না। কি করবো? উড়তেই পারবোনা যে, যা মোটা হয়ে জন্মেছি। দু'কানে ডবল মন্তর নিলেও না।

হর্ষবর্ধনের দীর্ঘ-নিশ্বাস পড়তে থাকে।

কী বলবো বৌদিকে?

বৌদিকে? কী বলবি? কী আর বলবি! বলবার কিই বা আছে! তুই কি আর সেকথা বলতে পারবি? একটা চক পেলে লিখে দিতুম তোর পিঠে।

কি কথাটা বলোই না, পারবো আমি।

উঁহু। তুই উচ্চারণ করতেই পারবি না, সে কথা তোর মুখেই আনতে নেই।

বাঁটকুল পকেট থেকে এক টুকরো কপিং পেনসিল বার করে দেয়। এইটা দিয়ে ওঁর কামিজের পিঠে লিখে দিন! তারপরে জলের ঝাপটা মারলেই লেখার রং খুলে যাবে। একেবারে রঙিন কালির মতো দেখাবো।

সেই ভালো। তোর পিঠের দিকেই লিখি। তাহলে তুই দেখতেও পাবিনে। তুই যে এখনো ছেলেমানুষ! নিতান্ত নাবালক কিনা! কতো সামলে রাখতে হয় তোকে আমার। নইলে তোর বখে যেতে কতোক্ষণ?

হর্ষবর্ধন বোম্বাই ছাঁদে গোবরার পিঠে 'যাও পাখি বলো তারে'—এই পর্যন্ত লিখেছেন, এমন সময় হর্ণ বাজিয়ে একটা মোটর ঢোকে বাগানের গেট দিয়ে। হর্ষবধন সাহিত্যচর্চা স্থগিত রেখে দেখেন, সেই ধূসর রংয়ের ভাড়াটে মোটরটা। ইতিপূর্বে যা তাঁদের বাহনের স্থান অধিকার করেছিলো, সেই গাড়িটাই!

বাঁটকুল বলে: আপনারা এই ঘরের মধ্যে বসুন। আমাদের বিটকেল-সম্রাট এসে পড়লেন।

শোনবামাত্রই হর্ষবর্ধনের হাত থেকে পেন্সিল খসে পড়লো। সেইখানেই তিনি উপবিষ্ট হলেন, ধূলিমলিন মেঝের উপরেই। এবং গোবরা এসে পড়লো তাঁর কোলে—নিজের (এবং দাদার)

অনিচ্ছাসত্ত্বেই। হর্ষবর্ধনের সমস্ত শক্তি যেন মুহূর্তমধ্যে লোপ পায়, এতটুকু ক্ষমতা থাকে না যে গোবরাকে নামিয়ে রাখেন এবং গোবরারও এমন শক্তি নেই যে একটুখানি নড়ে বসে।

বিটকেল-সম্রাট যখন ঘরের মধ্যে পদার্পণ করলেন, তখন হর্ষবর্ধন—যে-তিনি একটু আগে শ্রীকৃষ্ণের কুরুক্ষেত্র-লীলা দেখাতে অপারগ হয়েছিলেন সেই-তিনিই—শ্রীকৃষ্ণের আরেক লীলা প্রকট করেছেন। গোবর্ধন-ধারণ করে বসে আছেন—মহাসমারোহে।

সম্রাট ঢুকেই বাঁটকুলকে প্রশ্ন করলেন, এ কি? এঁদের এরকম করে বসিয়ে রেখেছো কেন? ঘরে কি টেবিল চেয়ার নেই?

আমি কি রেখেছি? ওঁরা নিজেরাই বসে আছেন অমনি হয়ে। বাঁটকুল জবাব দেয়। ভায়ে-ভায়ে কোলাকুলি করছেন বোধহয়।

উঁহু। এটা ঠিক ভদ্রতা হচ্ছে না। অতিথি মানুষকে মাটিতে বসিয়া রাখা কি ভালো? ওঁদের চেয়ারে বসিয়ে দাও।

বিটকেল-দলপতি নিতান্তই ভদ্রলোক, ভয়াবহ কিছু নন, দেখে হর্ষবর্ধনের সংজ্ঞা ফিরে আসে। বাঁটকুলের বিনা সাহায্যেই ওঁরা চেয়ারে বসতে পারেন।

সম্রাটও একটা চেয়ার টেনে নেন। বেশ। এইবার একেবারেই কাজের কথা হোক। কেমন কিনা? টাকাটার ব্যবস্থা করেছেন? এনেছেন?

আজ্ঞে না। সবিনয়ে বলেন হর্ষবর্ধন। সঙ্গে আনতে পারিনি।

আনবো কি করে? এখানে আসতে হবে জানিনা তো আমরা। গোবর্ধন জবাব দেয়। আন্দাজ করতেই পারিনি, বলতে কি!

টাকাটা আনাবার ব্যবস্থা করুন তাহলে। নাহলে তো ছাড়া পাবেন না সহজে। সম্রাটের বিটকেলত্ব ক্রমশ প্রকাশ পেতে থাকে।

আনাবো কাকে দিয়ে? ছাড়া না পেলে আনবোই বা কি করে?

আমাদের তো আর কেউ এখানে নেই। হর্ষবর্ধন অনুযোগ করেন—এক আমরা নিজেরা ছাড়া।

তাহলে দেশেই খবর দিতে হয়। বেশ, ঠিকানা দিন দেশের—আমরাই খবর দেবো। বিটকেল-সম্রাটের অযাচিত অনুগ্রহ প্রকাশ পায়। কিন্তু মশাই, একটা কথা বলি, আপনাদের টাকা অঢেল, খবর পেয়েছি আমরা। দশ হাজারের কথাই আর নয়, গোড়াতেই বলে রাখা ভালো! পঞ্চাশ হাজারের এক পাই কমে ছাড়ছিনে আপনাদের, এ হেন দামী মাল তো সস্তায় ছাড়া যায় না? হুঁ।

তাতো ঠিক। গোবরা ঘাড় নাড়ে। পরে পস্তাবে কে?

হর্ষবর্ধন বলেন—টাকার জন্যে আমরা ভাবছি কি—

তাহলে ঠিকানাটা দিয়ে ফেলুন চট্ করে। আমরা খবর পাঠাবার ব্যবস্থা করি।

আমাদের দেশ হলো গে আসামে। ঠিকানা হচ্ছে—হর্ষবর্ধন বলতে উদ্যত হন।

উঁ—হুঁ—হুঁ—হুঁ—গোবর্ধন বাধা দেয়, মুখ বুজেই যে আপত্তি জানায়—বিনাবাক্যব্যয়ে। হুঁ—উঁ—উঁ—উঁ।

উঁহু—কুঁহু করছিস কেন? বাধা পেলেই বিরক্তি লাগে দাদার।

তুমি করছো কি বলো তো? দেশের ঠিকানা দিয়ে দিচ্ছো ওদের? বাধ্য হয়ে মুখ খুলতে হয় গোবরাকে। আমরা তো খোয়া গেছিই, শেষটায় বৌদিরও খোয়ার হোক তাই চাও? ভয়ের কারণটা প্রকাশ করেই বলতে হয়।

হর্ষবর্ধন একটু ঘাবড়েই যান। তাইতো। কথাটা বেফাঁস বলেনি গোবরা, মাথা ঘামাতে হয় তাঁকে। সম্ভাবনাটার ভালো মন্দ সব দিক সুচারুরূপে পুনর্বিবেচনা করতে হয়।

অনেক ভেবে চিন্তে ক্ষতির দিকটা নিখুঁৎ করে খতিয়ে, অবশেষে তিনি মাথা চালেন—তা খোয়া গেলেই বা! নিজেদের তো বাঁচতে

হবে আগে। আর স্বয়ং আমিই যদি খোয়া যেতে পেরে থাকি, তাহলে তোর বৌদিই বা কি এমন লাট যে—? আমার চেয়ে বৌদিই তোর বেশি আপনার হলো বুঝি ?

তুমি বলছো কি দাদা ? গোবরা ফোঁস করে ওঠে, অমন কথা মুখে আনাও পাপ। বৌদি হারালে কি পাওয়া যাবে আর ?

অ্যাঁ, তুই অবাক করলি গোবরা ? বৌদির ভাবনা কি তোর ? কটা চাস ? আমি বিয়ে করলেই তো বৌদি। পথে ঘাটেই পড়ে আছে, দেশে বিদেশেই ছড়ানো—বৌদির অভাব কি তোর ? চাই নাকি আরো ?

অসংখ্য বৌদির প্রলোভনে গোবরার মন টলে না—একটি মাত্রের ওপরই ওর টান—কিন্তু ওই রকমটি কি হবে আর দাদা ?

হর্ষবর্ধন আবার চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হন। অনেকক্ষণ ধরে বহুৎ সাঁতার কেটে, বিস্তর নাকানি চুবানি খেয়ে, তাঁর গবেষণালব্ধ সার সত্যটি উদ্ধার করেন—আমি ভেবে দেখলাম গোবরা, সব বৌদিই এক। ঠিক চীনাম্যানদের মতোই। চীনাম্যানে চীনাম্যানে কি পার্থক্য আছে কিছু ?—থাকলেও টের পাওয়া যায় না, চোখেও ধরা পড়ে না। দেখতেও সব হুবহু এক রকম, চাল-চালনেও তাই—তেমনই সব বৌদিই সমান।

হর্ষবর্ধন ঠিকানা বলতে প্রস্তুত হন।

গোবর্ধন বলে—কিন্তু আমাদের বৌদি কি রকম পাঁপড় ভাজে ? দাদাকে স্বপক্ষে আনতে চেষ্টা করে সে, সহজে হাল ছাড়ে না। উদরের ভেতর দিয়ে আবেদন চালিয়ে দাদার হৃদয়কে বিগলিত করবার তার প্রয়াস, এ রকম বৌদিকে তুমি পর ভাবতে পারো ?

হর্ষবর্ধন একটু হেসেন।

আর কিরকম বেগুনি বানায় ? গোবরার দ্বিতীয় দফা ওকালতি—বিলিয়ে দেবে এমন বৌদি ?

হর্ষবর্ধন টলায়মান! বেগুনির গুণ বৌদিতে সংক্রামিত হয়ে তাঁর মনকে গলিয়ে দেয়।

আর কী চমৎকার কুলের আচার বানায়, তা বলো দেখি? গোবরার এবার ব্রহ্মাস্ত্র-নিক্ষেপ!

কুলাচারের কথা ভেবে হর্ষবর্ধনের জিভে জল এসে পড়ে।

বিটকেল সম্রাট তাড়া লাগান—কই মশাই, কী হলো?

হর্ষবর্ধনের ভোট গোবরার বৌদির তরফে চলে গেছে ততোক্ষণে, তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছেন, যাই হোক, যতো বাড়াবাড়িই হোক, বাড়ির ঠিকানা তিনি দেবেন না কিছুতেই। প্রাণ গেলেও না। বেগুনিশীল বৌদি—থুড়ি—বৌকে, দাতব্য জিনিসের ভেতরে ভাবতেই পারা যায় না।

দেরি হচ্ছে কেন? সম্রাট তাড়া দেন, মনে পড়ছে না ঠিকানাটা?

হর্ষবর্ধন বললেন—না মশাই, না সম্রাট-মশাই, না। অমন কুলাচার-বিগর্হিত কাজ আমি করতে পারবো না, মাপ করবেন। বলেই মুখের ঝোলটা টেনে নেন!

তবে মরে পচুন এই ঘরে—মরে ভূত হয়ে যান। বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে এই বলে বেরিয়ে যান বিটকেল-সম্রাট বাঁটকুলকে সঙ্গে নিয়ে।

বেরিয়ে গিয়ে বাইরে থেকে কী একটা সুইচ টিপে দেন। সঙ্গে সঙ্গে কোত্থেকে কেমন করে সেই ঘরের দরজা জানলা সব আপনা হতেই ঝপাঝপ বন্ধ হয়ে হয়ে যায়।

মুহূর্তের মধ্যেই সূচীভেদ্য অন্ধকার। আর সেই অন্ধকারের মধ্যে কেবল হর্ষবর্ধন আর গোবর্ধন। পায়ের তলা থেকে মাটি যেন সরে যাচ্ছে—এবং তাঁরা তর্‌তর্‌ বেগে নেমে যাচ্ছেন অন্ধকার-গর্ভে!

হর্ষবর্ধন এবং তস্য ভ্রাতা, যখন সোজা রসাতলের যাত্রী,

অন্ধকারের অতল গর্ভেই নিঃশব্দে পা বাড়িয়েছেন, কিম্বা পা বাড়িয়ে বসে আছেন—বসে আছেন? বসে আছেন, বলা চলে কি ঠিক? অতল গর্ভে পা বাড়িয়ে বসে থাকাটা একটু অসম্ভব ব্যাপার বলেই মনে হয় যেন। কিন্তু, সে যাই হোক, সেই মারাত্মক মুহূর্তে পাশের ঘরে সম্রাট এবং তাঁর সদস্যের মধ্যে ঘোর গুরুতর পরামর্শ ঘনীভূত—

কি রকম বুঝছিস রে বাঁট্‌কুল?

সম্রাটের এই প্রশ্নে মুখ্যমন্ত্রী মুখখানাকে সূক্ষ্ম আর গম্ভীর করে এনেছেন—পদোচিত মর্যাদা বজায় না রাখলে কি মুরুব্বিদের চলে? —তারপর ঘাড় নেড়ে বলেছেন—গতিক বড়ো সুবিধের না, মশাই।

তাই মনে হচ্ছে। বড়ো ভাইটা তো আস্ত একটা আকাট—

আর ছোটোটা হচ্ছে কাঠ-গোঁয়ার।

যখন একবার না বলেছে তখন ওদের কাছ থেকে দেশের ঠিকানা বের করা যাবে কিনা কে জানে।—সম্রাট দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছেন—আর বাড়ির লোকরা খবর না পেলে একগাদা টাকা নিয়ে হাঁদারামদের উদ্ধার করতে আসবে কে?

তাইতো! তা ছাড়া—বাঁট্‌কুল মুখখানাকে বিরাট একটা জিজ্ঞাসার চিহ্ন বানিয়ে আনে—তা ছাড়া আরো ভাবনার কথা।

আরো ভাবনার কথা কিহে? গোদের ওপর বিষফোড়া নাকি?

অনেকদিন ধরে না বলে বলে শেষে হয়তো নিজেরাই ভুলে যাবে বাড়ির ঠিকানা। ওরা যেরকম এক নম্বরের বোকা তাতে আশ্চর্য নয়।

কিছু আশ্চর্য না! বিটকেলের দ্বিতীয় দফা কাতরোক্তি।

তাইতো, কি করা যায়! সম্রাট অবশেষে একটা সমাধানে এসে পৌঁছোন—পুলিসেই যাবো নাকি খবরটা দিতে?

পুলিসে! পথ-চলতি লাফাতে লাফাতে বাঁটুকুল যেন কলার খোসায় আছড়ে পড়ে হঠাৎ। পু—লি—স্! পুলিস কেন দাদা?

একটা লোক জলজ্যান্ত পাড়া থেকে খোয়া গেলো, পুলিসে গিয়ে খবর দেওয়া দরকার নয় কি? পাড়ার লোক হিসেবেই তো আমার যাওয়া উচিত। পাড়ার লোকের প্রতি একটা কর্তব্য নেই?

বাসরে! রসা রোড কি আমাদের পাড়া নাকি? আমরা তো বেলগেছের।

হলোই বা বেলগেছে, সারা পৃথিবীই আমাদের পাড়া। যার টাকা আছে এবং টাকাটা মারার সুযোগ আছে, সে-ই আমাদের আপনার লোক! আমরা দেশভক্তদেরও এক কাঠি ওপরে। বিশ্বপ্রেমিক আমরা—বসুধৈব কুটুম্বকম্ আমাদের।

তাবলে পুলিস কিছু আমাদের আত্মীয় নয়। বাঁটুকুল বলে।

নয় কি রকম? মাস্তুতো ভাই না হোক, পিস্তুতো ভাই তো বটে। ও একই কথা। ওদের না হলে হয়তো আমাদের চলে যেতে পারে, কিন্তু আমাদের না হলে ওদের চলে কখনো? আজই যদি আমরা ধর্মঘট করি, কালই ওদের চাকরি খতম্। আমরা কারবার গুটোলে পুলিসের আর দরকারই থাকবে না বলতে গেলে।

কিন্তু—কিন্তু—আমরাই গিয়ে—আমাদের বিরুদ্ধে খবর দেবো তো? সেটা কি ঠিক হবে? বাঁটুকুল ভয়ানকভাবে বিবেচনা করে—আর বিবেচনা করে বেশ বিচলিত হয়—তাহলে আমরা তো আমাদের ধরিয়েও দিতে পারি। তফাৎ আর কতোদূর?

হ্যাঁ, অতোখানি স্বার্থত্যাগ করতেই যাচ্ছি কিনা আমি। ধরিয়ে দিতেই যাচ্ছি আর কি? ধরা পড়বার জন্যে ভারি মাথাব্যথা পড়েছে আমার! হর্ষবর্ধনদের বিটকেলরা ধরে নিয়ে গেছে, আমি শুধু এই খবরটা গিয়ে দেবো কেবল। পুলিস থেকে যখন খবর-

কাগজওলারা পাবে, তখন দেশসুদ্ধ জানাজানি হয়ে যাবে। খবরের কাগজে বেরিয়ে গেলেই তো ঢি ঢি? তাই না? আর—

আর—?

বাঁটকুল বিস্ময়ে হাঁ করে বিটকেলের বুদ্ধিবৃত্তির বহর দেখে।

আর—আসামে ওদের বাড়িতে কি আর খবরের কাগজ যায় না? নিশ্চয় যায়, ওরা বড়োলোক যখন। তাহলে ওদের দেশের লোক, বাড়ির লোক, সবাই কর্তা-চুরি যাওয়ার ব্যাপারটা টের পাবে। এবং ওরা কি আর হারানো জিনিস পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করবে না? অমন মূল্যবান জিনিস ছেড়ে দেবে অমনি? কাগজে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে নিজেদের ঠিকানা জানিয়ে বিরাট পুরস্কার ঘোষণা করবে ওদের উদ্ধারের জন্য। বুঝেছিস?

তা বটে! কিন্তু—যদি উল্টো রকম ঘটে যায়? পুলিস উল্টো বুঝে তোমাকেই সন্দেহ করে পাকড়ে রাখে? তাহলে?

তাহলে—তাহলে একটা ভাবনার কথা বটে! কিন্তু পুলিস কি অতোখানি ভুল করবে? সম্রাট ভারি সমস্যাকুল হয়ে পড়েন।

তার চেয়ে আমি বলি কি, কাজ নেই পুলিসে গিয়ে। টাকা আদায় না হলো নাই হলো, ওদের দলভুক্ত করে নেওয়া যাক বরং, কী বলো তুমি? টাকার বদলে ওদের আমাদের দলে টেনে নিলেই তো হয়? রাজা বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন ছিলো, তোমার সাকরেদ মোটে সাতজন আছি আমরা, ওরা হলে এখন নবরত্ন হয়ে যায়।

নবরত্ন না ঘেঁচু! বিটকেল মুখ বেঁকায়, ওই পুরোনো বস্তাপচা মালদের নবরত্ন, মানে আনকোরা নতুন বলে আর চালাসনে বাঁটকুল!

আহা, সে নব কেন? ন-জনে যে নব হয়, সেই নব! অভিনব ব্যাখ্যা এনে বাঁটকুল বিটকেলকে বোঝাতে চেষ্টা করে।

নবরত্ন না ছাই! বিটকেলের বদন এবার অষ্টাবক্র হয়ে ওঠে, এইসব গবরত্নদের নিয়ে দল গড়লেই হয়েছে আমার। তাহলে আর দেখতে শুনতে হবে না।

অমন একটা সমীচীন প্রস্তাব এভাবে মাঠে মারা যাওয়ায় বাঁটকুলেরও রাগ হয়ে যায়—তাহলে ঐ বিটকেলাদিত্য হয়েই রইলে, বিক্রমাদিত্য হওয়া আর হলোনা তোমার, তেমন নামজাদাও হতে পারলে না তো!

আসল রত্ন আনতে পারিস, নিয়ায়! আদর করে তুলে নেবো। ঝুলিয়ে রাখবো গলায়—হ্যাঁ। কিন্তু ওসব ভেজালে আমি নেই বাপু! বলতে বলতে বিটকেল-সম্রাট বীরপদক্ষেপে বেরিয়ে যান—আমি সোজা থানাতেই চললাম। হ্যাঁ—

এবং বাঁটকুলের হাঁচি পড়ে যায়—বিটকেলের বেরোবার মুখে—, সেই মুহূর্তেই। কিছুতেই চেপে রাখা যায় না।

হর্ষবর্ধনরা যখন তরতর বেগে নেমে চলেছেন অন্ধকার-গর্ভে, দাঁড়াবার তর সইছে না, সেই সময়ে কোথথেকে যেন খিল খিল হাসি ভেসে এলো!

চমক লাগে হর্ষবর্ধনের। নাঃ তিনি হাসেননি, হাসবার মতো তাঁর মনের অবস্থা নয়। এবং মুখের অবস্থা? যদিও এখন আয়নায় দিকে তাকাবার ফুরসৎ নেই আর তার সুযোগই বা কই, তবু তিনি অনায়াসেই, নিজের মুখের দিকে না তাকিয়েই বলে দিতে পারেন যে, সেখানেও প্রায় তথৈবচ। কষ্টে-সৃষ্টে কাষ্ঠ-হাসি হাসতে পারাও তাঁর পক্ষে কঠিন এখন।

ভূত নয় তো?

খিল-খিল-ধ্বনির পরেই খিল খোলার ধ্বনি। দরজা খুলে বাঁটকুল ঘরে ঢোকে হঠাৎ আলোর ঝল্‌কানির মতই!

বাঃ! এই যে, ভাইয়ে ভাইয়ে কোলাকুলি হচ্ছে আবার! বেশ বেশ!

গোবর্ধন লজ্জিত হয়ে নিজেকে দাদার বাহুপাশ থেকে বিমুক্ত করে। কেন কী হয়েছে?—তপ্তকণ্ঠেই সে বলে, নিজের ভাই থাকতে কোলাকুলি করবার জন্যে কি পরের ভাইকে ধরতে হবে আমায়? সেইজন্যে পরের ভাইকে ডাকতে যাবো নাকি? কেন, ভাইয়ের কোলে বসলে কী হয়?

হর্ষবর্ধন চারিধারে তাকিয়ে দেখেন। তাইতো! তাঁর কণ্ঠ থেকে বিস্ময়ধ্বনি বেরোয়। সেইখানেই আছি তো! সেই ঘরেই—দূর দূর!

আফসোস হতে থাকে তাঁর—ভাবলাম নাকি পাতালেই যাচ্ছি! বলিরাজার মুল্লুকে! দূর দূর! সব ভূয়ো! অন্ধকারে মাথাটা ঘুরে গেছলো কেবল।

বাঁটকুল তাঁর দার্শনিক চিন্তাধারায় বাধা দেয়—কি মশাই? কি ঠিক করলেন? ঠিকানাটা মনে পড়লো না কি?

য়্যাঁ? ঠিকানা? কিসের ঠিকানা? কার ঠিকানা?—হর্ষবর্ধন তখন পর্যন্ত পৃথিবীতে এসে পৌঁছোতে পারেননি ঠিক। কোথাকার ঠিকানা? পাতালের? বলিরাজার ঠিকানা চাইছো তুমি?

আজ্ঞে হ্যাঁ। দিয়েই ফেলুন না দয়া করে। একবার দিয়ে ফেললেই তো ল্যাঠা চুকে যায়। ভুলে বলে ফেলতেও তো পারেন। ভুলে বললে দোষ কি আর?

বলিরাজার ঠিকানা? বটে? হর্ষবর্ধন দাড়িতে হাত দেন, ভারি ভাবিত হয়ে চোখ মুখ কপাল সবকিছু সিঁটকে ওঠে ওঁর। অবশেষে গোবরার দিকে চিন্তাকুল দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন—জানা আছে নাকি তোর? বলির ঠিকানাটা—?

বলাবলি আর কি? গোবরা বলে বাঁটকুলকে—তুমি যদি

আমাকে ওড়বার মন্ত্রটা শিখিয়ে দাও, তাহলে এক্ষুণি আমি তোমাকে বৌদির ঠিকানাটা বাত্‌লে দেবো।

সে আর বেশি কথা কি? বাঁট্‌কুলের উৎসাহ উছলে ওঠে, এই কথা? এ আর ক'টা কথা? এই তো মন্ত্র।—টা টি টুকমুক টেন্‌অ বাটায় শিখে নিন। মুখস্থ করে ফেলুন চটপট।

টা টি টুকমুক টেন্‌অ বাটায়? কেবল এই? আর কিছু না? গোবর্ধনের তত্ত্ব-জিজ্ঞাসায় সন্দেহবাদ। মন্ত্র তো অনুস্বর বিসর্গ। কই? অং বং কোথায়? নিশ্চয় আছে আরো।

এইটুকুই তো জানি, আর তো জানিনে। এই মন্তর। সে ব্যক্ত করে। —অং বং নিয়ে কী হবে?

আবার কি? মন্ত্র আবার কতো বড়ো হবে? বাঁট্‌কুলের হয়ে হর্ষবর্ধনই ওকালতি করেন—দেড় গজ হবে নাকি? মন্ত্র তো আর ফলার করার জিনিস নয়! ফলা নিয়ে কথা! ফলাও করার কথা!

হ্যাঁ, কথায় বলে—ফলেন পরিচীয়তে! ফলিয়ে দেখুন না, তাহলেই টের পাবেন তখন। বাঁট্‌কুলও সায় দেয় তাঁর সঙ্গে, টা টি টুকমুক টেন্‌অ বাটায়! আওড়ান আর উড়ুন! ব্যস!

উড়বো বইকি! উড়বো না তো কি ছাড়বো! পড়ে থাকতে যাবো না কি তোমাদের এই মগের মুল্লুকে! তবে কি না, পাখাটা গজালেই হলো! আর কিচ্ছু চাই না!

বেশ, এইবার তবে বৌদির ঠিকানাটা দিয়ে ফেলুন দিকি।

তোমার বৌদি নয়, বৌদি আমার। গোবর্ধন বুক ফুলিয়ে বলে—তোমারও বৌদি না এবং এই ভদ্রলোকেরও নয়। বৌদি হচ্ছে আমার—কেবল একা আমার। মুখ সামলে কথা বলো, বুঝলে হে ছোকরা? বৌদির গর্বে গোবরার বুক ডবোল হয়ে ওঠে—দাদার বিয়ে দিয়ে তবে বৌদি পেতে হয়। বাবার বিয়ে দিয়ে

দাদা, তেম্‌নি দাদার বিয়ে দিয়ে বৌদি! অতো সস্তা নয় হে! দাদা আছে তোমার যে বৌদি পাবে? অতো সহজ নয় বৌদি পাওয়া। একটা বৌ কিম্বা দিদি পাওয়ার চেয়ে শক্ত ভারী। তারপর বলো—কী চাচ্ছিলে? হ্যাঁ, ঠিকানা চাচ্ছিলে তুমি! বৌদির ঠিকানা হচ্ছে আসাম।

আসাম তা তো জানি, কিন্তু আসাম কেথোয়! বাঁটুকুলের ব্যাকুল জিজ্ঞাসা।

আসাম! কোথায়? দাঁড়াও বলছি—গোবর্ধন অগত্যা বাধ্য হয়ে ভূগোল স্মরণ করে—আসাম হচ্ছে বাংলাদেশের মাথায়। একেবারে মাথার চূড়ামণি আর কি! এককথায় শিরোমণি। আর—আর সেই হিমালয়ের পাদদেশে। প্রায় পাদদেশেই বলা যায় বলতে গেলে।

এমন লম্বা ঠিকানায় কি বুঝবো! খোলসা করে বলুন না।

আরো খোলসা করে! হিমালয় কোথায় জনতে চাও নাকি? হিমালয় খুঁজে পেলে আসামও খুঁজে পাবে। খুব সহজেই পাবে। নেপাল ভুটান আসাম প্রভৃতি সব কাছাকাছি। আর হিমালয়? হিমালয় হচ্ছে ভারতবর্ষের উত্তরে—বিলকুল উত্তরে—

সারা উত্তরটা জুড়ে হিমালয়—গোবরার সদুত্তর।

সবাই জানে! তা কে জানতে চেয়েছে? বাঁটুকুল ঠোঁট উল্টোয়।

তবে কি ভারতবর্ষ? ভারতবর্ষ কোথায় তাই জানতে চাও? ভারতবর্ষ হচ্ছে হিমালয়ের দক্ষিণে, আমরা যার ওপর দাঁড়িয়ে আছি সবাই। গোবর্ধন এক কথায় ফাঁস করে দেয়।

দেখুন দিকি মশাই! বাঁটুকুল এবার হর্ষবর্ধনকে মধ্যস্থ মানে, আমার কাছে মন্ত্রটা জেনে নিয়ে ঠিকানাটা দিচ্ছেন না এখন। এটা কি ওঁর ভালো হচ্ছে? বলুন! কাতর স্বরেই সে আর্জি করে।

হর্ষবধন ভাইয়ের রাজনীতি, রাজোচিত চালটা বুঝতে পেরেছেন

এতোক্ষণে, বুঝে বাহবাই দিয়েছেন মনে মনে। তিনি গোবর্ধনেরই অনুসরণ করেন—কেন, ঠিকই তো বলেছে ও। আসামের ঠিকানাই হলো আসল। আগে আসামে তো গিয়ে পৌঁছোও—তারপর আমাদের বাড়ি খুঁজে বের করতে দেরি কি আর। তখন তোমার ঐ মন্তর ঝাড়ো আর এনতার ওড়ো। চারধারে উড়তে থাকো—উড়তে উড়তে ঘুরতে থাকো—ঘুরতে ঘুরতেই চোখে পড়বে। কতো কাক-চিলই তো উড়ে গিয়ে বসছে আমাদের বাড়িতে, হরদমই বসছে, রোজই বসছে। কই, তাদের তো কখনো ভুল হচ্ছে না!

কিন্তু একটা জায়গার নাম তো জানা চাই। উড়তে শুরু করবো কোত্থেকে ?

ও! এই কথা! গৌহাটি! গৌহাটিই হলো গিয়ে আমাদের শহর। তোমাদের যেমন এই কলকাতা। ওড়বার পক্ষে শহরই প্রশস্ত নয় কি ?

গৌহাটি ? তাই বলুন! তা এতোক্ষণ বলতে হয়। গৌহাটির নাম শুনেছি বইকি! দাঁড়ান একটু, সম্রাটকে একটা টেলিফোন করে আসি! চলে আসছি এক্ষুনি!

বাঁটকুল লাফাতে লাফাতে বেরিয়ে যায়। কোনোদিকে দৃক্‌পাত না করেই দৌড় মারে।

এই তালে পালাই চলো। গোবরা দাদাকে পরামর্শ দেয়। উড়ে চলে যাই আমরা।

ছাদ দিয়ে ? তোর ঐ মন্তর ফুঁকে ? হর্ষবর্ধনকে ঘাড় নাড়েন—বলেছি তো, ওসব ওড়া-টোড়া আমার পোষায় না বড়ো।

আহা, ছাদ দিয়ে কেন ? উড়তে কে বলছে ? সদর দরজা খোলাই তো রেখে গেছে ছোঁড়াটা। তাড়াতাড়িতে শেকল আঁটতে ভুলে গেছে। এই হচ্ছে সুবর্ণ সুযোগ! ও আসবার আগেই—

হর্ষবর্ধন ভয়ে-ভাবনায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। নড়াচড়ায়

খুব উদ্দীপনা ছিলোনা। একটু গড়াতে পারলেই যেন ভালো হয়, এই ওঁর মনে হচ্ছিলো কেবল। হলোই বা শত্রুর বিবর, কিম্বা মৃত্যুর কবর—ঘুমোতে কি হয়েছে ? তার বাধাটা কোথায় ? কিন্তু ভাইয়ের উৎসাহের ধাক্কায়, বৃহৎ বপু নিয়ে বাধ্য হয়ে ওঁকে দাঁড়াতে হয়, এবং হাঁটি-হাঁটি-পা-পা করে নিজেকে বাড়াতে হয় বাইরে।

এতো বড়ো বাগান-বাড়িটা একদম খাঁ খাঁ! কেউ নেই কোথাও। এদিক ওদিক ঘুরে-ফিরে চুল চিরে দেখেন ওঁরা। গোবর্ধন পা বাড়িয়েই পালাতে ব্যস্ত ছিলো,কিন্তু হর্ষবর্ধন বিচক্ষণ, তিনি বলেছেন—না। কেউ কোথাও ঘাপটি মেরে লুকিয়ে আছে কিনা দেখা দরকার আগে। না দেখে শুনে বোকার মতো দৌড়োই, আর পেছন থেকে তাড়া করে তাড়িয়ে এসে ধরে ফেলুক আর কি, আর তারপর মার লাগাক দমাদ্দম, তাহলেই তো সুখের চারপোয়া।—

হ্যাঁ, মার লাগালেই হলো। নাগালে পেলে তো। পালিয়ে যাবো না এক ছুটে ?

না বাপু। ও-সব দৌড়ঝাঁপ আমার কর্ম না। আমি বাপু পারবো না তুড়িলাফ খেতে ; আমি তোমাদের ঐ চ্যাংড়াদের মতো নই। আমরা হলাম সাবেক মানুষ। দৌড়ঝাঁপের ধার দিয়েই আমি যাই না। লাফ খাবার নামটিও করো না আমার কাছে। ওসব ফচকেমিতে আমি নেই। দৌড়োনো ? বাবাঃ। সে হচ্ছে গাছে চড়ার চেয়েও খারাপ—ঢের ঢের খারাপ। তারচেয়ে আকাশে ওড়াও ভালো। ঢের ভালো, হ্যাঁ।

কিন্তু না,যতোদূর খুঁটিয়ে সম্ভব,চারিধার পরিদর্শন করে কয়েকটা কাঠবেড়ালী এবং কতিপয় উচ্চিংড়ে ছাড়া আর কোনো জনপ্রাণীর তাঁরা পাত্তা পান না। দু-একটা টিকটিকি অবশ্য তাঁদের নজরে পড়ে, কিন্তু তাদের গোয়েন্দা জাতীয় বলে সন্দেহ করা চলে না। ইতরতার যথেষ্ট অভাব সত্ত্বেও তারা ইতর প্রাণীর মধ্যেই গণ্য।

অতএব, দৌড় মারবার কোনো বাধ্য-বাধকতা নেই। হর্ষবর্ধন চলেন, লম্বা লম্বা পা ফেলেই চলেন, অকুতোভয়ে গেট পার হন, গট্ গট্ করেই হেঁটে চলেন তিনি। টিকটিকি কি কাঠবেড়ালীর থেকে কোনো আক্রমণের আশঙ্কা ছিলো না। আর উচ্চিংড়ের একটাকে তো জলজ্যান্ত নিজের লেজে বেঁধে নিয়েই চলেছেন। উচ্চিংড়ে আর উচ্চ্যাংড়ায় তফাৎ কতোটা ?

রাস্তাও নির্জন। মাঝে মাঝে এক-একটা মোটর হুস্ হুস্ করে চলে যায়। অনতিদূর থেকে ইঞ্জিনের হাঁস্‌ফাঁস্ ভেসে আসে, ফের তা কোথায় সুদূরপরাহত হয়ে যায়। কাছে-পিঠে কোথাও দিয়ে রেলগাড়ির যাতায়াত আছে, আন্দাজ করা কঠিন নয়। দূরে দূরে কদচিৎ পদাতিকের টিকি যে না দেখা যায় তা নয়, কিন্তু ভালো করে পা চালিয়ে টিকির অতিরিক্ত বেশি কিছু দেখবার দুশ্চেষ্টা করতে গেলেই, সে-সব জনমনিষ্যি, আশেপাশে কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে যায়। বাতাসেই মিলিয়ে যায় নাকি, কে জানে !

অনেক দূর পর্যন্ত তাঁরা এগোন, কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা।

থামাবো একটা মোটরকে ? হর্ষবর্ধন শুধান হঠাৎ।

কি করে থামাবে ! গোবরার বিস্ময় লাগে।

কেন, ফাসটো বুকের লাসটো চ্যাপ্টার হয়ে।

সে আবার কি, দাদা !

তোর একেবারে কিচ্ছু মেমারি নেইরে গোবরা ! কি করে যে তুই টিকে আছিস তাই আমার তাক লাগে। আশ্চয্যি ! সেই যেরে—একটা ছেলে—মানে একটা ছেলের ছবি সূর্যের দিকে পিঠ করে দাঁড়িয়ে—দু'হাত দু'দিকে লম্বা করে দিয়েছে—উত্তরে আর দক্ষিণে—মনে পড়ছে না তোর !

হ্যাঁ হ্যাঁ—গোবরার মনে পড়ে যায়—তা, কি হয়েছে তার !

হবে আবার কি। হর্ষবর্ধন বলেন—বলছিলাম এই যে, যদি

সেই ছবিটির মত হয়ে রাস্তা জুড়ে দাঁড়াই, তাহলে কি মোটরগাড়ি থামাবে না, বলতে চাস? একটা না একটা থামবেই। আমাকে ভেদ করে যেতে পারবে না কিছু!

গোবর্ধন কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলে—উঁহু। ওসব ঝক্কি নিয়ে কাজ নেই দাদা! মোটর গাড়ির কি মর্জি হবে, কে জানে! হয়তো—আশঙ্কাটা সে ব্যক্ত না করে পারে না—ধাক্কাটাক্কা লেগে ছবি ভেঙে যেতেও পারে। রাস্তায় সেঁটে গিয়ে জলছবি হয়ে যেতে পারো।

হ্যাঁ, হলেই হলো আর কি! দেখেছিস একবার—কি রকম ছবি একখান! ইয়া ছাতি! ইয়া ভুঁড়ি! যাকে শাস্ত্রে বলেছে শাল প্রাংশু মহাভূজঃ! এ-ছবি আর ভাঙতে হয় না! নিজের দিকে তিনি নিজের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তবে হ্যাঁ, ফ্রেমট্রেমের কথা বলা যায় না। মোটরের ছোঁয়া লাগলে ওসব গুঁড়ো হয়ে যেতে পারে বটে। তা, তুই না হয় একটু দূরেই থাকিস।

গোবরাকে তিনি নিতান্তই একটা ফ্রেমের মধ্যে গণ্য করেন—আস্ত একখানা কাঠের ফ্রেম—ফ্রেম-আপ্—তাছাড়া আর কি?

গোবরা কিন্তু তর্কাতর্কির মধ্যে যায় না। হর্ষবর্ধন ক্ষেপতে কতোক্ষণ? দাদাকে তার জানা আছে বেশ। এই বিপদসঙ্কুল মুহূর্তে, যে অসময়ে দাদার ছবি হবার দুর্দমনীয় অভিরুচি, সেই সঙ্কটক্ষণে, দাদাকে এবং নিজেকে—ছবি ও ফ্রেম একাধারে জড়িত রাখাই সুবুদ্ধির পরিচায়ক। ঠিক যে ফ্রেমের মায়াতেই সে পিছিয়ে যায়, তা নয়, ছবির প্রতিও একটা অনির্বচনীয় টান অকস্মাৎ সে অনুভব করে যেন। ছবি ছাড়া কি ফ্রেম কখনো থাকতে পারে?

তার চেয়ে বরং ঐ সাইকেলওলাকেই আটকাও—সে অল্প বুদ্ধি বাৎলায়—তাহলেই হবে।

যদি যায়, অল্পের ওপর দিয়েই যাক, এই তার মৎলব।

পথের মধ্যে হঠাৎ, যারপরনাই বাহুবিস্তার দেখে সাইকেলওয়ালা তটস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে—কি ? ব্যাপার কি ? বাঘ বেরিয়েছে ?

বাঘ ! জানিনে তো ! হর্ষবর্ধনের পিলে চমকে যায় শুনে, আজ্ঞে—একটা কথা জিগ্যেস করছিলুম ! বলছিলুম কি, যে দিল্লী আর কদ্দূর ?

দিল্লী ! দিল্লী কেন ? বেলগেছেয় বসে হঠাৎ দিল্লীর খোঁজ পড়লো কেন ? লাড্ডু টাড্ডু খেতে চান নাকি ?

আজ্ঞে না—এবার গোবরা যোগ দেয়—এখান থেকে দিল্লী কদ্দূর সেটাই জানতে চাইছিলাম। সেইদিকেই চলেছি কিনা আমরা।

রাঁচি থেকে রওনা হয়েছেন বুঝি ? তা দিল্লী এখনো দূব আছে—সাইকেলওয়ালা প্যাড্‌লিং শুরু করতে করতে বলে—এখান থেকে দিল্লী—তা বেশ একটুখানি দূরই বই কি !

সাইকেলওয়ালা চলে গেলে হর্ষবর্ধন রেগে ওঠেন, হঠাৎ খামোখা কি মুস্কিল বাধালি দেখ দিকি। চুরি গেছলাম ভালো গেছলাম, পদে ছিলাম তবু—পালাতে গিয়ে কি বিপদে পড়া গেলো দেখ তো। কি সব ঝঞ্ঝাট ডেকে আনলি দেখ দিকি। এখন কোথায় দিল্লী তার ঠিক নেই, রাস্তাঘাটও অজানা, এধারকার লোকগুলোও সুবিধে নয়—লোকের পাত্তাই নেই তো লোক ! তার ওপর আবার বাঘ বেরিয়েছেন দয়া করে। এইবার আর কি, সবংশে বাঘের পেটে গিয়ে হজম হয়ে বসে থাকা যাক। ব্যস্ !

এই বিদেশ-বিভুঁয়ে, বেঘোরে মারা যাবার তথ্যটা যতোই গভীর ভাব হর্ষবর্ধনের অন্তর্গত হতে থাকে, ততোই তিনি আরো খাপ্পা হয়ে ওঠেন। রেগে-মেগে গোবরাকে উজবুক উপাধি দিয়ে ফেলতেও তাঁর দ্বিধা হয় না।

দেখ তো। কী ফ্যাসাদ বাধালি দেখ দিকি। লোকে প্রাণ

নিয়েই পালায়। পালাতে গিয়ে কেউ আর প্রাণ দেয় না। কিন্তু এ কী করলি দেখ তো? ছ্যা—ছ্যা!

হর্ষবর্ধনের ধিক্‌কৃতি এবং মুখবিকৃতির অন্ত থাকে না আর। বলেন, সুখে থাকতে ভূতে কিলোয় বলেছে কেন তবে? বিটকেলের হাত থেকে বাঁচতে গিয়ে এখন বাঘের মুখে মরতে হলো। এরকম দুর্দশার চেয়ে বিটকেলের গুঁতোও যে ভালো ছিলো বাপু। পেটে খেলে পিঠে সয়, কথায় বলেছে; কিন্তু এখন বাঘের পেটে গেলে আর কোথায় সইবে? কী খিটকেল হোলো ছাখ্?

গোবর্ধন কী বলবে? এসব অভিযোগের কী জবাব আছে? প্রাণ তো যেতেই বসেছে, সেজন্যে আর মন খারাপ করে লাভ কি, তর্কাতর্কিতেই বা কিবা ফল? খোয়া যাবার মুখে, যতোটা সাধ্য, দাদার বাধ্য হয়ে দাদাকে খুশি রাখতেই সে চায়। দাদার কথায় সায় দিয়ে সান্ত্বনাদানের চেষ্টাই সে করে—বাঘে ছুঁলে আবার আঠারো ঘা! জানো তো দাদা?

একে এহেন দুর্ভাবনার উত্তাপ, তার ওপরে আবার টিপ্পনির ফোড়ন-কাটা, হর্ষবর্ধনের সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়! তিনি চড়বড় করে ওঠেন—হ্যাঁ, ঘা বানাতেই আসছে কি না তারা! ছুঁয়েই ছেড়ে দেবে কিনা! তোর মতোই হাঁদা কিনা বাঘগুলো? আগে গিলে বসে তারপরে তাদের অন্য কথা! বাঘ বলছে কেন তবে? বাগে পেলেই হলো একবার! ব্যাস! আর হুঁ-হাঁ নেই! হুম!

হুম নয়, হালুম! গোবরা আবার কথা বলে—হালুম দাদা! হালুম। আর গেলুম! হাড়ে হাড়ে মালুম হবে তখন।

হর্ষবর্ধনের ইচ্ছা করে বাঘের আশু প্রয়োজনীয় ভূমিকাটা, বিকল্পে, তিনিই অভিনয় করে বসেন। আঠারো না হোক কয়েক ঘা অন্ততঃ তক্ষুনি খাইয়ে দেন গোবরাকে। মালুম পাইয়ে দেন।

এক্ষুনি একটা বাঘ বেরিয়ে এসে তোকে ধরে আর গেলে কোঁৎ

কোঁৎ করে—আমি দেখি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখি আমি। তোর মতো পাঁচটাকে খেলে তবে আমার আনন্দ হয়।

সুখাবহ শোচনীয় দৃশ্যটাকে তিনি কল্পনায় হৃদয়ঙ্গম করে উপভোগ করেন।

তাতো হবেই।—গোবর্ধনের ক্ষুণ্ণস্বর—হবে না কেন? সীতাকে বনবাসে রেখে এসেছো, এখন লক্ষ্মণ বর্জন করলেই তো সুখের তোমার চোদ্দ পোয়া! তার চোখের দৃষ্টিও অক্ষুণ্ণ থাকে না, অশ্রুবাষ্পে ঝাপ্‌সা হয়ে ওঠে।

যা—যাঃ! ভারি আমার লক্ষ্মণ এসেছেন! তুই গেলে আমার একটা দুর্লক্ষণ যায়! এরকম পদে পদে মরতে হয় না আমাদের। আর তোর বৌদিও কিছু সুলক্ষণ নয়। যা বলবো, হক কথা। সীতা বলতে হয় তুই বলগে যা, যতো তোর প্রাণ চায়—আমি ওকে সূর্পনখাও বলতেও রাজি নই। মন্দোদরীও না, হিড়িম্বাও নয়।

বাড়ি ফিরে আমি ঠিক বলে দেবো বৌদিকে।

হর্ষবর্ধন ভয় খান না, বলেন, জানা আছে আমার। তোর মনে থাকলে তো তদ্দিন। মেমারিই নেই তোর যে মহামারী বাধাবি। এক নম্বরের মেমারিলেস্‌!

আমি মুখস্থ করে ফেলছি এক্ষুনি। গোবর্ধনের ঘন ঘন ঠোঁট নড়তে থাকে। কী কী উপমা বৌদিকে দিতে দাদা একেবারেই নারাজ, সেই অনুপম বিশেষণদের সমস্ত তালিকাটা সম্পূর্ণ নিজের উদরস্থ করবার দুরূহ অধ্যবসায়ে সে উঠে পড়ে লেগে যায়।

স্ত্রী-বুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী, শাস্ত্রেই বলে দিয়েছে! হর্ষবর্ধন গজ গজ করেন, শাস্তরে কি আর মিথ্যে বলে? না তোর বুদ্ধি শুনি, না আজ এমন বেঘোরে মরি!

আমি বুঝি স্ত্রী? গোবরা এবার প্রতিবাদ না করে পারে না, মেয়েছেলে বুঝি আমি!

মেয়েছেলে হলেও রক্ষে ছিলো। তুই মেয়েরও অধম। বলেই তো দিয়েছি, তুই একটা নাৎনি! মানুষের মধ্যেই গণ্য না।

হর্ষবর্ধন আর কালবিলম্ব না করে দিল্লীর উল্টো দিকে লম্বা লম্বা পা ফেলতে শুরু করেন। বাঘের আহার্য হবার আগে পায়ের সাহায্য নেওয়া—যতোক্ষণ পর্যন্ত ওগুলো আস্ত আছে এবং পেটের মধ্যে সেঁধোয়নি, মানে, বাঘের পেটের মধ্যে—তাকে চালানোই শ্রেষ্ঠ উপায় বলে তাঁর ধারণা হয়। তিনি পা চালিয়ে চলেন, তীর বেগেই যান, ষ্টিম রোলার যেমন তীরবেগে যান, প্রায় তেমনি ক্ষিপ্র গতিতে—মাঝে মাঝে ডানদিকের ঘাড় ঈষৎ কাৎ করে দেখে নেন—নাঃ, গোবরা ঠিক ছায়ার মতোই অনুসরণ করছে বটে—দুর্লক্ষণের মতোই হুবহু!—এবং তার বাঁ দিকের আধখানা মুখ থেকে মৃদুমন্দ হাসি স্বতঃই বিস্ফারিত হয়ে বহির্গত হতে থাকে।

এদিকে বিটকেল-সম্রাটের রাজপ্রাসাদে দারুণ হৈ চৈ। বাঁটকুল টেলিফোন করে ফিরে এসেই দেখে, সদর গেটে এক জটিল জটলা! হর্ষবর্ধনরা উধাও হয়েছেন, জানতে তার বেশি দেরি লাগে না।

আমি তো গেছলাম ফোন করতে, তোমরা সব গেছলে কোথায়? বাঁটকুল কৈফিয়ৎ চায়—কোন চুলোয়?

আমি তো এইমাত্র ফিরছি—! সোফার বলে—সম্রাটকে পৌঁছে দিয়ে আসছি এই! এসেই দেখি এই কাণ্ড!

ঝক্কম্‌ঝক্কা, তুমি? তুমি কোথায় গেছলে দারোয়ানজি? বাঁটকুলের তিক্ত স্বর।

দারোয়ানজির ভগ্ন কণ্ঠের সঙ্গে ভাঙা বাংলা সংমিশ্রিত হয়ে যা বেরোয় তার মর্ম—তার পাশের বাড়ির বন্ধু লটপট সিং-এর নিকট ডলিত খৈনির প্রত্যাশায় সে একটুক্ষণের জন্যেই গেটকে ছেড়ে-

ছিলো। লটপট সিংও ঘটনাস্থলে অনুপস্থিত ছিলো না, ঝকমঝক্কার কথার সত্যতা সম্বন্ধে সেও সাফাই দেয়।

খৈনি খেতে গেছো! তবে আর কি, মাথা কিনে নিয়েছো আমার! বাঁটুকুল রাগের চোটে তিড়িংবিড়িং করে লাফাতে থাকে—আর তুমি? মালি বাবাজীবন? তুমি কেন কেটে পড়েছিলে? কী খেতে, শুনি?

মালি, ঠিক কিছু খেতে নয়, তবে খাদ্য-সংক্রান্ত ব্যাপারেই বিজড়িত হয়ে, কিছুক্ষণের জন্য কাছাকাছি অন্যত্র যেতে বাধ্য হয়েছিলো, স্বাভাবিক সঙ্কোচ কাটিয়ে, সেই কথাটা কবুল করে বসে। আর কিছু নয়, কতকগুলো পেয়ারা কেবল! এই গাছেই সেইগুলো সঞ্চয় করে বেলগেছের বাজারে—হ্যাঁ, তা বাঁটুকুলবাবু যদি তাকে বামাল সরানো বলেন, কি চোরাই মাল বেচাই বলেন—সে আর কী বলবে? মালির দিনরাত হাড়ভাঙা খাটুনি তো কেউ আর দেখে না। কখন ছুটো তলায়-পড়ে-থাকা পেয়ারা কুড়িয়ে, তাকে পয়সায় বাড়িয়ে, পান-দোক্তোয় পরিণত করবার চেষ্টা করেছে, সেইটাই খালি নজরে পড়ে সবার। দারোয়ান যদি দ্বার ছেড়ে খৈনির তালে যেতে পারে তাহলে তার মালি থেকে বামালি হওয়াটাই কি ভারী দোষের হয়েছে?

বেশ, তোমরা গিয়েছিলে তো দরজাটা লাগিয়ে যেতে হয়েছিলো কি? বলি, দরজা তো একটা আছে? দরজাটা আছে কি জন্যে?

বাঁটুকুলের এই জিজ্ঞাসার জবাবে কেউই কিছু বলতে পারে না,—দরজাটাও না।

এমনই উৎকণ্ঠার সময়ে, হর্ষবর্ধন বীর সেনানায়কের ন্যায় ধীর পদক্ষেপে, পশ্চাদ্বর্তী গোবর্ধন-রূপ বিরাট সৈন্যবাহিনীকে অদৃশ্য অঙ্গুলি-হেলনে অবহেলায় চালিত করে একেবারে তাদের মধ্যিখানে এসে খাড়া হন।

বাঃ, কোথায় গেছলেন মশাই আপনারা? আচ্ছা লোক বটে! বাঁটকুল আকাশ থেকে পড়ে, কিম্বা, আকাশেই সোজা উঠে পড়ে—সেই পরমাশ্চর্যের মুহূর্তে সঠিক সে বুঝতে পারেনা।

হাওয়া খেতে বেরিয়েছিলাম, বেড়াচ্ছিলাম একটু। হর্ষবর্ধন গম্ভীর কণ্ঠে বলেন—কেন, হাওয়া কি খেতে নেই? হয়েছে কি?

না, না, হয়নি কিছু। কী হবে? বাঁটকুল সামলে নেয়—আপনাদের বেড়িয়ে ফেরার অপেক্ষাই করছিলাম আমরা। কখন ফিরবেন সেই কথাই হচ্ছিলো আমাদের।

ফিরতে আপনাদের দেরি হচ্ছিলো কি না! সোফার বলে।

দেরি? এ আর এমন কি দেরি হয়েছে?

হর্ষবর্ধনের অভিযোগ হয়—আমার এই লক্ষ্মণ-ভায়ার পরামর্শ শুনলে দেরি কাকে বলে বুঝতে পারতে! এজন্মেই ফিরতেই পারা যেতো কি না সন্দেহ!

এতোক্ষণ হয়তো বাঘের পিঠে চেপে—পিঠে? উঁহু, বাঘের পেটে চেপে জঙ্গলে-জঙ্গলেই ঘুরছি এখন! গোবরার কথা বেরোয়।

ঝক্কমঝক্কা তক্ষুনি, আর দেরি না করে, বন্ধু লটপট সিং-এর বাহুবলের সাহায্যে, সেই বিরাটকায় গেটের প্রকাণ্ড পাল্লা দুটো ভিড়িয়ে, তাতে পেল্লায় এক তালা লাগিয়ে দেয়, সেই দণ্ডেই।

রাম বলো, লটপট সিং! বলে সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। রাম রাম বলো ভাইয়া!

নেহি নেহি, ঝক্কমঝক্কা! রাধাকিষণ বোল্‌না চাহিয়ে!

হর্ষবর্ধন বলেন—হ্যাঁ, ভালো করে দরজাটা এঁটে দাও বাপু! যেন একটুও ফাঁক না থাকে কোথাও। বাঘ বেরিয়েছে কিনা! আস্ত মানুষ খেকো বাঘ, বুঝেছো?

বাঘ কেনো বাবুজি, ইস্‌দফে কোই বিল্লি ভি বাহার্‌সে সেক্‌বে

না। সীয়ারাম! সীয়ারাম! বলে সে ভয়ানক আরামের হাসি হাসে।

হাথিকোভি নিকালনা মুস্কিলই হ্যায়? হর্ষবর্ধনের দিকে লক্ষ্য করেই লটপট সিংয়ের এই হাতিমার্কা কটাক্ষ।

হাতি কো বাৎ তো হচ্চে না পাঁড়েজি।—হর্ষবর্ধন লটপট সিংকে বোঝাতে চেষ্টা করেন—বাঘকো কেয়া বোলতা হিন্দিমে? শের? ঐ শের বাহার হয়েচে।

শেরের বাহার সিংহ-শাবক কতোখানি বোঝে, সেই জানে কিন্তু গোবরা দাদাকে আশ্বস্ত করে—শের টের কি বাজে বকছো দাদা? গেটের কোথাও এক চুল ফাঁক আছে নাকি? একটা আধসের গলাই শক্ত, তা সের?

যাকগে। যেতে দে! বাঘের পেটের চেয়ে নিজের পেটের ভাবনা ভাব আগে···বৎস বাঁটুকুল! বাঁটুকুলচন্দ্র! শোনো। এদিকে এসো তো। এই বলে হর্ষবর্ধন বুকপকেটের থেকে ঘাম-ভেজা একখানা কাগজ টেনে বার করেন—এই নোটখানা নাও! আমাদের আহারাদির ব্যবস্থা করো তো বাপু! খিদেয় নাড়ি চিঁচিঁ করছে। গোবরার কি! ও তো নারীর অধম। খিদের বালাই নেই ওর। বাবাঃ! সকাল থেকে কি কম হয়রান পরেশান হোলো? যাও তো সোণা ছেলে, কিছু খাবার-টাবারের যোগাড় দেখো তো আগে।

জড়ীভূত নোটখানাকে বিস্ফারিত করতে গিয়ে বাঁটুকুল উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে—ওমা! এ যে একশো টাকার নোট! বাঃ!

কেন, ওতে কি কুলোবে না?

এতো কি হবে? দু-তিন টাকাই ঢের! সাতানব্বই টাকা ফেরতা আসবে।

দোহাই বাপু, আর যাই করো, ফেরতা টেরতা এনো না। ওতে

আমরা ব্যথা পাই, ভারি দমে যাই আমরা। আমাদের জানা আছে টাকাকড়ির কখনো ফেরতা আসে না—ওদের হচ্ছে অগস্ত্য-যাত্রা। কর্পূরের মতোই কেমন করে যেন উপে যায় ওরা! তা, অপরের হাতেই কি, আর নিজের হাতেই কি। ওদের একবার এহাত থেকে ওহাত, মানে বেহাত হলেই হলো!

এতে আপনাদের একমাসের খরচ চলেও অনেক বেঁচে যাবে—আমি বলছি।

এই সেরেছে! হর্ষবর্ধনের চোখে-মুখে বিভীষিকা প্রকট হয়ে ওঠে—বলছি না, যে বাঁচাতে হবে না? বাঁচিও না একদম। টাকা বাঁচালে মানুষ মারা পড়ে—তা জানো? টাকা মেরেই মানুষ বেঁচে থাকে। আধমরা হয়ে টাকা বাঁচিয়ে লাভ? তার চেয়ে যে টাকা বাঁচবে, তোমার হাতেই ছেড়ে দিচ্ছি—তুমিই মেরে দিও বরং।

আমি বুঝি মেরেছি আপনার টাকা? বাঁট্‌কুল গজগজ করে।

আহা, রাগছো কেন? টাকার আবার আমার-তোমার কি? টাকা হচ্ছে সবার। টাকার আমদানী-পথটা খোলা রেখে, যাবার পথটা বেশি পরিষ্কার করতে হয়। ও এমনি জিনিস, অনেকটা হাওয়ার মতোই, ফাঁকা পেলেই এসে ঢুকবে আবার ফাঁক পেলেই বেরিয়ে যাবে। যাতায়াতের পথ না পেলেই ওর মুস্কিল—জমে গেলেই বিভ্রাট! এনতার আনো, আর এনতার ওড়াও।

আপনি তো বললেন, আনো। আসে কোত্থেকে? বাঁট্‌কুল আফসোস চাপতে পারে না। দিচ্ছেটা কে?

এই যে, আমিই দিচ্ছি। বলেছি তো, ওর থেকে যা ফেরৎ আসবে সব তোমার। যতো খুশি ওড়াও! উড়িয়ে দাও চারধারে—এমন কি, ঘুড়িয়েও দিতে পারো।

কি করে ঘোরাবো? কার হাতে ঘুরিয়ে দেবো? আপনারাও তো ঘুরিয়ে নিচ্ছেন না। তাহলে?

আহা ঘুড়ি কিনে কিনে ঘুড়িয়ে দাও না হে? ঘুরিয়ে দেওয়াও হবে—উড়িয়ে দেওয়াও হবে।

আমি ওড়াবো না, ঘোরাবো না, জমিয়ে রাখবো। বাঁটকুল জানায়।

সর্বনাশ করেছে—। হর্ষবর্ধন পকেট থেকে আরেকখানা বৃহদাকার নোট বার করেন—এটা হচ্ছে হাজার টাকার। এইটাই ওড়াও তবে! কিন্তু আর কিচ্ছুই রইলো আমার কাছে। এক টাকাও না। উড়িয়ে দিলুম সব। এমনি করেই টাকা ওড়াতে হয়, তবেই টাকা আসে। তবে হ্যাঁ, রোজগার করে ওড়ানো চাই।

বাঁটকুল আনন্দে আত্মহারা হয়ে হর্ষবর্ধনের গলা জড়িয়ে ধরে ঝুলে পড়ে—আপনি ভারি ভালো লোক। সত্যি! ভারি ভালো!

এই? ওকি হচ্ছে?—গোবরা ফোঁস করে ওঠে—আমার দাদার গায়ে হাত দিচ্ছো যে বড়ো? ওকি? ওসব কি? বাঁটকুলের আহ্লাদে-ব্যবহার ভালো লাগে না তার—ওর চেয়ে দুর্ব্যবহারও নাকি অনেক ভালো। অনেক বেশি সহনীয়—অন্ততঃ গোবরার পক্ষে।

আহা! দিক না! ছেলে মানুষ, কী হয়েছে? একটু আদর করছে বইতো নয়? আমি কিছু আর ক্ষয়ে যাবো না তাতে? হর্ষবর্ধন গোবর্ধনকে থামান।

ব্যস? নাই দিচ্ছো তো তোমার আর কি! এইবার মাথায় উঠে বসবে। দেখো।

বসলোই বা। কী আর হয়েছে। ছেলে মানুষই তো। খুব বেশি ভারি নয় তো আর। আমি কিছু ভেঙে পড়বো না তাতে।

তুই যে ছেলেবেলায় কতো আমার কাঁধে চাপতিস—মনে নেই তোর? আমি কি কিছু বলতাম?

দাদার এই অপক্ষপাত গোবরার প্রাণে লাগে। সে আর বাঁটকুল সমান হলো? দাদা যে সত্যিই পর হয়ে যেতে বসেছে তাতে আর তিলমাত্র সন্দেহ থাকে না। দুটো চোখই সজল হয়ে ওঠে ওর।

বেশ, থাকো তুমি ঐ ভরতের বাঁটুল আঁকড়ে। লক্ষ্মণ চললো। বৌদির কাছেই চললো লক্ষ্মণ।

গোবর্ধন বাড়ির ভেতরে ঢুকে তর্ তর্ করে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে থাকে। সটান ছাদেই গিয়ে ওঠে।

বৌদি ওখানে এসেছে নাকি? বাঁট্‌কুলের বিস্ময়াকুল জিজ্ঞাসা।

বৌদি? ওই ছাদে? আমার যদ্দূর মনে হয়, বৌদি—মানে ওর বৌদি—এখানে নেই। সে এখন সুদূর আসামের আরেক ছাদে। এই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

তাহলে উনি যে এই ছাদে গেলেন, তাঁকে খুঁজতে?

ছেলেমানুষ! মাথা খারাপ হয়ে গেছে, বুঝছো না! ছেলে মানুষদের কি আর মাথা আছে? মাথাই নেই তো খারাপ হতে কতোক্ষণ? হর্ষবর্ধন উদাহরণের দ্বারা তথ্যটাকে আরো বিশদ করে দেন—এই যেমন তুমি একটা ছেলেমানুষ! বলা নেই, কওয়া নেই, আমার গলা ধরে ঝুলে পড়লে হঠাৎ। ও আবার তেমনি আরেক ছেলেমানুষ। ওর তাইতে অভিমান হয়ে গেছে! আর কারো গলা না পায় তো, ছাদে গিয়ে, নিজের গলাতেই ফাঁস দিয়ে নিজের গলা ধরেই ঝুলে পড়বে কিনা, কে জানে!

হর্ষবর্ধনের ভাবনাই হয়—এবং ভাবতে না ভাবতে এক মুহূর্তেই তিনি প্রচণ্ড দুর্ভাবনায় পরিণত হয়ে পড়েন, বলেন—যাও তো, যাও তো। বলো গে ও-ও নাহয় আমার গলা ধরে ঝুলুক খানিক। কী আর করবো? ও ঝুলতে গেলে হুমড়ি খেয়ে পড়ে না যাই

আবার। এখন তো আর অ্যাট্‌টুক নেই। ভারি হয়েছে অনেক। তা যা হয় হবে, না ঝুলে কি ঠাণ্ডা হবে ও? চটপট যাও। সামলাও গিয়ে ওকে আগে। এই দেহ নিয়ে ছাদে উঠতে হলে তিন ঘণ্টা লেগে যাবে আমার। আমি আবার লাফাতে লাফাতে কোনো কাজই করতে পারিনা, ছাদে লাফিয়ে উঠতে হলেই তো গেছি।

ততোক্ষণে গোবর্ধন এসে, কার্নিশের ধার ঘেঁসে, নিচের সকলের দৃষ্টিগোচর হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবং তড়বড় করে ঠোঁট নড়ছে তার—টা টি টুক্‌মুক্ টেন্ অ বাটায়!—দুর্দান্তভাবে আউড়ে চলেছে সে।

পরমুহূর্তেই, নেহাৎ শূন্যমার্গ লক্ষ্য করে তার এক প্রচণ্ড লাফ! পাখিদের মতো ওড়বার উচ্চাভিলাষে ঠিক হনুমানদের হুবহু নকল!

এবং যা ভেবেছো তাই! একটা গাছই বটে। তোমার আন্দাজে ভুল হয়নি, ঠিকই ধরতে পেরেছো। যে-রকমটি সচরাচর সব গল্পের বইয়েই হয়ে থাকে।

এরকম ক্ষেত্রে একটা গাছ না থেকেই পারে না! মাঝখানে সে আসবেই।

হনুমানের অনুকরণ করতে গিয়ে, গোবর্ধন যেসময়ে, মাধ্যাকর্ষণের অনুসরণ করছে—অবিকল নিউটন-পরিদৃষ্ট সেই আপেল-ফলটির মতোই—সেই সময়ে মাঝখান থেকে বাধা আসে। মধ্যপথে বাগড়া পড়ে; এই মারাত্মক মুহূর্তে যে ভুঁইফোড় গাছটা গোবর্ধন আর পৃথিবীর মাঝখানে মধ্যস্থতা করছিলো, তারই একটা ডালের ফ্যাকড়ায় গোবরার কাছা আটকে যায়।

কারণ? কারণ আর কিছুই নয়, গল্পের এঁরা তো আর সহজে মরবার পাত্র নন। অতএব, গল্পের খাতিরেই, গাছের সঙ্গে লটকে গিয়ে ঝুলতে থাকেন গোবর্ধন।

ভাগ্যিস ওর হিন্দুস্থানীদের মতো আঁটসাঁট কাপড় পরবার বদভ্যাস, তাই সে কোনো গতিকে টিঁকে থাকে।

কিন্তু এরকমভাবে কতোক্ষণ আর টেঁক্সই থাকা সম্ভব? হর্ষবর্ধন ভারি ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন।

এই এই! তোমরা দেখছো কি? পড়ে মারা যাবে যে!

সকলেই হাঁ করে সেই দুর্লভ দৃশ্য দেখছিলো। এতোক্ষণে হুঁস হয়, সবাই এবার হাঁ হাঁ করে ওঠে। বাঁটকুল একজনকে মোটা দেখে একটা দড়ি আনবার হুকুম দেয়।

দড়ি কি হবে? হর্ষবর্ধন তো অবাক।

কূপ থেকে যেমন করে ঘটি তোলে, তেমনি করেই টেনে নামাতে হবে তো? আটকে গেছে যে, দেখছেন না? আমরা দড়ি ছুঁড়ে দিই, আর উনি দড়িটা ধরে ফেলে, গলায় কিম্বা কোমরে বেঁধে ফেলুন—আর আমরা সবাই মিলে এক হ্যাঁচকায় নামিয়ে আনি।

বাঃ, আর আছড়ে পড়ে হাত পা ভেঙে যাক ওর! বেশ আর কি? হর্ষবর্ধন বিরক্ত হন।

তবে আর অন্য কী উপায় আছে? ড্রাইভারটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে এবার।

উঁহু, কূপের ব্যাপার না! মানুষ পুকুরে কি নদীতে ডুবে গেলে কি করা হয়? তাই করতে হবে। হর্ষবর্ধন বুঝিয়ে দেন ভালো করে—সেখানে লাফিয়ে গিয়ে জলে নামতে হয়, আর এখানে কেবল লাফিয়ে গিয়ে উঠতে হবে। ঐ গাছেই উঠতে হবে।

সকলেই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। গাছে ওঠার উৎসাহ হয় না কারো। এক বাঁটকুল ছাড়া, গাছে উঠতেই জানেনা কেউ ওদের মধ্যে। জানলেও, যে কারণেই হোক, জান দিতে রাজি নয়, জান যাবার ভয় আছে তো! তবে সাঁতার অবশ্য কারো কারো জানা আছে, কিন্তু তাতে কি আর সুবিধে হবে এখানে!

বাঁটকুল বলে—বলুন, এক্ষুনি আমি উঠে যাচ্ছি! কিন্তু উনি তো আর ছোট্ট আমটি নন যে, আমি গিয়ে পেড়ে আনতে পারবো?

বলুন, বললেই আমি উঠি। একবার ঘাড় নাড়লেই হয়, আদেশের শুধু তার অপেক্ষা।

উঁহুহু! তোমার কর্ম না। হর্ষবর্ধন বলেন—হাতের চেয়ে আম বড়ো যে! পারবে কেন তুমি? আমই বা কেন, গোবরাটা যা ধাড়ি, পেল্লায় একটা কাঁঠাল কি তরমুজেরও বাবা বলা যায় ওকে। ওকে পাড়তে গেলে তুমি মারা পড়বে।

গোবর্ধন প্রাণান্ত প্রয়াসে—কিম্বা একান্ত অনায়াসেই—নিজেকে এতোক্ষণ ঝুলিয়ে রেখেছিলো। কিন্তু ঝুলনযাত্রা তো কিছু আর অনন্ত কাল চলতে পারে না? তার কাছার ধারণাশক্তি যে ক্রমশঃই বেশ কমে আসছে, হৃদয়ভেদী এই রোমাঞ্চকর রহস্য ভালো করেই সে টের পেতে থাকে।

করুণ কণ্ঠে এই ভয়াবহ তথ্যটি সর্বজনসমক্ষে সে উদ্ঘাটিত করে—দাদা, আর—আর বেশিক্ষণ না, কাপড় ফাঁসলো বলে! তোমার দু'টি পায়ে পড়ি, আমায় বাঁচাও দাদা! তোমার দিব্যি, বৌদির দিব্যি, আর কক্ষনো আমি উড়বো না।

আমাকেই উঠতে হলো, দেখছি। অগত্যা হর্ষবর্ধনকে মরীয়া হতে হয়।—আর কি কেউ গাছে উঠে ওকে পাড়তে পারবে? ওর টাল সামলানো কি অতো সোজা? উঃ, সকাল থেকে কি ঝঞ্ঝাটটা না যাচ্ছে আজ! তিনি মালকোঁচা মারতে শুরু করেন।

বাধা আসে মালির তরফ থেকে। আর্তকণ্ঠে সে ককিয়ে ওঠে—বাবুমশায়, অমন কাজটি করবেন নি। গাছটি মারা পড়বেক তাহলে! আপনার ভার কি সইতে পারবেক ও?

অবোলা জীবের পক্ষ নিয়ে মালিককেই ওকালতি চালাতে হয়। ওই পেয়ারা গাছটা ওর আবার ভারি পেয়ারের গাছ।

এই নামমাত্র গাছটা ওঁর গুরুভার বহন করতে পারবে কি না—সে-রকম দায়িত্ববোধ ওর আছে কিনা আদৌ—এমন কি,

তাঁর দায় ঘাড়ে নেবার পর ওর স্থায়িত্ব সম্বন্ধেই হর্ষবর্ধনের সন্দেহ ছিলো।

লটপট সিং একটা বুদ্ধি বাব করে। প্রস্তাব করে যে তার মাথার পাগড়িটাকে খুলে চারজনে চার ধার শক্ত করে বেশ টান করে ধরুক, আর ছোটবাবু গাছ থেকে তার ওপর লাফিয়ে পড়ুক।

হর্ষবর্ধন তার তারিফ না করে পারেন না—লটপট সিং, তোমার মাথায় কেবল পাগড়ি নেই, বুদ্ধি ভি আছে বহুৎ। চটপট বিছাও পাগড়ি! ভাই হামারা গির্নে লাগা।

হর্ষবর্ধন, দুই দারোয়ান আর বাগানের মালি পাগড়িটা বিছিয়ে তার চার খুঁট বেশ শক্ত করে তুলে ধরে আর শ্রীমান গোবরা অবলীলায় তার ওপরে ঝাঁফিয়ে পড়ে।

পড়েই আবার লাফিয়ে ওঠে, ঠিক নিজের ইচ্ছায় নয়। ফুটবল যেমন মাটিতে পড়ে স্বভাবতঃই লাফায় অনেকটা সেইরকম। লাফিয়ে উঠতেই হর্ষবর্ধন ভাইকে লুফে নেন—কি জানি যদি, আবার গাছে উঠে যায়।—দেখছিস আমি কেমন লোফার?

হর্ষবর্ধনও দাদার কোলে চড়ে দাদাকে জড়িয়ে ধরে।—হ্যাঁ, দাদা?

বাঁটুকুল লাফাতেই থাকে।

প্রথম থেকেই সে বেজায় রকম লাফাচ্ছিলো! এহেন পতন-লীলা তার খুব মনের মহন, কিন্তু দুঃখ এই যে, প্রায়ই ঘটে না, কিম্বা ঘটলেও আড়ালে-আবডালেই হয়ে যায়, চোখের সামনে কদাচই ঘটে থাকে। আনন্দ আতিশয্যে এসে ঠেকলেই বাঁটুকুলের সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়, স্বভাবতঃই, না লাফিয়ে সে স্থির থাকতে পারে না।

গোবর্ধন পেয়ারা গাছ থেকে অবতীর্ণ হলেও, ভূমণ্ডলে তখনো ঠিক উত্তীর্ণ হতে পারেনি—দাদার বেয়াড়া গাছেই অবস্থান করছে।

কষ্টেসৃষ্টে সেইখানে বসেই সে বাঁটুকুলের লম্ফ ঝম্ফ চেয়ে ছ্যাখে আর রোষকষায়িত নেত্রে তাকায়।

অবশেষে সে আর থাকতে পারে না। আর লাফাতে হবে না, থামো—এই বলে সে নিজেই লাফিয়ে নেমে পড়ে—দাদার বাধা না মেনেই। বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠ থেকে ঝাঁঝালো সুর বেরিয়ে আসতে থাকে—ভারি ভারি ওঁর মন্ত্র! টা টি টুক্‌মুক্—দূর দূর! মন্ত্র না কচু! উড়তে গিয়ে মাঝখান থেকে পিঠ পেট টাটিয়ে গেল! প্রাণ নিয়েই টানাটাটানি আমার! টা টি না ছাই! সে বলে। মুক্তকণ্ঠেই বলে দ্যায়।

মন্ত্র না কচু, এই বলেই গোবরা থামে না, একটু পায়চারি করে হাত-পা-র আড় ভেঙে নিয়ে আবার সে যোগ করে, মন্ত্র না ঘেঁচু!

তোকে মারবার ষড়যন্ত্র! বুঝেছিস গোবরা! বাজে মন্ত্র দেবার জন্যে হর্ষবর্ধনও বাঁটুকুলের ওপর চটে গেছেন।

অনেকক্ষণ আগেই, দাদা! আজ সকালে যখনই ঐ শ্রীমূর্তি দেখেছি তখনই টের পেয়েছি। তার ঢের আগেই, যখন আজকের আনন্দবাজর পড়েছি, তখনই!

আস্ত একখানি নীট! পঁচানব্বই হাজারের একখানা! হর্ষবর্ধন আনন্দবাজারারের সর্বোচ্চতম সংবাদটি স্মরণ করিয়ে দেন, তবে বাঁচলে হয়!

বাজে মন্ত্র? বটে? বললেই হলো আর কি!—বাঁটুকুল এবার প্রতিবাদ করে—টা টি টুকমুক—ওই যাঃ! হয়েছে! একটু ভুলই হয়েছে বটে! ওটা ওড়াবার মন্ত্র নয়, ওটা তো ব্যাং-লাফের মন্তর গো। তাই! সেই জন্যেই!

ব্যাং-লাফের মন্তর! গোবর্ধন দ্বিতীয়বার আকাশ থেকে পড়ে যেন।

ব্যাং-লাফের মন্তর! অবাক করলে বাপু!—হর্ষবর্ধনও বিস্মিত

হন—ব্যাঙেরা তো এমনিতেই লাফায়, নিজের থেকেই লাফ মারে, এই তো জানি! তাদের আবার মন্তর লাগে নাকি লাফাতে?

এই যে, এই রকম। বাঁটকুল এবার উদাহরণের দ্বারা বিষদ-ভাবে দেখাতে যায়—টা টি টুকমুক টের ন বাটায়—

মন্ত্র পড়ে, আর ব্যাঙের মতো এগোতে থাকে। এবং গোবর্ধন বড়ো বড়ো চোখ বার করে বাঁটকুলের ব্যাং-লাফানো ছাখে। একেবারে আসল ব্যঙ্গ রচনা! মন্ত্রশক্তির অমোঘ কীর্তি অস্বীকার করবার উপায় থাকে আর না।

লাফাতে লাফাতে হর্ষবর্ধনের পায়ের কাছে গিয়ে পড়ে বাঁটকুল। তিনি অমনি আঁৎকে উঠে পাঁচ হাত পিছিয়ে যান! পায়ের কাছে এলেই ব্যাঙেরা প্রায় ব্যাঙ্কের ন্যায় লিকুইডেশনে যায়, মানুষের গায়েই জলবিয়োগ করে বসে, কেমন যেন ওদের চিরকেলে বদভ্যাস, হর্ষবর্ধনের মনে পড়ে যায় হঠাৎ।

বাঁটকুল উঠে দাঁড়ায়—দেখলেন তো! ওটা ওড়বার মন্ত্র না! ভুল করে গুলিয়ে ফেলেছি! ওড়বার মন্ত্র হলো আলাদা। ডমরু ডিমি ডিমি ডিণ্ডিমো বোলে। এই হলো গো ওড়বার আসল মন্ত্র।

কী বললে? ডমরু ডিমি ডিমি—? বিদ্যার্জনে গোবরার অগাধ আগ্রহ। একবার ফেল করে আবার পাসের প্রত্যাশায় পুনরায় পড়া নিতে সে পরাঙ্মুখ নয়।

ডিণ্ডিমো বোলে, বিশ্বাস না হয় পরীক্ষা করে দেখতে পারেন! ওড়বার মন্ত্র দেবার সঙ্গে সঙ্গেই সে ওড়বার মন্ত্রণা দেয়। দেখতে পারেন আরেকবার। আর একবারই তো!

হর্ষবর্ধন ছুটে এসে জাপটে ধরেন গোবরাকে—না, না, গোবরা! খবরদার না! উড়তে যাসনে আর! এবার উড়লে

আর তোকে বাঁচাতে পারব না। কাছায় আটকালেও নয়। আমি কাছাকাছি থাকলেও না।

নতুন করে পাগড়ি বাঁধতে বাঁধতে লটপট সিংও তার অসম্মতি জানায়—ওইসা মৎলব ফিন্ মৎ ফাঁদিয়ে বাবুজি! গোবরার এবং পাগড়ির দু'জনের মুখ চেয়েই সে বলে।

আর—বারম্বার উড়লে গাছটার ওপরেও অবিচার করা হয় নাকি? ক'বার একজনের পক্ষে অপরের ঝক্কি নেওয়া সম্ভব? সামান্য একটা পেয়ারাগাছ বইতো নয়! গাছের তরফে ওকালতির সঙ্গে জজিয়তির যুক্তি জুড়ে দিয়ে শ্রীমান মালি তার বক্তব্যকে জোরালো করে।

গোবর্ধন বাঁটুকুলকে ভেংচি কেটে দেয়—বাঁটুকুলের হচ্ছে ডিমের মন্ত্র। কাঁচকলা!

না উড়বেন, নাই উড়বেন। বয়েই গেলো আমার। বাঁটুকুলও ঠোঁট উল্টোয়—এক্ষুনি নিজে উড়ে দেখিয়ে দিতে পারি, হ্যাঁ।

হর্ষবর্ধন বলেন—সে কথা মন্দ না। তুমি নিজে উড়ে দেখতে পারো বরং! তোমার বেলা গাছের বড়ো দরকার হবে না। আমিই নীচের থেকে রসগোল্লার মতো টুক্ করে ঠিক লুফে নিতে পারবো!

বাঁটুকুল কিন্তু কী ভেবে নিরস্ত হয়। না। আজ থাক! অন্ধকার হয়ে আসছে এখন, অন্যদিন হবে, তাছাড়া সারাদিন আজ আমাদের খাওয়া দাওয়া হয়নি, তার যোগাড় করিগে।

সেই ভালো! হর্ষবর্ধন হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন। গোবরাও দাদার বাহুপাশমুক্ত হয়ে রক্ষা পায়।

বাঁটুকুলের সাঙ্গোপাঙ্গ সবাই, একে একে, সুদূরপরাহত হয়ে গেলে হর্ষবর্ধন বলেন—উড়তে গেছলি কেন? ছি ছি! এতো বোকা তুই? ওড়ে আবার মানুষ! ফোতো কাপ্তেনরাই তো ওড়ে কেবল! ভদ্রলোকের ছেলের কি উড়তে আছে? ছ্যা!

তোমাকে উদ্ধার করবার জন্যেই তো। ঠোঁট ফুলিয়ে বলে গোবরা—ভারী গলাতেই বলে : দেশে উড়ে গিয়ে বৌদিকে বলে দলবল সব নিয়ে এসে পড়তাম এখানে।

উদ্ধার! উদ্ধারের কথাও উচ্চারণ করিস নে। বিদেশ বিভুঁয়ে যে সব বিচ্ছু লোকের পাল্লায় পড়া গেছে তাতে আর এজন্মে উদ্ধারের আশা নেই। হ্যাঁ, এদের হাত থেকে আবার উদ্ধার!

এখানেই পচতে হবে সারা জন্ম ?

উপায় কি ? হর্ষবর্ধন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন—বরাতে যা আছে, কে খণ্ডাবে ? আসাম কি, তুমি নেপালে গেলেও এই দশা! কোথায় যাবে নেপাল ? তোমার সঙ্গে যাবে কপাল। বলে না ? একেই বলে কপালের লেখন।

কপালের লেখন না কচু!

বেশ, উদ্ধার হতে গিয়ে দেখলি তো ? একবার বাঘের পেটে যাচ্ছিলি, আরেকবার গাছের পিঠে আটকালি! আর উদ্ধারের নামটিও করিসনে। তবে যদি, হ্যাঁ, কখনো—

দারুণ অন্ধকারের মধ্যে তিনি যেন একটুখানি আশার আলো দেখতে পান। তবে কখনো যদি বাটপাড়েরা আসে, বলা যায় না কী হয়!

বাটপাড়! বাটপাড়রা কেন আসতে যাবে ? গোবরা বেশ বিস্মিতই হয়।

কেন আসতে যাবে, কে বলবে! এরা এলো কেন ? না ডাকতে না সাধতে এমনিতেই ওরা এসে যায়। ঠিক জানিস, চোর থাকলে, বাটপাড়রাও আছে। চুরির ওপর বাটপাড়ি করতেই ওদের আমোদ। ওই ওদের পেশা! এক যদি ওরা এসে পড়ে, তবেই নাকি উদ্ধার!

বাটপাড়রা এসে উদ্ধার করবে আমাদের ? গোবরার চোখ ক্রমশঃই আরো বড়ো হয়।

এখন তো চোরাই মাল আমরা, আমাদের আর গতি কি? এখন কেউ যদি আমাদের বটপাড়ি করে নিয়ে যায় তবেই আমাদের গতিমুক্তি।

কিন্তু—কিন্তু—গোবরা কিন্তু-কিন্তু করে, তথাপি।

আর কিন্তুমিন্তু নেই। ঐখানেই যা আশা ভরসা ভায়া!

কিন্তু রাটপাড়ের হাত থেকে বাঁচবে কিসে?

আরে যাঃ! সে তো পরের ভাবনা, এখন কেন? বাট-পাড়েরও আবার বড়োদাদারা রয়েছেন—এমনি করে হাত-বদল হতে হতে যদ্দূর যাওয়া যায়। চাই কি, এইভাবে আসাম পর্যন্ত পৌঁছে গেলেও যেতে পারি। কিন্তু সে কথা তো নয়, আমি ভাবছি কি, আমরা যে রকম লাট-করা বস্তাপচা সস্তা মাল, তাতে বাটপাড়েরা এলে হয়! সেই কথাই কেবল ভাবছি আমি।

হর্ষবর্ধন হায় হায় করেন! গোবর্ধনও হা হুতাশ করে।

চৈত্রমাসের মতো হু-হু করে দু'জনের দীর্ঘনিশ্বাস বইতে থাকে। হায় হায়। চোরের পাল্লায় পড়ে বেঘোরে মরতে হলো শেষটায়।

হর্ষবর্ধনকে হায় হায় করতে শোনা যেদিন, তার কদিন পরে···

বেঘোরে পড়েছি বলতে পারো দাদা, কিন্তু মারা পড়িনি এখনো আমরা। দাদাকে একটু উৎসাহ দিতে চায় গোবরা।

মারা পড়তে কতোক্ষণ? যা সব বিটকেল লোকদের খপ্পরে পড়া গেছে! কলকাতার থেকে কোথায় এনে ফেলেছে কদ্দূরে, তাই তো টের পাচ্ছিনে!

কোন মুল্লুকে কে জানে!

বাইরে বেরিয়ে ঘুরে যে একটুখানি জানবো তারও কোনো জো নেই।

বাইরে বেরোলেই বা তুমি তা টের পাচ্ছো কি করে, দাদা? জায়গার নাম তো আর মাটির গায় লেখা নেই।

মানুষের মুখে লেখা রয়েছে।

মানুষের মুখে! গোবরার বিস্ময় ধরেনা—মানুষের মুখে আবার মুল্লুকের নাম লেখা থাকে নাকি!

উল্লুকের মতো কথা কোসনে। মুখে না হলেও মুখের ভাষায় বোঝা যায় না কি। দাদা জানান, লোকেরা সব বাংলা বলছে না আসামী বলছে, হিন্দি বলছে না উড়ে কথা কইছে তাই শুনেই তো বুঝতে পারবো কোথায় এসে পড়েছি। পূর্ণিয়ায় না আড়া জিলায়, বোম্বায়ে না মাদ্রাজে…না, আর কোনো বেয়াড়া জায়গায়।

বোম্বাই নয়, আমি হলপ করে বলতে পারি। বলে গোবরা, বোম্বাই কলকাতার থেকে হাজার মাইল দূরে। এরা তো আমাদের একশো মাইল দূরে এনেছে কেবল। আর ধরো যদি মাদ্রাজই হয়…তাহলেও…বলতে গিয়ে গোবরা থম্‌কে থাকে।

তাহলে?

তাহলে তো তুমি ধরতেই পারবে না। সেখানকার লোকেরা সব তামিল ভাষায় কথা বলে। বুঝবে কি করে? আর তাছাড়া আরো মুশকিল…গোবরা সমস্যাটা আরো বেশ প্রকট করে, সেখানে গেলে না খেয়েই মারা পড়তে হবে।

কেন, মারা পড়বো কেন? সেখানে কি বাজার হাট নেই নাকি? দোকানপাট কি নেই নাকি সেখানে? খাবার কিনে খাবো আমরা।

খেতে চাইলেই বা তারা খেতে দেবে কি করে? তুমি কী চাইছো, খেতে চাইছোই কি না তাই বা তারা বুঝবে কি ভাবে? বুঝলে তো দেবে। তামিলনাদের লোক তোমার নাদ বুঝতে না

পারলে—তামিল ভাষায় কথা না কইলে তোমার কোন হুকুমই তামিল হবে না সেখানে।

এমন সময় বাড়ির ছাদ থেকে সিঁড়ি বেয়ে সুর ভাঁজতে ভাঁজতে নেমে এলেন একজন। বাঁটকুল নয়, বিটকেল নয়, বিলকুল অচেনা।

কে মশাই আপনি? গুণ গুণ করতে করতে কোথা থেকে উৎরে এলেন আবার? হতবাক হর্ষবর্ধনের কথা ফোটে।

মশাও অবশ্যি গুণ গুণ করে আর যত্রতত্র থেকে আসতে পারে বটে···গোবরা যোগ দেয়। কিন্তু জলজ্যান্ত মানুষের পক্ষে আকাশ ফুঁড়ে আসা—?

তাছাড়া, ছাদ থেকে এলেন যে! লোকে তো নিচের থেকেই ওপরে আসে। সদর থেকে অন্দরে···

ছাদে তো আপনি থাকেন না নিশ্চয়? ছাদে তো দেখিনি আপনাকে। ছাদে তো উঠেছিলাম একবার···। গোবরা বলে—তখনো তো কই দেখিনি আপনাকে সেখানে।

থাকলে তো দেখবেন? আমি এখানকার কেউ নেই, মশাই! লোকটি জানায়—আমি এখানে এসেছি আপনাদের নিয়ে পালিয়ে যাবার জন্যে···

অ্যাঁ! কী বললেন? আমাদের নিয়ে পালাবেন? এরাই তো আমাদের চুরি করে নিয়ে এসেছে। আমরা অপহৃত।

অপহরণের ওপর আবার আমি অপহরণ করবো। লোকটি জানায় সেই জন্যেই আমি এসেছি।

বুঝেছি। আপনারা অন্য এক চোরের দল।

না, না চোর নেই আমরা··চোর বলে গাল দেবেন না আমাদের। সোচ্চার প্রতিবাদ করে সে।

ছ্যাঁচোর নাকি তবে?

ছ্যা ছ্যা করে লোকটা—ছ্যা! চোর-ছ্যাঁচোরদের আমরা মানুষ বলেই ধরি না, ওদের আবার একটা পেশা নাকি? চুরি জোচ্চুরি কি ভদ্রলোকের কাজ মশাই? এসব অপবাদ দেবেন না কখনো আমাদের।

তাহলে আপনারা?

আমরা চোরের ওপর দিয়ে যাই।

ঠিক বুঝলাম না তো···

বুঝবেন, বুঝবেন—সময় হলেই বুঝবেন! বোঝাবার সময় নেই এখন। পরে বুঝিয়ে দেবো ভালো করে। এখন, আপনারা এখান থেকে উদ্ধার পেতে চান, কি, চান না? জিগ্যেস করে লোকটা—বিটকেলদের হাত থেকে রক্ষা পেতে ইচ্ছুক কি?

নিশ্চয় নিশ্চয়! দুই ভাইয়েরই উৎসাহ হয়—কিন্তু কি করে উদ্ধার পাবো? সদর গেটে তালা বন্ধ—দারোয়ানের কড়া পাহারা···

ওদিক দিয়েই না। ছাদ দিয়ে নিয়ে পালাবো আমি আপনাদের। যেভাবে আমি এসেছি। বলে লোকটা ছাদের সিঁড়ি ধরে—আসুন আমার সঙ্গে।

হর্ষবর্ধন লোকটার পিছু পিছু ছাদে উঠে দেখেন, বাড়ির এধারকার গা-লাগালো গাছটা যেমন গোবর্ধনকে গর্ভে ধারণ করেছিলো, পেছনদিকেও একটা গাছ তেমনি বাড়ির গা-লাগা হয়ে তাঁদের পৃষ্ঠে বহন করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে।

দেখেছেন তো গাছটা। উপর-চড়াও লোকটি তাঁদের দেখায়—গাছটা কেমন হুমড়ি খেয়ে পড়েছে ছাদের ওপর? এই পথেই এসেছি আমি। এইটে বেয়ে নেমে পড়ুন তলায়। উঠতে পারবে তো গাছে?

তা আর পারবো না? বলে গাছ নিয়েই আমাদের কাজ।

কাঠের কারবারী আমরা। হর্ষবর্ধন বলেন—কতো গাছকে কেটে তক্তা বানিয়ে ফেললাম বলতে গেলে। আর গোবরা? ওতো ছোটো-বেলার থেকে গাছের কোলে-পিঠেই মানুষ। গাছেই বাস করতো রাতদিন।

আম পাকলেই অবশ্যি। গোবরা প্রতিবাদ—দিনরাত নয়। আর সারা বছর ধরে কখনোই নয়!

মাটিতে পা দিয়ে হাঁপ ছাড়লেন হর্ষবর্ধন—বাঁচালাম বাবা! চোরের হাত থেকে বাঁচা গেলো।

তা তো বাঁচা গেলো। কিন্তু কার খর্পরে পড়লুম এখন, কে জানে!

পিছু পিছু নেমে এসে এগিয়ে এলো লোকটা—আসুন, সামনেই আমার গাড়ি দাঁড়িয়ে। রাস্তার মোড়াটাতেই।

মোটরে উঠে হর্ষবর্ধনের প্রশ্ন—কোথায় যাচ্ছি এখন আমরা?

চলুন না একটু। দেখতেই পাবেন।

মিনিট পনেরো যেতেই একটা বড়ো শহর দেখা গেলো।

গোবরা শুধোলো—এটা কোন শহর মশাই?

শহর কলকাতা।

ঠাট্টা করছেন! অবিশ্বাসের হাসি হাসলো দু'ভাই—কলকতার থেকে একশো মাইল দূরে গিয়ে পড়েছিলাম আমার। আর এই একটু না আসতেই—এই টুকুনের মধ্যেই কলকাতা! বলেন কি!

বেলগেছে থেকে কলকাতা একশো মাইল—জানতাম না তো! লোকটাও কম অবাক হয় না।—কে বলছে আপনাদের?

বেলেগেছে কি আমরা চিনিনে? বেলেগেছেই যদি হবে তো সেই হাসপাতাল—সেই পুলটা কই? বেলেগেছের খালটাই বা গেলো কোথায় মশাই?

আমরা তো বেলগেছের পথ ধরে আসিনি। বিটকেলদের নজর এড়াতে ঢাকুরের দিক দিয়ে ঢুকেছি কলকাতায়!

কলকাতাই যদি হবে, তবে চিনতে পারছি না কেন? শুধোয় গোবরা, এই ক'দিনে এতোটাই বদলে যাবে নাকি?

কলকাতা এই রকমই। দিনকের দিন চেহারা পাল্টায়। ঘণ্টায়-ঘণ্টায়, মিনিটে-মিনিটে বদলে যায়। কলকাতাকে চেনা অতো সহজ নয়, মশাই!

দেখতে দেখতে রাসবিহারী অ্যাভেনিউ এসে পড়ে—হ্যাঁ হ্যাঁ কলকাতাই বটে। উল্লাসিত হয়ে ওঠেন হর্ষবর্ধন—ঐ যে টেরাম রে! টেরাম গাড়িই কলকাতার লক্ষণ—বুঝলি গোবরা। রিক্সা, মোটর, ঠেলাগাড়ি সর্বত্রই আছে—দেশ গাঁয়েও—কিন্তু এই টেরাম কলকতার বাইরে আর কোথাও তুই পাবিনে।

ট্রামের বড়ো রাস্তা ছেড়ে মেজে সেজো রাস্তা পার হয়ে গাড়িটা শেষে একটা পাড়ার মধ্যে এসে ঢুকলো।

পাড়াটা চেনা চেনা মনে হচ্ছে না দাদা? কথা পাড়লো গোবরা—আমাদের পাড়ার মতন ঠেকছে যেন। যেখানে আমরা থাকতাম সেই ধরনেরই অনেকটা—কী বলো?

তা কি করে হবে? তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারদিক তাকিয়ে জবাব দেন দাদা—তবে বলতে কি, কলকতার সব পাড়াই প্রায় এক ধাঁচের। সেই রোয়াক-ওয়ালাবাড়ি। পাশেই বস্তির মাঠকোঠা, সেই ছেলেরা রবারের বল পিটছে রাস্তায়, কিম্বা ক্রিকেটের নাম করে ব্যাটম্বল খেলছে···

ব্যাটম্বল? খট্‌কা লাগে গোবরার—কিসের অম্বল বললে?

ব্যাটম্বল। পেটে খেলে কী হয় জানিনা, তবে পিঠের ওপর একখানা খেলে অম্বল হয় নির্ঘাৎ!

ও, তুমি ব্যাটবলের কথা বলছো! তা অমন সংস্কৃত করে ব্যাটম্বল···বললে বুঝব কি করে?

ও বাবা! এ রাস্তাটা এমন এবড়ো খেবড়ো কেন গো? লোকটিকে শুধোন হর্ষবর্ধন।

রাস্তার তলা দিয়ে টেলিফোনের লাইন কি কলের জলের পাইপ কিছু একটা পাতা হচ্ছে বোধ হয়, সেইজন্যে খুঁড়ে তুলে ফেলেছে রাস্তাটা।···গাড়ি এ রাস্তায় যাবে না আর। এটাকে ছেড়ে দিয়ে আমরা নেমে পড়ি এখানেই। আসুন।

বলছিস, আমাদের পাড়ার মতন? আমাদের পাড়াটায় কতো খোলা জায়গা পড়ে ছিলো, ছেলেরা ফুটবল খেলা জমাতো সেই সব পোড়ো জমিতে, আর এখানে? কতো উঁচু উঁচু সব বাড়ি উঠেছে—চারিধারেই—চেয়ে দেখ!

লোকটা ওদের নিয়ে একটা খালি বাড়িতে ওঠে গিয়ে।—এইটেই আপাতত আপনাদের আস্তানা। জানায় সে। কপাট নেই বাড়িটার, জানলাগুলো সব হা-করা, খাঁ খাঁ করছে সারা বাড়ি। ধুলো-বালি ভর্তি নোংরা যতো ঘর জঞ্জাল ভরা। দেখে শুঁকে নাক সিঁটকোলেন। হর্ষবর্ধন—আস্তানা, না, আস্তাবল?

যা বলো দাদা! বলে ওঠে গোবরা—তা, আস্তাবলেই বা তোমার আপত্তি কি! তোমার নামের অর্ধেক তো হর্ষ (সহর্ষে সে জানায়) আর হর্স মানে ঘোড়া। ঘোড়ার পক্ষে আস্তাবলই তো ভালো দাদা!

এমন অবস্থায় ভায়ের রসিকতার প্রয়াসে দাদার পিত্তি জ্বলে যায়। গোবরার কথার কোনো জবাব না দিয়ে লোকটাকেই তিনি বলেন—তবে আমার বাকি অর্ধেকের জন্যে একটা গোয়ালঘর দেখুন তাহলে?

গোয়ালঘর?

আস্তাবলেই আমার চলে যাবে বেশ, কিন্তু ওর তো এখানে পোষাবে না। ওর জন্যেই বলছিলাম।

আপনার ভায়ের জন্যে গোয়ালঘর দেখতে বলছেন?

গোবরা ওর নাম তো। গোবরা গোবরেরই অপভ্রংশ। ওরা গোয়ালঘরেই পরিত্যক্ত হয়। সেখানেই ইতোনষ্ট স্ততোভ্রষ্ট হয়ে পড়ে থাকতে আমরা দেখতে পাই।—মানে, ঐ সব অপভ্রংশ।

লোকটা কিন্তু এসব রসিকতার ধার দিয়ে যায় না, সে বলে—তা যাই বলুন! গোয়ালঘরই হোক, আর আস্তাবলই হোক, আপাতত এখানেই আপনাদের গুম করে রাখতে হবে।

গুম? কথাটা যেন বোমার মতোই দুম করে পড়ে ওঁদের সামনে। শুনেই ওঁরা গুম হয়ে যান।

—আমাদের গুম খুন করা হবে নাকি? জানতে চায় গোবরা। দুই ভায়ের মুখেই গুমোট দেখা দেয়।

—কেন, খুন করতে যাবো কেন? খুন খারাপি আমরা করিনে। ওসব আমাদের কাজ নয়।—বলেছি না আমরা চোর ছ্যাঁচোড় না···

—কিন্তু আপনারা যে কী তাও তো বলেন নি। বলেন হর্ষবর্ধন।

বলেছি না যে, আমরা চোরের ওপর দিয়ে যাই? চুরির ওপর বাটপাড়ি করি। আমরা হচ্ছি বাটপাড়।

—বুঝলাম এতোক্ষণে, বললেন হর্ষবর্ধন। এবং বোঝার সঙ্গে ঘাড় থেকে যেন একখানা বাটখারা নেমে গেলো।

আর এ-জায়গাটাই বুঝি তাহলে আপনাদের সেই বাটপাড়া?

বাটপাড়াও নয়, ভাটপাড়াও নয়। এমনকি আপনার গোঁদল-পাড়াও না···বেশ ভনিতা করেই জায়গাটার বুঝি পরিচয় দিতে যাচ্ছিলো সে, এমন সময়ে বাধা পড়ে গোবরার এক চিৎকারে—ওমা!

দেয়ালের দিকে আঙুল দেখিয়ে সে চেঁচিয়ে—ও দাদা?

এটা যে আমাদের পাড়াই বটে! এতো আমাদেরই সেই বাড়ি গো! দেখছো না, দেয়ালের গায়ে তোমার হাতের আখর···?

হর্ষবর্ধন তাকিয়ে দেখেন সত্যিই? দেয়ালে তাঁর শ্রীহস্তের লাঞ্ছনাই বটে! পেন্সিল দিয়ে তাঁর হাতের স্বাক্ষর উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে—শ্রীশ্রীহর্ষবর্ধন।

আর তার ঠিক নিচেই গোবরার দেবাক্ষর—শ্রীমান গোবর্ধন! তাও জ্বল জ্বল করছে সামনে সামনে।

আমাদের বাড়িই বটে তো! কিন্তু বাড়ির এ কী দশা! বলতে গিয়ে প্রায় ডুকরে ওঠেন হর্ষবর্ধন—আমাদের আসবাবপত্র, খাট, পালঙ্ক, আলমারি, দেরাজ, তক্তপোষ, তোরঙ্গ, পাপোষ, বিছানা, সোফাসেট, চেয়ার, টেবিল—এসব গেলো কোথায়?

কোথায় গেলো ফ্রিজ, ফ্যান, আলোর ফিটিং, জানলা, দরজা, খড়খড়ির পাল্লারা···? গোবরার অনুযোগ।

চুরি গেছে সব। চোরের পাল্লায় পড়ছে। পরিষ্কার করে দেয় বাটপাড়—কলকাতার বাড়ি খালি পেলে, মালিক না থাকলে কিছু কি থাকে নাকি? যে পায় নিয়ে পালায়। বাড়ির মালিক বাড়িতে থাকলেই রাখা যায় না, আর আপনারা তো ক'দিন ধরেই বেপাত্তা।

তাই বলে এই কলকাতা শহরের বুকের ওপর বসে এতোটাই বাড়াবাড়ি হবে নাকি?

মশাই, বাড়িটা যে ফিরে এসে দেখতে পেয়েছেন এটাই আপনাদের ভাগ্যি বলে ভাবুন। এখন তো শুধু আসবাবপত্তর আর দরজা জানলাই গেছে, আর দিনকতক দেরি করে ফিরলে বাড়িটারই পাত্তা পেতেন না। ভেঙে ফেলে এর ইঁট-কাঠ-কড়ি-বরগা, লরি করে সব পাচার হয়ে যেতো—পাড়ার সবার চোখের সামনেই। তখন এসে ফাঁকা জমিটাই দেখতে পেতেন খালি। আরো কিছুদিন

দেরিতে এলে দেখতেন, কে এসে আপনার জায়গা দখল করে সাততলা বাড়ি হাঁকড়ে বসে আছে—নতুন প্যাটার্ণের বাড়ি দেখে চিনতেই পারতেন না তখন। আপনার এই বাড়ির কোনো চিহ্নই থাকতো না। জানায় বাটপাড়।

বৌদিও বসে আছে বাপের বাড়ি। ঘরদোর সামলাবে কে? গোবরার আফসোস হয়, আরে, আমাদেরই সামলাবার কেউ ছিলো না। অনাথ বালক পেয়েই না ধরে নিয়ে গেছলো চোরে…।

তবেই বুঝুন! বাটপাড় বুঝিয়ে দেয় আরো—আর ঘরের বৌ ঘরে নেই বলেই ঘরদোর এতো নোংরা! ঝাড় পোঁচ করবে কে? কে মুছবে ঘরদোর আসবাবপত্তোর? কথায় বলে গৃহিনী গৃহ মুছ্যতে। সে না মুছলে আর মুছবার কেউ নেই।

ঘরদোর জাহান্নামে যাক, চোখের জলই বা কে মোছায়! গোবরা যেন দাদার কাটা-ঘায়ে নুনের ছিটে দেয়।

চোখের জল মোছার কী হয়েছে! আমি কি কাঁদছি নাকি তোর বৌদির জন্যে? প্রাণ চায় তুই কাঁদ। ডুকরে ডুকরে কাঁদ না হয়। ভেউ ভেউ করে…ঘেউ ঘেউ করে, যেমন করে খুশি তোর!

তা তো বুঝলাম, কিন্তু এর রহস্যটা বুঝছিনে…। বাটপাড় আঙুল বাড়ায় দেয়ালের পানে…ঐ আপনার শ্রীশ্রীহর্ষবর্ধন! ওর মানে?

ওর মানে উনি। ঐ তো আপনার সামনেই খাড়া। উনিই হর্ষবর্ধন আর আমি…আমি…!

বলাই বাহুল্য! বলে বাটপাড়—আপনাকে আর আমিত্বের বড়াই করতে হবে না। আপনিই তার পরেরটি। তাই না? আমি খবর পেয়েছিলাম যে আপনারা খুব বড়োলোক, কিন্তু এতো বড়োলোক, তা আমার জানা ছিলো না।

বড়োলোকের পেলেনটা কী? গোবরার বিরক্তিভরা প্রশ্ন।

ঐ শ্রীশ্রী। ওটা আমার ভারি বিশ্রী লাগছে। সামান্য মানুষের আগে শ্রীশ্রী? ওতো ঠাকুর দেবতার আগেই থাকে গো। যেমন শ্রীশ্রীকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ……।

কেন, উনি কি ঠাকুর দেবতা নন? আমার বৌদির পতিদেবতা তো উনিই…।

সে তো সবার বৌদিরই একটি করে আছে মশাই।

তাছাড়া উনি আমার বৌয়ের বটঠাকুরও তো বটেন। বাংলায় গোবর্ধন।

না, মশাই না! কখনো আমি কারো বটঠাকুর টটঠাকুর না। এখনও হইনি। বিয়েই হয়নি ওই ছোকরার। তবে হ্যাঁ, ওর একটা কনে দেখবার জন্যেই আমার বৌ বাপের বাড়ি গেছেন বটে। এখন কদ্দূর কী হয় দেখা যাক! হর্ষবর্ধন রুষ্ট হন।

হলে তো খুব ভালোই হয়। বাটপাড় সায় দেয় ওঁর কথায়—নইলে ঘরদোরের যা ছিরি হয়েছে, দু-দুটো গৃহিনী না হলে এতো সব মুছবে কে! এক জোড়াতেই কুলোয় কিনা কে-জানে!

আমার বৌদির কোনো জোড়া নেই মশাই। জানায় গোবরা। বুঝলেন তো কেন উনি শ্রীশ্রী? ওই ঠাকুরগুষ্ঠির লোক বলেই।

তা, ঠাকুরগুষ্ঠির ঠিক না হলেও, এমন কি বটঠাকুরও কি বলা বলা যায় না আমায় এখনই…? নিজের সাফাই গান হর্ষবর্ধন এবার—তাহলেও চেয়ে দেখুন, আমার এই চেহারাটা কি বিশাল বটগাছের মতোই নয়? আর বট অশ্বত্থ এসব তো আমাদের দেশে দেবতাই। তাদের তো পূজো করে থাকে পাড়াগাঁর লোকরা! করে না?

তাহলে আপনি বটঠাকুরই বটেন মশাই! শ্রীশ্রীবটঠাকুর, আপনার ছিচরণে নমস্কার!

বাটপাড়ের নমস্কার পড়তে না পড়তেই নিচের থেকে ভারি সোরগোল উঠতে থাকে।

ডাকাত পড়লো নাকি রে! বলে বাটপাড়। ফাঁকা জানলায় উঁকি দিয়ে তাকাতে গিয়ে দেখেন, সদরে এক ছ্যাকরা গাড়ি খাড়া হয়েছে—তার মাথায় যতো রাজ্যের মালপত্তর। গাড়ির থেকে জাঁদরেল গোছের এক মহিলা নেমেছেন, তিনি দাঁড়িয়ে থেকে আঙ্গুল বাড়িয়ে সহিস গাড়োয়ানের মারফতে মালপত্তর নামাচ্ছেন।

আর সেই মহিলাটি বেজায় বচসা লাগিয়েছেন গাড়োয়ানের সঙ্গে তিনি যেমন তাঁর কড়াক্রান্তিতে কড়া, গাড়োয়ানের গলাও তেমনই দস্তুরমতো চড়া। বিস্তর লোক দাঁড়িয়ে গেছে চারধারে। সারা মহল্লায় বেজায় হল্লা।

ওমা! ডাকাতই তো বটে! বলে ওঠে বাটপাড়—না, ডাকাত পড়লে বাটপাড়রা আর সে তল্লাটে নেই।

বলেই সে খিড়কির পথে সটান সটকান দেয়।

কি রকম ডাকাত দেখি তো? বলে গোবরা জানলার ফাঁকে ভয়ে ভয়ে উঁকি মারতে গিয়ে সোৎসাহে লাফিয়ে ওঠে—ওমা! বৌদি যে! বৌদি এসে পড়েছে বাপের বাড়ি থেকে। বেঁচে গেলাম এবার, আর কোনো ভয় নেই আমাদের। এসে গেছে বৌদি।

কেবল তোর বৌদির ভয়টাই রইলো যা। গোমড়া মুখে গোবরার দিকে তাকিয়ে বললেন দাদা—সেই ভয়েই থাকতে হবে এখন থেকে।

বৌদিকে আবার ভয় কিসের? লোকটা বললেই হলো? বৌদি তো সত্যিই কিছু ডাকাতে নয়। গোবরা গজরাতে থাকে, এমন ডাকসাইটে বৌদিকে আমাদের বলে কি না ডাকাত?

ঠিকই বলে গেছে লোকটা। চোরে আর ডাকাতে তফাৎ থাকলেও বৌয়ে আর ডাকাতে কোনোই তফাৎ নেই ভাইরে! চোর কেবল চুরি করে মাত্র আর বৌ নেয় সব কেড়ে কুড়ে। চোরের চুরি শুধু পরের ঘরে আর বৌয়ের ডাকাতি হচ্ছে নিজের

ঘরে—নিজের বরের ঘাড়ে। এই যা! বলতে গিয়ে হর্ষবর্ধনের দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়ে।—তার আবার দিনে ডাকাতি! দিনে রাতে—বুঝেচিস ?

তা তুমি যাই বলো দাদা! বৌদি কিন্তু ভারী পয়া। বৌদিও এলো আমরাও ফিরে এলাম কলকাতায়। শেষ কথা বলল গোবরা: বেঁচে বর্তে আসতে এলাম! আবার এলাম এই কলকাতায়!